কল্পবিশ্ব
কল্পবিশ্ব
দ্বিতীয় বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

প্রচ্ছদ কাহিনি

- সাইজ ডাজ ম্যাটার - বিশ্বদীপ দে ২
- পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ - উইলিয়াম গিবসন ১২
- জাপানি লাইট নভেল ও সায়েন্স ফিকশন – তৌফিক সরকার ১৫
- এক কল্প দুনিয়ার গ্রিনরুম – সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় ২৬

বিশেষ আকর্ষণ

- কার্লোস সুচলওস্কি কন-এর সঙ্গে এক অমলিন সন্ধ্যা ৩১
- যাত্রাশুরু ‘সেরা কল্পবিশ্ব-২০১৬’ ৪০

গল্প

- চন্দ্রকুমারী - অধরা বসুমল্লিক ৪১
- পৈশাচিক খিদে - সাকিয়ো কোমাৎসু ৪৫
- অস্তিত্ব-বর্ণ - সুপ্রিয় দাস ৫২
- বিকল্প - সাকিয়ো কোমাৎসু ৬৬
- বহ্‌নশোয়াইগা অ্যাল্গট্‌হম - সৌম্যজিৎ দেবনাথ ৭৮
- সবুজ মানুষ - সুদীপ দেব ৯৬
- ব্লু - ঋজু গাঙ্গুলি ১০৫
- জীবনদাতা - অভীক সরকার ১১৭
- অকাল তমসা (অন্তিম পর্ব) – এইচ. পি. লাভক্র্যাফট ১৩৩
- বানভাসি - কোবো আবে ১৪৮

কমিকস

- ভৌতিক প্রাসাদ – জুনজি ইটো ১৫২
- তৃতীয় শিকারের খোঁজে - মাসামুনে শিরো ১৬৬

সমালোচনা

- চলচ্চিত্র আলোচনা - Close Encounters of the Third Kind (1977) - সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় ২০২

প্রবন্ধ

- অগ্নিপথ ৩ – আলোকচুল্লি - সুমন দাস ২০৬
- একাদশ মাত্রার সন্ধানে - দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ২১৩
- সাইবারপাঙ্ক ধারা – সাহিত্য ও সমাজ - ময়ূখ বিশ্বাস ২১৮

কুইজ

২২১

প্রিয় পাঠক,

বসন্ত এসে গেছে। না, কেবল বাংলা সিনেমার গান হয়ে ভেসে আসা নয়, একেবারে সশরীরে ল্যান্ডিং! যদিও শীত চলে যাওয়া আর গরম পড়ে যাওয়ার মাঝের এই সময়টা আগের মতো নেই, বদলেছে অনেকটাই। তবু বসন্ত তো বসন্তই। তার এলোমেলো মনকেমন হাওয়া আর একটু একটু করে বাড়তে থাকা দিনের বেলার ভিতর সে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। আর সেই সময়েই আপনাদের সামনে এসে হাজির কল্পবিশ্ব। তার পঞ্চম সংখ্যা নিয়ে।

গত বইমেলায় হইহই করে বেরিয়েছে কল্পবিশ্বের চারটি সংখ্যা থেকে বাছাই করা সেরা লেখাগুলির সংকলন 'সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬'। মানুষ তাকে ভালোবেসেছে। আমরা আহ্লাদিত। উৎসাহের পারদ ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর হচ্ছে। গত বছরের গোড়ায় যে নতুন পত্রিকার জন্ম, সে তার টলোমলো হাঁটা পেরিয়ে ধীরে ধীরে নিজের পছন্দমতো পথ ধরে এগোচ্ছে... এ যেন সত্যিই এক স্বপ্নপূরণ। তবে স্বপ্নপূরণ বলতে সাধারণত যে পরিতৃপ্তি বোঝায়, আমাদের তাতে ঠিক সায় নেই। বরং এক স্বপ্ন থেকে অন্য স্বপ্নের রঙের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে নতুন একটা স্বপ্নের পথ ধরে এগিয়ে চলার মধ্যেই বেশি আনন্দ।

প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিল বাংলা কল্পবিজ্ঞানের চর্চায় অবহেলিত যে সমস্ত দিক সেগুলো নিয়ে কাজ করার। সেই ইচ্ছে থেকেই এবারের সংখ্যার পরিকল্পনা। আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী জাপানি কল্পবিজ্ঞান। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো দর্শন, সমাজ, ইতিহাসের জলছাপে দেশ অনুযায়ী কল্পবিজ্ঞানেরও চেহারা-চরিত্র বদলে যায়। জাপানের কল্পবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকা টেকনোলজির সঙ্গে দেশের প্রাচীন মিথের সংযোগ সেদেশের কল্পবিজ্ঞানকে পুষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, বাংলা ভাষায় তাকে নিয়ে কাজ হয়েছে কম। আশা করা যায়, আমাদের এবারের সংখ্যা পাঠকের মনের অন্ধকার কিছুটা হলেও দূর করতে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সূর্যোদয়ের দেশের কল্পবিজ্ঞানের দরজা পাঠকের সামনে খুলে দিচ্ছে কল্পবিশ্ব।

এই সংখ্যার এক অন্যতম আকর্ষণ স্পেনীয় কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের একটি অসামান্য সাক্ষাৎকার। জন্মসূত্রে আর্জেন্টিনার হলেও সাতের দশক থেকে স্পেনের বাসিন্দা কার্লোস আর্জেন্টিনা ও স্পেনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অ্যাক্সন, আর্টিফেক্স, মাইক্রোরিলেটস্ ইত্যাদি। সত্তর ছুঁই ছুঁই মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠেছি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয় পেয়ে।

এছাড়াও আরও সব নতুন গল্প, প্রবন্ধের পাশাপাশি নিয়মিত বিভাগগুলি তো আছেই। তাহলে আর দেরি কেন। উঠে বসুন কল্পনার স্পেসশিপে। আরেকটি নতুন সংখ্যার কাউন্ট ডাউন শুরু হল।

পাঠক, আপনি তৈরি তো?

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রচ্ছদ কাহিনিঃ

ঘুমটা আচমকাই ভেঙে গেল। দেখলাম সামনে রাখা জলের গ্লাসটা কাঁপছে। কাচের ভিতরে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে জলের শরীর। ক্রমশ বাড়ছে কম্পনটা।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। একটা কম্পন ছড়িয়ে যাচ্ছে বাড়িময়। কেমন যেন আশঙ্কায় সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেলাম। আর মুহূর্তের জন্য যেন আমার হৃৎস্পন্দন থমকে দাঁড়াল। একটা অতিকায় অমানুষিক পায়ের থাবা আমার ঠিক সামনে! মাথা আরও উঁচুতে তুলতেই দেখতে পেলাম তাকে। গোটা শহর ভাঙচুর করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অতিকায় জানোয়ারটা। তার পায়ের ফাঁকে পড়ায় কোনওমতে বেঁচে গেছি। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। চারপাশে ত্রাহি ত্রাহি রব। আতঙ্কে আমিও নড়াচড়া ভুলে যাচ্ছি। যেন কে এক অদৃশ্য রিমোটে আমাকে এখানেই 'পজ' করে রেখে চলে গেছে। আস্তে আস্তে ঠোঁট ফাঁক হল আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'গডজিলা!'

হ্যাঁ, এটা নিছকই কল্পনা। চারপাশের ডাল-ভাত-ডিএ-ট্র্যাফিক জ্যাম-শপিং মল জবাব চাই, জবাব দাও-এর নিত্যচেনা জীবনের সমান্তরালে একটা 'লার্জার দ্যান লাইফ' কল্পনা। কিন্তু আপনি যদি জাপানের বাসিন্দা হন, তাহলে কিন্তু এটাকে কেবল শৌখিন কল্পনার তালিকায় ফেলে দেওয়া চলে না। কারণ ১৯৪৫-এর পর থেকে জাপানের মানুষের মনের কোণে চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে একটা ভয়। সেই ভয় তাদের চেতনায় এক জলছাপ রেখে গেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই ভয়কে বহন করে আসছে। তাদের কাছে তাই 'গজিরা' (যাকে আমরা চিনি গডজিলা নামে) কোনও নিছক স্বপ্ন নয়। তা যেন ইতিহাসের এক ভয়াবহ অধ্যায়ের বিকল্প রূপ। যে ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে জাপানিদের চেতনায়। যদিও গডজিলার 'ইমেজ' শুরুতে যা ছিল, আজ আর তা নেই। তবু... সেই ভয়াবহ দিনগুলোকে কি ভুলে যাওয়া যায়?

শুধু তো গডজিলা নয়, এই ধরনের কাল্পনিক বিচিত্রদর্শন মনস্টার যাদের 'কাইজু' গোত্রের সিনেমাতে দেখা যায়, তাদের সকলেরই কল্পনার পিছনে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিরোসিমা-নাগাসাকির ছায়া, এ কথা বলাই যায়। এই সব বিরাট বিরাট দৈত্যাকার প্রাণী পাঁচের দশক থেকে দাপিয়ে বেড়িয়েছে জাপানি সিনেমাগুলিতে। তবে গডজিলা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। পরবর্তী সময়ে তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে অতিকায় রোবটরা, যাদের দেখা মেলে 'মেকা' জঁরের কাহিনিতে। কিন্তু সে কথা পরে। আপাতত গডজিলার জন্মবৃত্তান্ত।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

পর্দায় শ্বাসরোধ করে দেয় এই সব দৃশ্য

এক যুদ্ধবন্দি ও দুঃস্বপ্নের যুগ

চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল চারপাশ। নিউ মেক্সিকোর ভোর সাড়ে পাঁচটা। বিস্ফোরণ গলিয়ে দিয়েছিল একশো ফুটের দীর্ঘ টাওয়ার। দূর-দূরান্তের বাসিন্দারা চোখ কচলে দেখেছিল, আজ দুবার সূর্য উঠল কিনা!

১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই। সামান্য কদিন পরেই হিরোসিমা-নাগাসাকি বিস্ফোরণ। তার আগেই হয়েছিল এই পরীক্ষা। কমলা রঙের কুণ্ডলী পাকানো সেই বিষ-মেঘের দিকে তাকিয়ে গীতার শ্লোক উচ্চারণ করে বসেছিলেন ম্যানহাটন প্রোজেক্টের সর্বময় কর্তা রবার্ট ওপেনহাইমার। তাঁর মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল গীতার যে শ্লোক, সেখানে পরমাত্মার জ্যোতির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল 'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা'-র কথা। হাজারটা সূর্য! গীতার শ্লোকের সেই বিপুল দ্যুতি ও শক্তির প্রকাশকে মনে পড়েছিল ওপেনহাইমারের।

অনেকেই আন্দাজ করেছিলেন পরমাণু বোমা ফেলা হলে কী ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটনা হল সকলের কল্পনাকেও কয়েক মাইল পিছনে ফেলে দিয়েছিল হিরোসিমা ও নাগাসাকির ঘটনা।

বোমা বিস্ফোরণ, মৃত্যু ও ধ্বংসের করুণ চিত্র পৃথিবী কম দেখেনি তার আগে। কিন্তু ১৯৪৫-এর ৬ ও ৯ আগস্ট যে ভয়াবহ ও ক্রমান্বয়ে চলতে থাকা মৃত্যুমিছিল রচনা করল, তেমনটা এই নীল রঙের গ্রহ কক্ষনও দেখেনি। শুধু কি তাই! মৃত্যুর বিকট বীভৎসতা? সেও ছিল অভূতপূর্ব। অথচ ওই ঘটনার আগেই কিন্তু জাপানের নৌশক্তি প্রায় নিঃশেষিত। একটি দ্বীপরাষ্ট্রের পক্ষে এর পরে আর মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। তবু আমেরিকা এ কাণ্ড ঘটিয়েছিল।

জাপানিদের অনমনীয় মনোভাব, তাদের দুর্দমনীয় স্পিরিটকে সহজে কাবু করতে পারা যায়নি। হিরোসিমায় পরমাণু বোমা ফেলার পরেও তাই তারা আত্মসমর্পণের কথা ভাবেনি। কিন্তু নাগাসাকিতে দ্বিতীয় বিস্ফোরণের পরে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর উপায় ছিল না। একটা রটনা ক্রমেই ছড়াচ্ছিল যে, তিনদিন পর এবার টোকিয়োতেই নিক্ষিপ্ত হবে আরেকটি পরমাণু বোমা। শেষমেশ তরুণ সম্রাট হিরোহিতো আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করার পরে অবসান হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

আত্মসমর্পণের পরে জাপানে আত্মহত্যার এক মহামারিই যেন দেখা দিয়েছিল। আসলে আপ্রাণ লড়াই করেও স্রেফ টেকনোলজির দাপাদাপির তলায় পিষ্ট হয়ে হার স্বীকার করে নেওয়াটা সেদেশের মানুষ মেনে নেননি। এত কথা বলতে হল, কারণ জাপানের কল্পবিজ্ঞান সিনেমার এই সব অতিকায় মনস্টার বা কাইজু যে কেবল ছেলেভোলানো কল্পনা নয়, বরং তাদের সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক বিদীর্ণ ইতিহাস সে কথা বলা একান্তই জরুরি।

ইশিরো হন্ডা। গডজিলার প্রথম ছবির পরিচালক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন যুদ্ধবন্দি। হিরোসিমা-নাগাসাকির ওই নারকীয়

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

পরিবেশের দৃশ্য তাঁর মনের মধ্যে যে অনুরণন তুলেছিল তা-ই শেষমেশ সৃষ্টি করেছিল গডজিলার অতিকায় ও জীবনধ্বংসী মূর্তি। তাঁর স্ত্রী কিমি হন্ডার কথায়, 'উইদাউট দ্য বম্ব দেয়ার কুড নট হ্যাভ বিন এ মনস্টার।' এই একটি বাক্যেই ধরা আছে গডজিলার জন্মবৃত্তান্ত।

প্রথম গডজিলা 'গজিরা' (১৯৫৪)-এর একটি দৃশ্য

লাকি ড্রাগন, হিবাকুশা এবং পর্দার বিরাট দানব

গডজিলার জাপানি নাম গজিরা, আগেই বলেছি। এই গজিরা নাকি এসেছে গরিলা আর তিমি (কুজিরা) থেকে। অর্থাৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট জল ও ডাঙার দুই দৈত্যাকার প্রাণীর সংকর হিসেবে প্রাথমিকভাবে কল্পনা করা হয়েছিল গডজিলাকে (অবশ্য ভিন্নমতও আছে)। অতিকায় এক সর্বগ্রাসী, অপরাজেয় দানব যার নিশ্বাসে ঠিকরে বেরোয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি! পায়ের তলায় পাঁপড়ভাজার মতো গুঁড়িয়ে যায় বাড়ি-ঘর-ব্রিজ সবকিছু।

ছবির অনুপ্রেরণা হিসেবে কিং কং-এর কথা জানা যায়। আরও একটা ছবি 'দ্য বিস্ট ফ্রম ২০,০০০ ফ্যাদমস'। সেখানে একটা অতিকায় ডাইনোসর এসে শহর তছনছ করে দেয়। সেই ছবিটাও মাথায় ছিল হন্ডা সাহেবের। কিন্তু গডজিলা চেহারা ও বৈশিষ্ট্যে মোটেই এদের 'কপি' নয়। বরং মনস্টারদের এই সব চেনা চেহারার সঙ্গে নতুন কল্পনাকে মিশিয়ে এমন একটা মনস্টার তৈরি করা হল, যা একেবারেই আলাদা।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে আরও একটা ঘটনা ঘটল, যেটা জাপানিদের স্নায়ুতে নতুন করে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। পরীক্ষার আগে সমস্ত জাহাজ বা বোটকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও 'লাকি ড্রাগন ৫' নামের মাছধরা বোটটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। যদিও তারা বিস্ফোরণের কেন্দ্রের সত্তর মাইল দূরে ছিল। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিষের কাছে সেটা কোনও দূরত্বই নয়। বোটের লোকজন বা মাছ সবই হয়ে ওঠে তেজস্ক্রিয়। কাগজে এই খবর পড়ার পরে আতঙ্ক ছড়াতে থাকে সকলের মনে। কোনওভাবে যদি তেজস্ক্রিয় মাছ বাজারে চলে আসে, আর সেটা কেউ খেয়ে ফেলে তাহলে তারাও হয়ে যাবে সেই তেজস্ক্রিয়তার শিকার!

এর আট মাস পরে ৩ নভেম্বর রিলিজ হয় গডজিলা। ছবির প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় একটা মাছধরা বোট গিয়ে পড়ছে ব্যাখ্যাতীত একটা উজ্জ্বল আলোর কবলে। সেই দৃশ্য মুহূর্তে দর্শকদের মনে করিয়ে দিয়েছিল লাকি ড্রাগনের কথা। বোটের অনেকেই তেজস্ক্রিয়তার শর্ট টার্ম এফেক্টের শিকার হয়েছিল। তাদের দেহে সেই তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে বলা হত 'হিবাকুশা' অর্থাৎ বোমা আক্রান্ত ব্যক্তি। গডজিলাকে নির্মাণ করা হয়েছিল এক অতিকায় হিবাকুশা হিসেবে। যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের এক অসহায় শিকার। যেন সে মানব সভ্যতার এক জলজ্যান্ত দগদগে ঘা। মানুষের অকারণ হিংসা আর খামখেয়ালিপনার ফসল।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আতঙ্কে কাহিল হয়ে যাওয়া মুখগুলো আসলে যুদ্ধ-পরবর্তী জাপানের মুখচ্ছবি

ছবিতে গডজিলার ধ্বংসলীলার চেয়েও যেটা বেশি লক্ষ করা যায়, সেটা হল তার আক্রমণের সামনে পড়ে যাওয়া মানুষদের ভয়ে ভীত মুখ! এই আতঙ্কে কাহিল হয়ে যাওয়া মুখগুলো আসলে যুদ্ধ-পরবর্তী জাপানের মুখচ্ছবি।

ভিলেন থেকে অ্যান্টিহিরো

১৯৫৪-এর প্রথম গডজিলার মুক্তির পর থেকে পরবর্তী সময়ে গডজিলার সিনেমাগুলিতে কল্পনার আধিক্য তার এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু বাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর স্পেশাল এফেক্টের যত উন্নতি হয়েছে তত চোখ ধাঁধানো হয়ে উঠেছে সিনেমাগুলো। কিন্তু অনেকের মতে, ছয়ের দশকের শেষে ও সাতের দশক জুড়ে এমন সব 'গডজিলা মুভি' তৈরি হয়েছে যেগুলি সস্তা বিনোদন মাত্র। ছবির ধাঁচের মধ্যেও কোনও নতুনত্ব নেই। বলাই বাহুল্য, গডজিলার ফ্যানরা এইসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। হিরোসিমা-নাগাসাকির ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিণতির পরেও কিন্তু পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হয়নি। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পাগলামির বিরুদ্ধে গজিরার বক্তব্য এত জোরালো ছিল, সারা পৃথিবীর মননশীল মানুষ সেই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ছবির শেষে প্রটাগনিস্ট ইয়েমেনের এরকম একটা বক্তব্য ছিল যে, অনেক কষ্টে একটা গডজিলাকে ধ্বংস করে ফেলা গেছে। যদি মানুষ সচেতন না হয়, পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতেই থাকে, তাহলে আবার একটা গডজিলা জন্ম নিতে পারে যখন তখন।

এটাই ছিল ছবির মূল বার্তা। এরপর ১৯৫৬ সালে হন্ডা সাহেবের 'গজিরা' পাড়ি দেয় হলিউডে। অনেক এডিট করে গডজিলাকে আমেরিকান বানিয়েছিলেন টেকনিশিয়ানরা। স্বাভাবিক ভাবেই, ছবির যে অংশগুলির রাজনৈতিক-সামাজিক বক্তব্যগুলি তাদের পছন্দ হয়নি, সেগুলো ছেঁটে ফেলা হয়। পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কিত 'বাড়াবাড়ি-সূচক' (অবশ্যই তাদের মতে) অংশগুলিও। এইভাবে বাদ যায় প্রায় ষোলো মিনিটের ফুটেজ। বেশ কিছুটা অংশের শুটিং হয় নতুন করে। ছবির নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় 'কিং অফ মনস্টারস'। এইভাবে আমেরিকা কায়দা করে বদলে দেয় গডজিলার আদব কায়দা। তার বিরাট আকার ও ধ্বংসলীলার দিকে ফোকাস করে বড় পর্দা কাঁপানো দানবের রাজা এক মহাতারকায় পরিণত করে দেয় তাকে। যেখানে বিনোদনই হয়ে ওঠে একমাত্র লক্ষ্য। কোথায় যেন হারিয়ে যেতে থাকে ইশিরো হন্ডার মেসেজ।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সভ্যতার দিকে আরেকবার ক্রুদ্ধ পা ফেলা

আর এখানেই কোথায় যেন খর্ব করে দেওয়া হয় কল্পবিজ্ঞানের অসীম শক্তিকেও। কল্পবিজ্ঞান মানে কেবল ভিনগ্রহীর আক্রমণ কিংবা ইচ্ছেমতো অতীত ভবিষ্যতে চলে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করা নয়। মনোরঞ্জনের পাশাপাশি সমাজ-দর্শন-ইতিহাস চেতনার প্রতিফলনই তাকে সার্থক করে তোলে। যে কোনও শিল্পেরই সেটা মূল উদ্দেশ্য। কাজেই গডজিলার ভয়াল ভয়ঙ্কর চেহারার মেটাফরের আড়ালে যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিলেন ইশিরো হন্ডা, সেটাকে বিনোদনের উজ্জ্বলতার আড়ালে ম্লান করে দিয়ে কাহিনির আসল স্পিরিটকেই যেন হারিয়ে দেওয়া হল।

গডজিলা ভার্সেস...

এরপর সময় বদলেছে। জাপান ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়েছে গডজিলা-জ্বরে। জাপানের বিখ্যাত ফিল্ম ও থিয়েটার কোম্পানি তোহো কোম্পানি লিমিটেড গডজিলাকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত ২৯টা ছবি বানিয়েছে। শুধু গডজিলা নয়, এই ধরনের অতিকায় প্রাণী আর তাদের কাণ্ডকারখানা জাপানের মানুষের খুব পছন্দের। আগেই জানিয়েছি, এরা সবাই 'কাইজু' জঁরের শ্রেণিভুক্ত। তবে গডজিলা নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তায় এদের সকলের থেকে অনেক অনেক এগিয়ে।

'কিং কং ভার্সেস গডজিলা' ছবির একটি দৃশ্য

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এত বছরে অবশ্য গডজিলার চেহারায় বিরাট কিছু পরিবর্তন হয়নি (তবে দৈর্ঘ্যে সে বোধহয় পরের দিকে আরও বড় হয়েছিল)। কিন্তু তার চরিত্রে বদল এসেছে বিস্তর। আর সেটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী জাপানও তো বদলেছে। সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক সমীকরণ, পারমাণবিক নীতি ইত্যাদির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গডজিলাও আর নিছক পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হওয়া এক নারকীয় দানব হয়েই থেকে যায়নি। হয়ে উঠেছে এক অ্যান্টিহিরো। যে আর আচমকা হানা দিয়ে শহর ধ্বংসে মত্ত হয় না। বরং বিপদের মুহূর্তে এসে দাঁড়ায় রক্ষাকর্তা হয়ে।

বহু ভয়ঙ্কর দানবের হাত থেকে জাপানকে বাঁচিয়েছে গডজিলা। তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক কিং ঘিডোরা, মথরা, রোডান, হেডোরা। এদের পাশাপাশি রয়েছে আমাদের চিরচেনা কিং কং-ও। আরেকজনের কথাও বলা উচিত। মেকাগডজিলা। নাম থেকেই মালুম হয়, সে গডজিলারূপী বিরাট যন্ত্রদানব ('মেকা' গোত্রের কাহিনিতে যেমনটা দেখা যায়)। ছোটোবেলায় যারা পর্দায় এই সব দানবের সঙ্গে গডজিলার মহারণ দেখেছে, তারা জানে হলের অন্ধকারে বিরাট পর্দায় কী দুরন্ত ম্যাজিক উপহার দিয়েছে এই সব প্রকাণ্ড না-মানুষেরা।

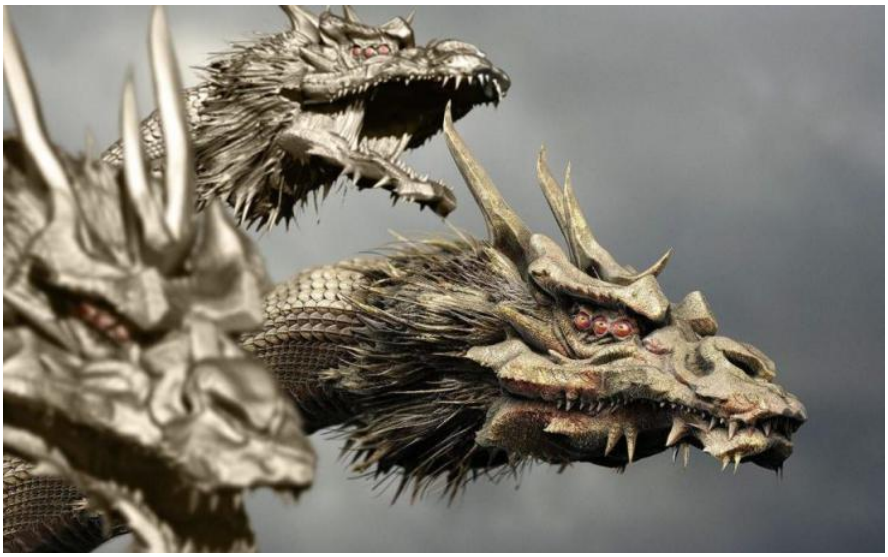

কিং ঘিডোরা

গডজিলার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু কিং ঘিডোরা। তিন মাথাওয়ালা এক প্রকাণ্ড ড্রাগন, যার মুখ দিয়ে বেরোয় মারণরশ্মি। ডানার ঝাপটায় শহর জুড়ে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব। উড়ে যেতে থাকে ঘরবাড়ি। গডজিলা এই দুর্ধর্ষ দুশমনকে একা কোনওদিনই হারাতে পারেনি! সঙ্গী মনস্টারদের সাহায্য নিয়ে তবেই তাকে শহরছাড়া করতে পেরেছে। তবে এত শক্তি নিয়েও অবশ্য কিং ঘিডোরা কখনও হারাতে পারেনি গডজিলাকে। কিং কং-ই একমাত্র শত্রু যার কাছে (সেই পর্বের ছবিগুলিতে) হার মেনেছিল গডজিলা। কং অবশ্য এদের দলভুক্ত নয়। তাকে বলা হয় হিউম্যানয়েড মনস্টার (জাপানে তাকে বলা হয় কাইজিন)।

গডজিলার পরেই সবচেয়ে জনপ্রিয় মনস্টার হল মথরা। ১১টা গডজিলা ছবিতে তাকে দেখা গেছে। প্রকাণ্ড এই মথ ঠিক ঠিক 'আদ্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য' ধরনের নয়। সে পৃথিবীকে বারকয়েক বাঁচিয়েছেও। সাহায্য করেছে গডজিলাকেও। ঠিক রোডানের মতোই। রোডান এক প্রকাণ্ড প্রাগৈতিহাসিক পাখি। সময় বিশেষে সে গডজিলাকে সাহায্যও করেছে। তবে মথরা বা কিং ঘিডোরা কিন্তু গডজিলার সঙ্গে মোলাকাতের আগেই পর্দায় দেখা দিয়েছে। সেই ছবিগুলিতে একমাত্র কাইজু ছিল তারা নিজেরাই।

জাপানের তোহো কোম্পানির এই ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য গডজিলার সঙ্গে এই সব প্রাণীদের লড়াই। তবে গডজিলার ছবি ছাড়াও জাপানের সংস্কৃতি জুড়ে রয়েছে কাইজু। যদিও সব মনস্টারের রাজা গডজিলাই। সে জাপানের পর দখল নিতে শুরু করে হলিউড ও ইউরোপের ফিল্ম দুনিয়ারও। হয়ে ওঠে জাপানি-আমেরিকান পপ সংস্কৃতির এক প্রতীক। টোকিয়ো শহরের একাধিক জায়গায় গডজিলার নানা রকম স্ট্যাচু বসানো হয়েছে। জাপানের শিনজুকু জেলার পর্যটন দূত করা হয়েছে গডজিলাকে। শিনজুকু শহরের মেয়র কেনিচি ইয়োশিজুমি তাঁদের প্রিয় গজিরাকে সেই শহরের 'পর্যটন দূত' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। জাপানি সিনেমার শ্রেষ্ঠ আইকন এখন ট্যুরিস্টদের কাছেও বিরাট আকর্ষণের জায়গা। সে আসলে গোটা জাপানেরই 'সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত'।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সারা জাপানের পরম আত্মীয় 'গডজিলা'

উড়ুক্কু রোবট ও ছেলেবেলা

জাপানি কল্পবিজ্ঞান সিনেমা বা টিভি সিরিজগুলির একটা জনপ্রিয় ধারা যদি 'কাইজু' হয়, অন্যটা অবশ্যই 'মেকা'। বিরাট আকার ও আকৃতির রোবট এই ধরনের কাহিনির মুখ্য আকর্ষণ। আসলে সেই 'গডজিলা' থেকেই জাপানিদের কাছে বিরাট 'লার্জার দ্যান লাইফ' উপাদানগুলির আবেদন তুমুল। সেই পথ বেয়েই এসে পড়েছিল মেকা। যা পরবর্তী সময়ে জাপানি 'অ্যানিমে'-র (অ্যানিমেশন) দুনিয়ায় রীতিমতো বিপ্লব এনে দেয়। ১৯৯৮ সালে হলিউডে নির্মিত 'গডজিলা' ছবির ক্যাপশনের কথা এই সূত্রে মনে পড়ে গেল---'সাইজ ডাজ ম্যাটার'। এই ক্যাপশন কেবল গডজিলা নয়, সমস্ত কাইজু ও মেকা জঁরের কাহিনিরই মূল কথা।

মেকা জঁরের কাহিনিতে যে রোবটগুলির দেখা মেলে তারা সেই অর্থে 'স্বাধীন' নয়। তাদের নিয়ন্ত্রণ করে মানুষই। কখনও রিমোটে, কখনও নিজেরাই তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের পাইলট হয়ে! সেই কোন আদি যুগে, কল্পবিজ্ঞান যখন সবে হাঁটি হাঁটি পা পা, এইচ জি ওয়েলসের কালজয়ী 'ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস' উপন্যাসে দেখা মিলেছিল ফাইটিং মেশিনের। কিংবা তারও আগে জুল ভের্নের 'দ্য স্টিম হাউস' উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটেছিল যান্ত্রিক হাতির। সেই কল্পনাই পরবর্তী সময়ে মেকার জন্ম দেয় জাপানে।

প্রথমদিকের মেকা-কাহিনিতে রিমোট কন্ট্রোলের ব্যবহারই দেখা যেত। যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জনি সোকো অ্যান্ড হিজ ফ্লাইং রোবট। কলকাতা দূরদর্শনের আদি যুগে সাদা-কালো টিভির পর্দা বেয়ে যে ঢুকে পড়েছিল কলকাতার ড্রয়িংরুমে। কলকাতা তথা সারা দেশের ছোটদের কাছেই, যারা ছেলেবেলা কাটিয়েছে আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে নয়ের দশকের প্রথমার্ধে, তাদের কাছে এই টেলি-সিরিয়ালটির আবেদন আজও মারাত্মক। ইচ্ছেমতো ইন্টারনেট ঘেঁটে পুরোনো সেই সিরিয়ালের এপিসোডগুলো দেখলেই মনকেমন করে ওঠে।

গডজিলা ও কিং কং-এর দ্বৈরথ কলকাতা দূরদর্শনের 'ছুটি ছুটি'-র এক মুখ্য আকর্ষণ ছিল। তবে জনি সোকো নামের এক বাচ্চা ছেলে ও তার আশ্চর্য যন্ত্রমানবের কাণ্ডকারখানা ততদিনে কলকাতার মন জিতে নিয়েছে। গডজিলার আগেই তারা এসে পৌঁছেছিল এখানে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

জনি সোকো ও তার রোবট

জাপানি 'জায়ান্তো রোবো' আমেরিকায় গিয়ে 'জনি সোকো অ্যান্ড হিজ ফ্লাইং রোবট' হয়েছিল। তবে ভায়োলেন্সের আধিক্যের (ছয়ের দশকের আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডস ফর চিল্ড্রেন প্রোগ্রামিং অনুসারে) কারণে খানিকটা এডিট করা হয়েছিল। সিরিয়ালের মূল আকর্ষণ ছিল গারগোয়াল গ্যাংয়ের পাঠানো মনস্টারদের সঙ্গে রোবটের দ্বৈরথ। গ্যাংয়ের নেতা ছিল গিলোটিন নামের এক বিকটদর্শন প্রাণী। সমুদ্রের তলায় এক রঙচঙে মহাকাশযানে বসে সে তার নির্দেশ পাঠাত। বিভিন্ন সময়ে অদ্ভুতদর্শন সব প্রাণী সে পাঠাত পৃথিবীর বুকে। সেই সব অদ্ভুত চেহারা ও বৈশিষ্ট্যের মনস্টারদের সঙ্গে রোবটের লড়াই ছিল জমজমাট। একেবারে শেষে এসে গিলোটিন মুখোমুখি হয় উড়ুক্কু রোবটের। বিরাট আকার ধারণ করে নিজেকে পৃথিবীর সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে সে। উড়ুক্কু রোবটের উপায় ছিল না তাকে ধ্বংস করার। কারণ গিলোটিনের শরীরে ছিল পারমাণবিক শক্তি। শেষমেশ তাকে সঙ্গে করে মহাকাশে চলে যায় জনির প্রিয় রোবট। এক বিরাট বিস্ফোরণে গিলোটিনের সঙ্গে নিজেকেও ধ্বংস করে ফেলে সে। তার আত্মাহুতিতে পরমাণু বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পায় পৃথিবী। এই সিরিজেও এভাবেই এসে পড়ে পারমাণবিক শক্তির উল্লেখ, যা দারুণভাবে গল্পের পরিণতিকেও প্রভাবিত করে। এর থেকে বোঝা যায়, হিরোসিমা-নাগাসাকির সেই অভিশাপকে জাপান কিছুতেই ভুলতে পারেনি।

যাই হোক, মেকার কথাই যখন উঠল তখন 'অ্যানিমে' ও 'মাঙ্গা'র কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জাপানের অ্যানিমে সারা পৃথিবীর আনিমেশনের ভক্তদের কাছে প্রচণ্ড প্রিয়। ১৯০৭ সালে জাপানি অ্যানিমের জন্ম। পরবর্তী সময়ে ওয়াল্ট ডিজনির সাফল্যের স্রোত জাপানেও পৌঁছোয়। ডিজনির কিছু ছবি জাপানি প্রেক্ষপটে তৈরি হয় জাপানে।

এরপর নতুন করে জোয়ার আসে সাতের দশকে। সেই সময় থেকে জনপ্রিয় হতে থাকে মাঙ্গা। ইংরেজিতে যা কমিকস, তা-ই জাপানে মাঙ্গা। তবে কমিকস মানেই নিছক শিশুতোষ 'ছবিতে কাহিনি' বোঝানোর সরলীকরণ দেখা যায় আজকাল, মাঙ্গা মোটেই তেমন নয়। কমিকস ও গ্রাফিক নভেলের এক উৎকর্ষ রূপ আমরা পাই মাঙ্গাতে। মাঙ্গাতে অ্যাডাল্ট উপাদানও আকছার দেখা যায়।

এই মাঙ্গার জনপ্রিয় কাহিনিগুলি নিয়ে একে একে তৈরি হতে থাকে অ্যানিমে। এই ধরনের অ্যানিমের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে দৈত্যাকার রোবট। হইচই পড়ে যায় জাপান জুড়ে। পরে আটের দশকে এসে আনিমে জাপানের মূলধারার শিল্পে উন্নীত হয়। আর তারপর থেকে টেকনোলজির যত উন্নতি হচ্ছে ততই যেন জনপ্রিয়তার পারদ চড়ছে অ্যানিমের।

তবে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এই লেখায় নেই।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হাল আমলের মেকা অ্যানিমে

প্যাসিফিক রিম

এবং প্যাসিফিক রিম।

এই লেখার স্বল্প পরিসরে আরও অনেক কিছুই ছুঁয়ে যাওয়া হল না। কিন্তু প্যাসিফিক রিমের কথা বলতেই হবে। মেকা ও কাইজু দুই জঁর মিলেমিশে এক অনন্য সাধারণ বিনোদন তৈরি হয়েছে এই ছবিতে। হাল আমলের এই ছবি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় এক উত্তুঙ্গ উচ্চতাকে স্পর্শ করেছে।

প্যাসিফিক রিম

ছবিটা হলিউডে নির্মিত হলেও তোহো কোম্পানির তৈরি ছবিগুলির বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। পাঁচ-ছয়-সাতের দশকের পরের কয়েক দশকে স্পেশাল এফেক্টেসের বিরাট উন্নতি হয়েছে। ফলে এই ছবিতে বিনোদনের যে পরিপূর্ণ প্যাকেজ, তা এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০১৩ সালের এই ছবিতে দেখা গেছে, সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসছে একের পর এক কাইজু। তাদের অঙ্গসজ্জায় রয়েছে জাপানি আর্টের চিহ্ন। মানুষ তাদের সঙ্গে পারবে না, সেটা সহজেই অনুমেয়। ফলে তৈরি করা হল বিরাট চেহারার যন্ত্রমানবদের। যাদের নাম জায়েগারস। দৈত্যাকার এই রোবটদের নিয়ন্ত্রণ করেন দুজন পাইলট। একে অপরের সঙ্গে তারা মানসিক দিক দিয়ে সংযুক্ত। ছবি জুড়ে রয়েছে চোখ ধাঁধানো সব

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কাণ্ডকারখানা। ছবিটির বাণিজ্যিক সাফল্য আরেকবার নতুন করে প্রমাণ করে দেয়, আজও এই বিশাল কাইজু ও বিরাট মেকাদের মানুষ কতটা ভালোবাসেন।

ছোটোবেলা থেকেই এই ধরনের জাপানি ছবির তুমুল অনুরক্ত ছিলেন ছবির পরিচালক ডেল টরো। এর জন্মকথা ও তার ঐতিহ্যের কথা তাঁর ভালোভাবেই জানা। তাঁর কথায়, 'আমি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছি। যেটা আসলে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষত থেকে সেরে ওঠার একটা প্রক্রিয়া।'

এভাবেই আদ্যিকালের গডজিলা এসে জুড়ে যায় হাল আমলের জনপ্রিয় পরিচালকের চেতনাস্রোতের সঙ্গে। বুঝিয়ে দিয়ে যায়, সে আজও কতটা প্রাসঙ্গিক। পাশাপাশি আমরাও টের পাই কীভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণের হিম আতঙ্ক থেকে জন্ম নেওয়া এক ধারা পরবর্তী সময়ে নানা রূপের ভিতর দিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে চলছে। আর জন্ম দিচ্ছে নিত্যনতুন জনপ্রিয় শিল্পের।

অলঙ্করণ: সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অন্যান্য সমস্ত দেশের থেকে, জাপানের সহজাত ভাবে চির-অগ্রসর ও আধুনিক হওয়ার কারণ কি? আমি যখন ছোট ছিলাম, আমেরিকাই তখন ছিল ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। আর জাপানের নাম শোনা যেত পুরনো টিনের রোবট আর নরম প্লাস্টিকের খেলনা মহাকাশচারী পুতুল বানানোর জন্যে। কিন্তু গত চার দশক ধরে, ভবিষ্যতের পৃথিবীর সাথে আমেরিকার বিশেষ সম্পর্কটি বিনষ্ট হয়েছে।

আশির দশকে, আমি এক বিশেষ শ্রেণীর কল্প-বিজ্ঞান লিখে বেশ পরিচিতি লাভ করলাম, যাকে অনেক সাংবাদিক সাইবারপাঙ্ক হিসাবে অভিহিত করেন। দেখলাম, অদ্ভুতভাবে জাপান অনেক আগেই এই জনপ্রিয় সংস্কৃতির সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসে আছে। এটা ভাবলে ভুল হবে যে জাপানে সাইবারপাঙ্ক নিয়ে বিরাট আলোড়ন চলেছিল, বা জাপানের সাহিত্যর মধ্যে আগে থেকেই সাইবারপাঙ্ক গোছের কিছু উপাদান বর্তমান ছিল – আসলে আধুনিক জাপান নিজেই ছিল সাইবারপাঙ্ক সংস্কৃতি। জাপানের অধিবাসীরা সেটা জানত এবং ওরা ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগই করত। আমার এখনো মনে আছে যেদিন এক তরুন জাপানী সাংবাদিক আমাকে টোকিওর সিবুয়া* জায়গাটা দেখতে নিয়ে যায়। সুউচ্চ বহুতলগুলি থেকে হাজার সূর্যের আলোর মত নানারকম বিশাল বোর্ডের বিজ্ঞাপনের অ্যানিমেশনে ধুয়ে যাচ্ছিল আমার বন্ধুর মুখ, উত্তেজিত হয়ে সে বলেছিল "দেখছেন দেখছেন – এই হল সেই ব্লেড রানারের কল্পনার শহর"। সত্যিই তাই – এই শহরই তো দেখেছিলাম সিনেমায়।

পশ্চিমের একটা ধারনা আছে যে জাপান নাকি পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো ভবিষ্যতকে জিতে নিয়েছে – যেটা অনেকে জাপানের ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা করলে খুব বড়সড় ভুল হবে। ঐ অর্থনৈতিক উন্নতির বুদবুদ অনেকদিন আগে ফেটে গেলেও, জাপান কিন্তু আগের থেকেও অনেক বেশি আধুনিক, ভবিষ্যতদ্রষ্টা। সেটা কিভাবে?

এর উত্তরও, অনেক কিছুর মতোই লুকিয়ে আছে অতীতের গর্ভে।

বহুবছর বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর, মেইজি আমলে** জাপানিরা যেন হঠাৎ করেই এক ধাক্কায় "সভ্যতা এবং জ্ঞান" এর পথে চলার জন্য নিজেদের উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। যে যন্ত্রসভ্যতাকে তারা আপন করে নিয়েছিল, তা তাদের পূর্বেকার জীবনযাত্রার তুলনায় ভীনগ্রহী সভ্যতা ছিল। এই সভ্যতার বেশ খানিকটা তারা ব্রিটিশদের থেকে নিয়েছিল – বলতে গেলে পুরো শিল্প বিপ্লব এবং রেল ব্যবস্থাই। কেবল লণ্ডন থেকে টোকিয়তে সভ্যতার এই স্রোত যেভাবে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছিল, সারা ইংল্যান্ড থেকে বাকি জাপানে তার অতটা প্রভাব পড়েনি। কারন, লন্ডন তখন তথ্য, জ্ঞান এবং বিপুল পুঁজির এক কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যা উৎপাদন শিল্পের অগ্রগতির প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিল। সারা ইংল্যান্ডে শিল্প উন্নতির রমরমা দেখে জাপানিরা ভীষনভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল। অপরিমিত মাত্রার এই সংক্রমণে প্রথমে তারা উন্মাদ হয়ে গেল – এবং তার অভিঘাতে বিচ্ছিন্ন এবং বিদীর্ন হয়েও, শেষ অবধি বেঁচে রইল।

জাপানের মধ্যে যে অংশটা টিঁকে ছিল, সেটাই এশিয়ার প্রথম শিল্পোন্নত দেশের জন্ম দিল – অস্বাভাবিক মানসিক টানাপোড়েন এবং অগ্রগতির মূল্যে হিসেবে। এটা হবারই ছিল। আমরা জানি যে এই একই যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশদেরও যেতে হয়েছিল, যা আধুনিকতার পথে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

চলার অভিঘাত হিসাবে পরিচিত। কিন্তু ব্রিটিশদের এই অভিঘাত প্রধানত এসেছিল নিজেদের ভেতর থেকেই – তাই এটা প্রত্যাশিত না হলেও, অচেনা ছিল না। কিন্তু মেইজির জাপানিরা একদম বিদেশী প্রযুক্তি হজম করতে গিয়ে সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থায় পড়ল। কিন্তু সেখানে না থেমে, চোঁয়া ঢেঁকুর তুলতে তুলতেই সময়ের পথে দিশাহারা জাপান প্রচন্ড গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল; প্রায়-প্রাণঘাতী মাত্রার প্রযুক্তি সহযোগে ভাবীকালকে আলিঙ্গন করার নিবিড় তাড়নায়।

ফলস্বরূপ, কয়েক দশক পর, জাপান এক সামরিক-শিল্পোন্নত দেশে পরিনত হলো (আবার এশিয়ার প্রথম) – যার বেশিরভাগ শক্তি ব্যয়িত হতে থাকল আঞ্চলিক যুদ্ধে ব্যস্ত থেকে। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধং দেহী ভাবের জন্যই এরা যুক্তরাষ্ট্রর সাথে সামরিক কলহে জড়িয়ে পড়ল – সেই যুক্তরাষ্ট্র যেখানে শিল্পবিপ্লবের পর অনাগত ভাবীকাল পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় পেয়েছিল। আমেরিকার সাথে যুদ্ধের কিছুদিন পরেই জাপান দেখতে পেল, তার দুটো শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে - এমন এক অস্ত্রের আঘাতে, যা এক ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির দান। জাপানের শত্রু যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে, তা তৎকালীন সময়ের তুলনায় অনেক অনেক এগিয়ে। শত্রুর কাছে এমন এক অচেনা শক্তিশালী মারনাস্ত্র বর্তমান, যার কাছে মেইজি যুগের সেরা প্রযুক্তিবিদদের কুক্ষিগত সর্বোতকৃষ্ট অস্ত্রও খেলনাবাটির সামিল। এদিকে যুদ্ধের প্রায় শেষের দিকে, মিত্রশক্তির কাছে এসে গেল প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার, অক্ষ শক্তির একের পর এক গোপন সংকেত উন্মোচিত হতে লাগল অবহেলায়। যুদ্ধের প্রযুক্তি পরিণত হল প্রযুক্তির যুদ্ধে।

জাপান পরাজিত হল এবং তার সাথে সাথে এক বিদেশি শক্তি জাপানকে অধিগ্রহন করল, আমূল সামাজিক পরিবর্তন সাধনের অভিপ্রায়ে। এশিয়ার ইতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব। আমেরিকা স্থির করল, জাপানের জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে জাপান আর এভাবে আমেরিকার শক্তিবিস্তারে অসুবিধের সৃষ্টি করতে না পারে। যদিও আমেরিকার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। জাপানের সামাজিক ও সংস্কৃতিক কাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস করে বিদেশী সাম্যবাদী চিন্তাধারা আমদানি করার আগেই, আমেরিকাকে কমিউনিজমের জুজুর ভয়ে অন্য দিকে নজর দিতে হল।

যুদ্ধ পরবর্তী জাপান যেন একই চামড়ার আবরণে ঢাকা দুটি আলাদা প্রানী। ক্রমশই বাড়তে থাকা মানসিক যন্ত্রনা নিয়ে মূহুর্মুহু এবং প্রচন্ড বেগে পরিবর্তনরত সময়ের সরণীপথে ঘুরপাক খেতে খেতে জাপানে জন্ম নিল এক সংকর সংস্কৃতি। পরবর্তী পঞ্চাশ বছর জাপান প্রতিটা ক্ষেত্রেই, কি উৎপাদনে, কি তার বিপণনে -আমেরিকাকে ছাপিয়ে চলে গেল – যে কিনা যুদ্ধপরবর্তীকালে আমেরিকারই হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে আমেরিকা, যে নিজেকে বিজয়ী ভাবতেই মশগুল ছিল, জানতেও পারল না – অজান্তে তারা এক এমন শক্তির জন্ম দিয়েছে, যে হারতে জানে না।

এটা মোটেই আশ্চর্যের হবে না যদি বলি, আধুনিকতা এখন জাপানেই নিহিত। কিন্তু তা বললে আসলে উলটো বলা হয়। জাপানই এখন ভবিষ্যতে বাস করে, আধুনিকতায় স্বপ্ন দেখে। আর প্রায় এক শতাব্দী ধরে তারা সেভাবেই আছে। ক্রমাগত প্রযুক্তির পরিবর্তনের বলি হয়ে, সময়ের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে, অথচ গতানুগতিক সংস্কৃতিকে আঁকড়ে, হঠাৎ বিনা ঘোষনায় নিজেদের পরিবর্তন ঘটিয়ে, আজ আমরা সবাই যেন কিছুটা অচেনা, অস্বাভাবিক এবং বিকৃত হয়ে পড়েছি।

জাপান আসলে এই প্রক্রিয়াটা অনেক আগেই শুরু করতে পেরেছিল।

*সিবুয়া: টোকিও শহরের একটি বিশেষ অংশ। নৈশজীবন, বিনোদন ও বানিজ্যকেন্দ্র রূপে বিখ্যাত। এটি শহরের সবথেকে ব্যস্ত রেলস্টেশন ও বটে।

**মেইজি যুগ: সম্রাট মেইজির রাজত্বকালকে (১৮৬৮-১৯১২) জাপানে মেইজি যুগ বলা হয়। এই সময় সামন্ততান্ত্রিক জাপানের অবসান ঘটে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর জাপানের আবির্ভাব ঘটেছিল। সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতি, শাসনব্যাবস্থা, অর্থনীতি থেকে বৈদেশিক নীতি সবক্ষেত্রেই পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল জাপানে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

লেখক পরিচিতিঃ

উইলিয়াম ফোর্ড গিবসন

একজন বিখ্যাত আমেরিকান-কানাডিয়ান কল্পবিজ্ঞান লেখক। তার জন্ম হয় ১৯৪৮ সালে আমেরিকার সাউথ ক্যারোলিনায়। ১৯৭০ সাল থেকে লেখকজীবনের শুরু থেকেই তিনি নয়র ভবিষ্যতের গল্প লিখতে শুরু করেন। তার গল্পের বিষয়বস্তু বেশিরভাগ সময়েই - মানুষের উপর যন্ত্র সভ্যতা - বিশেষ করে কম্পীউটরের প্রভাব। একে তিনি ব্যখ্যা করেছেন - উন্নত প্রযুক্তির সাথে সমাজের অবক্ষয় রূপে। বর্তমান কল্পবিজ্ঞানের সাইবারপাঙ্ক গোত্রের জনক হিসাবে গিবসন বিখ্যাত হয়ে থাকবেন। তার বিখ্যাত বই নিউরোম্যান্সারকে সত্তরের দশকে কল্পবিজ্ঞানের আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠার প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হয়।

বাংলা অনুবাদ - সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এবং দীপ ঘোষ

অলঙ্করণ: সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

নদীর যেমন শাখা প্রশাখার মতই সাহিত্যেরও অনেক শাখা প্রশাখা থাকে। তার অনেকগুলিকেই আমরা বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাই, তারপরেও কয়েকটা শাখা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তেমনি একটা শাখার নাম হচ্ছে 'লাইট নভেল'।

'লাইট নভেল'-কে মূলত ইয়াং অ্যাল্ডাট ফিকশন বলা যায়। সাহিত্যের এই শাখার মূল উদ্ভাবক হচ্ছেন জাপানিরা। তারা ইয়াং অ্যাডাল্ট ফিকশনকে নিজেদের ভাষায় ভেঙে লাইট নভেল নাম দিয়েছে। লাইট নভেলের শব্দসীমা ৪০,০০০ - ৫০,০০০ শব্দের মধ্যে হয়ে থাকে, কারণ এর কমে থাকলে সেটা আমেরিকান পাবলিকেশন অনুযায়ী উপন্যাস বলা যায় না। তবে কিছু কিছু লাইট নভেল আছে যাদের শব্দসীমা ৫০,০০০ শব্দসীমা পার হয়ে যায়। আর অধিকাংশ লাইট নভেলেই কিছু আঁকা ছবি থাকে, সেটা পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্যেই। লাইট নভেল মূলত কিশোর-কিশোরীদের ঘিরেই লেখা হয়, তবে কিছু কিছু লাইট নভেলে পূর্ণবয়স্কদের কেন্দ্র করেও লেখা হয়। বাংলা ভাষায় তো নয়ই, এমনকি ভারতের অন্য কোন ভাষাতেও সাহিত্যের এই শাখা নিয়ে কাজ হয়েছে বলে জানা যায় না।

লাইট নভেলের ইতিহাস অনেক পুরোনো হলেও এর জনপ্রিয়তা এসেছে সম্প্রতি। এর আগে অধিকাংশ লাইট নভেলের ধরন ছিল আরপিজি (RPG)- বা রোল প্লেয়িং গেম-এর মত। বেশিরভাগ প্লটই থাকত ফ্যান্টাসি জগতকে কেন্দ্র করে। সেই সময় জনপ্রিয় লাইট নভেলের মধ্যে, স্লেয়ারস (Slayers), সোর্ড ম্যাজিক অরফেন (Sword Magic Orphen) উল্লেখযোগ্য।

লাইট নভেল শাখার জনপ্রিয়তা আসে সুজুমিয়া হারুহি সিরিজ বের হওয়ার পর থেকে। এই সিরিজের বইগুলি প্রথম প্রকাশ পায় জাপানে এবং ক্রমে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ ছড়িয়ে পরে সারা পৃথিবীতে। কাহিনী একটা মেয়েকে নিয়ে, যাকে কেন্দ্র করে পুরো পৃথিবী চলছে এবং এলিয়েন, এসপার, টাইম-ট্র্যাভেলারা মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে। কাহিনী সংক্ষেপ অনেক সাইন্স ফিকশন প্লটের মত শোনালেও এখানে সুজুমিয়া হারুহি নামের মেয়েটার দৈনন্দিন জীবনটাই ফুটে উঠছে।

এই সিরিজ বের হবার পর লাইট নভেল শাখাকে আর বসে থাকতে হয়নি, তাদের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে উঠেছে। বাইরের দেশগুলিতে থেকে তাদের বই বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হচ্ছে, এবং সেখান থেকে টিভি সিরিজের অ্যানিমেশন জগতে (Anime) অ্যাডাপ্টশন হচ্ছে।

লাইট নভেল জঁরেতে সাইন্স ফিকশন খুবই কম পাওয়া যায়, আর যে কয়টা পাওয়া যায় সেগুলো হাতে গোণা কয়েকজন লেখকই লিখে থাকেন। আমি তাদের নাম আর তাদের লেখা সিরিজগুলোর কথা উল্লেখ করছি, এছাড়া আরো কিছু সিরিজের নাম উল্লেখ করবো সেটার মধ্যে সাইন্স ফিকশন উপাদান থাকলেও তা গল্পের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়নি।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

১) কামিচি কাজুমা (Kamichi Kazuma):

এই লেখককে অনেকেই কাজুমা.exe বলে ডাকে। কারণ সে একটা মেশিনের মত একাধারে লিখে যাচ্ছেন, কোনো বিরতি নেই তার মাঝে। এনার লেখা একের পর এক বই বের হচ্ছে। ২০১৫ সালের হিসাব মতে, এই লেখক ১০টা লাইট নভেলের বই বের করেছেন এবং তাদের প্রকাশনার তথ্য অনুযায়ী উনি প্রতি মাসে একটা করে বই বার করেন। বইয়ের সাইজ কিন্তু পাতলা না, ৩০০ থেকে ৪০০ পেজের মধ্যে প্রতিটা বই। আর শুধু একটা সিরিজ লিখেই ক্ষান্ত হননি উনি একাধারে চারটে সিরিজ লিখে যাচ্ছেন তিনি।

উনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিরিজ হচ্ছে, তো আরু মাজুতসো নো ইনডেক্স (To Aru Majustsu no Index/ A Certain Magical Index)। এই সিরিজের মধ্যে দিয়ে তিনি লাইট নভেলের জগতে পা রাখেন। কাহিনী একটা হাইস্কুলের ছেলে কামিযৌ তৌমাকে নিয়ে, যে টোকিও শহরে মধ্যে একটি একাডেমি সিটিতে থাকে - যে শহর বর্তমান যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে। একাডেমি সিটিটা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, সেই ছাত্র-ছাত্রীগুলো আবার সাধারণ নয়। তারা এসপার ক্ষমতাধারী - মানে নিজেদের ইচ্ছায় তারা আগুন থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ পর্যন্ত তৈরী করতে পারে।

একদিন কামিযৌর তৌমার সাথে পরিচয় হয় ইনডেক্স নামের এক মেয়ের সাথে। মেয়েটা জানায় সে চার্চ থেকে পালিয়ে এসেছে এবং তারা মাথায় ১ লাখের মত জাদুর বই স্মৃতি হিসেবে জমা আছে। কিছু জাদুকর সেই জাদুর বইগুলো চায়। এর থেকে শুরু হয় কামযৌ তৌমার সাথে জাদুকরদের এক যুদ্ধ।

এই সিরিজের প্লটটির বিশেষত্ব হল যে জাদু আর সায়েন্স একই জগতের মধ্যে। এই সিরিজে যেমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কথা বলা হয়েছে তেমনি পুরোনো আমলের জাদুর বিষয় টেনে আনা হয়েছে। এবং তাদের মাঝের দ্বন্দ্বকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর কিন্তু এই জাদু আর বিজ্ঞান একত্রীকরণ নিয়ে কিন্তু বেশ কয়েকটা লাইট নভেল সিরিজ বের হয়েছে।

ইনডেক্স সিরিজের মোট ৩৭ পর্ব প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো এই সিরিজ চলমান আছে।

ইনডেক্স সিরিজের কিছু ছবিঃ

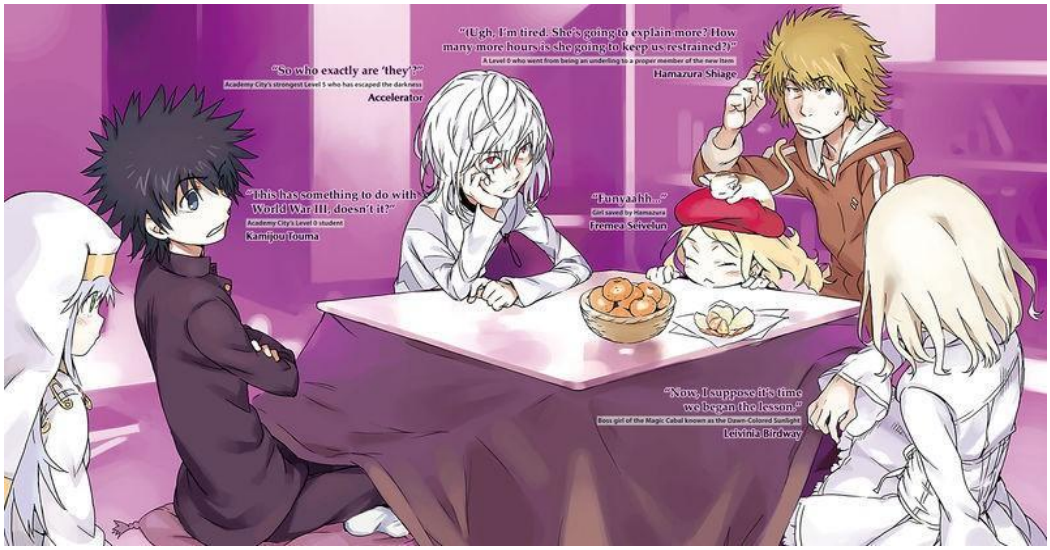

এই সিরিজের প্রধান চরিত্রগুলো: (বাম থেকে ডান) ইনডেক্স, কামিযৌ তৌমা, অ্যাক্সেলেটর, হামাজুরা শিয়েগে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এই লেখকের আরেকটা সিরিজ হচ্ছে, হেভি অবজেক্ট (Heavy Object)।

জাপানিজরা মেকা (Mecha) মানে বিশাল রোবটের ফ্যান। তারা প্রতি বছর বেশ কয়েকটা অ্যানিমেই বের করে মেকা জঁর নিয়ে। হেভি অবজেক্ট সিরিজটা মেকা জঁরের মধ্যে পড়ে। তবে এখানে কোনো বিশাল রোবট নেই। এর বদলে আছে বিশাল ওয়ার মেশিন, যার নাম দেয়া হয়েছে হেভি অবজেক্ট। যে রাজ্যের হেভি অবজেক্ট যত বেশি, সে তত বেশি শক্তিশালী। এই সিরিজের নায়ক কুয়েন্থার একজন হেভি অবজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং তার বন্ধু হেভিয়া একজন মিলিটারী সৈন্য। এখন দুইজন ভাগ্যক্রমে একটা হেভি অবজেক্ট ধ্বংস করে ফেলে, যেটা কিনা একটা আর্মির দলের পক্ষে করা অসম্ভব। এখন আর কি হবে, এই দুইজন নেমে পড়লো তাদের রাজ্যের বিরুদ্ধে লেগে থাকা হেভি অবজেক্টগুলোর ধ্বংসের কাজে।

এই সিরিজও এখনো চলছে এবং এই পর্যন্ত ১২ টা খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হেভি অবজেক্ট সিরিজের কিছু ছবিঃ

মলাট

কালার ইলাস্ট্রেশন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

রেকি কাওয়াহারা (Reki Kawahara):

বর্তমানে যে লাইট নভেল সিরিজটা সারা বিশ্ব কাঁপাচ্ছে তার লেখক এই মহামান্য ব্যক্তি রেকি কাওয়াহারা। ওনার লেখা সোর্ড আর্ট অনলাইন (Sword Art Online) সিরিজটা সারা বিশ্বেই এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে হলিউডে এটাকে নিয়ে একটা টিভি সিরিজ বের হতে চলেছে।

সোর্ড আর্ট অনলাইন কাহিনী শুরু হয় একটা গেমকে কেন্দ্র করে, যার নাম সোর্ড আর্ট অনলাইন। এটা একটা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ধরনের গেম। একটা যন্ত্রে মাধ্যমে তারা সেই গেমের জগতে ঢুকে যেতে পারবে এবং সেখানে সম্পূর্ন রিয়ালিটির স্বাদ পাবে।

কিন্তু গেমের ভিতর ঢোকার পর গেমাররা আবিষ্কার করে এই গেম থেকে তারা লগ আউট হতে পারছে না, মানে লগ আউট হবার অপশন টাই নেই। গেম থেকে বের হবার একটাই উপায়, একশটা ফ্লোর আছে, সেগুলো পার হতে পারলেই তারা গেমের জগত থেকে বের হতে পারবে। আর যদি তারা গেমের জগতে মারা যায় তাহলে তারা বাস্তব দুনিয়ায়ও মারা যাবে। আর এভাবেই শুরু একটা একটা ডেথ গেমের যাত্রা।

এই সিরিজের নায়ক কিরিগায়া কাজুটো সংক্ষেপে কিরিটো তার যাত্রা শুরু করে এই ডেথ গেম থেকে মুক্তি পাওয়ার কাজে।

সোর্ড আর্ট অনলাইন একটা ওয়েব সিরিজ থেকে নেয়া হয়েছে। লেখক ওয়েব সিরিজ লেখার সাইটে নিজের এই সিরিজটা প্রকাশ করে এবং পরে সেটা বই আকারে প্রকাশ হয়।

এই সিরিজের মোট ১৮টা বই বের হয়েছে এবং এটা এখনো চলছে।

সোর্ড আর্ট অনলাইন কিছু ছবিঃ

মলাট

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অ্যাক্সেল ওয়ার্ল্ড (Accel World) এর কাহিনি প্রায়ই একই, এটা সোর্ড আর্ট অনলাইনের বেশ কয়েক বছর পরের কাহিনি। এখন ভার্চুয়াল রিয়ালিটি বলতে গেলে মানুষ জীবনের পাশাপাশি অবস্থান করছে এবং এটাও সোর্ড আর্ট অনলাইনের মত গেইম নিয়ে কাহিনি।

এটার ২০টা পর্ব বের হয়েছে এবং এখনো সিরিজটা চলছে।

অ্যাক্সেল ওয়ার্ল্ড কিছু ছবিঃ

কালার ইলাস্ট্রেশন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

মলাট

মিনোরু কাওয়াকামি (Minoru Kawakami):

লাইট নভেল শাখায় সায়েন্স ফিকশন নিয়ে কথা হবে কিন্তু এই ব্যক্তির নাম আসবে না সেটা কি হয় নাকি? জাপানের সেরা সায়েন্স ফিকশন লাইট নভেল সিরিজ ইনিই উপহার দিয়েছেন। উনি নিজস্ব একটা ইউনিভার্স তৈরী করেছেন। সেই ইউনিভার্স ছয়টা এরা (era) ভাগে ভাগ করেছেন। সেই ছয়টা এরা বা যুগের নাম সহ সিরিজগুলোর নাম নিচে দেয়া হলঃ

১) FORTH- সিরিজ নামঃ Rapid-fire King – এর দুটো বই বের হয়েছে।

২) AHEAD- সিরিজ নামঃ Owari no Chronicle – মোট ১৪টা বই বের হয়েছে এবং সম্পূর্ণ হয়েছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

৩) EDGE- এখনো কোনো বই বের হয়নি।

৪) GENESIS- সিরিজ নামঃ Kyoukai Senjou no Horizon- ২৩ টা বই এবং এখনো চলমান। (Owari no Chronicle এর সিক্যুয়েল এটা)

৫) OBSTACLE- সিরিজ নামঃ Clash of Hexennacht- ৩ টা বই বের হয়েছে এবং চলমান।

৬) CITY- CITY সিরিজ নামে পরিচিতি ৭টা ভাগে মোট ১৭ টা বই বের হয়েছে এবং সম্পূর্ণ।

সিরিজগুলোর মধ্যে ওনার তৈরী দুনিয়ার গঠন এবং সেটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর কথাই বেশি তুলে ধরেছেন। তবে তাই বলে একদম সিরিয়াস মুডে চলে যাননি এই লেখক, মাঝে মাঝে মনে হবে এইসব চরিত্রদের হাতে কি দুনিয়া বাঁচানোর দায়িত্ব পড়েছে! তারা এমনভাবে কাজ করবে যাতে আপনি হাসতে বাধ্য থাকবেন, মাঝে মাঝে অবাক হবেন তারা কঠিন পরিস্থিতে পরেও কিভাবে এই হাস্যকর কাজগুলো করতে পারে। আর প্রতিটা পর্ব শেষ করার শুধু একটাই কথা মনে হবে, প্রধান চরিত্রগুলো জাতে মাতাল কিন্তু তালে ঠিকই আছে।

সুতোমু সাতোউ (Tsutomu Satō):

সোর্ড আর্ট অনলাইন সিরিজের পর যে সিরিজটা লাইট নভেল ফ্যানদের মাতিয়ে রেখেছে সেটা হচ্ছে সুতোমু সাতোউর লেখা সিরিজ (Mahouka Koukou no Rettousei/ The irregular at magic high school)।

এই সিরিজের মূল কাহিনী হচ্ছে জাদু আর বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ, তারা জাদুকে একটা প্রযুক্তি হিসেবে নিয়েছে এবং এই জাদুবিদ্যাকে নতুন প্রযুক্তি হিসেবে স্কুল কলেজে শেখানো হচ্ছে।

কাহিনী মূল চরিত্রে দুই ভাই-বোন, শিবা তাতসুয়া আর শিবা মিয়ুকিকে নিয়ে। শিবা মিয়ুকি জাদুকরীর ক্ষমতার প্রতিভা নিয়ে স্কুলের সেরা ছাত্রী, সেখান তার ভাই শিবা তাতসুয়ার জাদুকরী ক্ষমতা নেই। কিন্তু তাতসুয়ার আরেকটা দিক আছে যেটা তার বোন আর পরিবার ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা হচ্ছে সে গোপনের মিলিটারির হয়ে কাজ করে এবং তার মত দক্ষ সৈন্য গোটা জাপানে খুবই কম আছে। তাছাড়া তার জাদু ক্ষমতা না থাকলেও সে জাদুর যন্ত্রপাতি তৈরীতে প্রতিভাবান।

এখন দেশ-বিদেশের কিছু চোর ও প্রতিষ্ঠান সেইসব জাদুর প্রযুক্তি চুরি করতে চায়। এছাড়া আছে দেশে মধ্যে অশান্তি তৈরী করা। এখন নায়ক শিবা তাতসুয়ার কাজ হল তাদের বিরুদ্ধে নেমে দেশের উপকার করা।

মলাট

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কালার ইলাস্ট্রেশন

এছাড়া আরো বেশ কয়েকটা সায়েন্স ফিকশন লাইট নভেল সিরিজ আছে, কিন্তু সেগুলোতে সায়েন্স ফিকশন সিরিজ বলার চেয়ে অন্য জঁরের সিরিজ বলাই ভালো।

তবে শেষ করা আগে আরেকট সিরিজের নাম বলে যাই। সেটা হচ্ছে সুজুমিয়া হারুহির সিরিজ। এই সিরিজের কথা আমি উপরেই উল্লেখ করেছি। এই সিরিজে একটা মেয়ের দৈনন্দিন জীবন নিয়েই কাহিনী। হারুহি মেয়েটার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতার বলে সে অনেক কিছুই পরিবর্তন করে ফেলতে পারে, হেমন্তকালে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে তুলতে পারে। এমনকি নতুন একটা দুনিয়া তৈরী করে আগের দুনিয়া ধ্বংস করে ফেলতে পারে। কিন্তু সে নিজের এই ক্ষমতার কথা জানেনা, নিজের অজান্তেই ব্যবহার করে ফেলে সে। তার এই ক্ষমতার কথা জানতে পারে অ্যালিয়েন, এসপার ও টাইম-ট্র্যাভেলাররা। তারা গোপনে পর্যবেক্ষণ করতে থেকে হারুহিকে। কিন্তু সবকিছু উলট-পালট হয়ে যায় একটা ছেলের আগমনে। ছেলেটার নাম কীয়ন, একদম সাধারণ ছেলে সে, কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই তার। আর সে হারুহির 'মনোনীত' করা লোক। এখন কীয়নের উপর দায়িত্ব পড়েছে হারুহির তৈরী সমস্যাগুলোর সমাধান করা।

আগেই বলেছি, এটাতে সায়েন্স ফিকশনের উপাদান থাকলেও এখানে মূলত হারুহির দৈনন্দিন কর্মকান্ড গুলোই উল্লেখ করা হয়েছে। যেটা আর সাধারণ চঞ্চল স্কুল মেয়েরাই করে থাকে। তবে আমি আপনাদের এই সিরিজ পড়া থেকে বিরত থাকতে বলবো না, কারণ এই হারুহি সিরিজের প্যাটার্ন ধরেই কিন্তু অনেক লাইট নভেল সিরিজ লেখা হয়েছে। আর এই সিরিজ সারা বিশ্বে লাইট নভেলের জনপ্রিয়তাও বাড়াতে সাহায্য করেছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

মলাট

হারুহি সিরিজের চরিত্রগুলোঃ বামে উপরে-কোইজুমি, বামে নিচে-নাগাতো ইয়ুকি, বাম থেকে-কীয়ন, আসাহিনা ও হারুহি।

লাইট নভেল বা লঘু উপন্যাস সার্থকনামা। সাহিত্যের গভীরতা বা শব্দগাম্ভীর্যের ধার ধারেনা এই লাইট নভেলগুলি। অত্যন্ত হাল্কা বোধগম্য ভাষায় এই উপন্যাসগুলি শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়, আর সেইজন্যেই লাইট নভেল ধারাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে নতুন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রজন্মের কাছে। সাধারণত লাইট নভেল গুলি কথোপকথন ভিত্তিক হয় আর এর প্যারাগ্রাফগুলিও হয় অত্যন্ত ছোট। মাত্র এক থেকে তিনটি বাক্যের মধ্যেই গঠিত হয়ে যায় একটি প্যারাগ্রাফ। লাইট নভেলের লেখকরা সাধারণত অনুসরণ করে লেখার এক বিশেষ ধারাকে; যেখানে সাহিত্যের ভাষা হয় খুব সহজ, বোধগম্য কিন্তু ঘটনাচক্র বিশেষ তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট। এর ফলে সাধারণ পাঠকের পড়ার গতি বেড়ে যায়, তারা অতি দ্রুত একের পর এক বই শেষ করে চলে।

অনেক লাইট নভেলে দেখলে মনে হত পারে এগুলো শুধু কিশোরদের জন্যেই। আসলে কিন্তু তা না, এই শাখার উপন্যাস কিন্তু বড়দের কাছেও জনপ্রিয়। তাছাড়া অনেকেই মনে করতে পারেন এই নভেলগুলো একদম টিপিক্যাল ধরনের কিশোর উপন্যাস। হ্যাঁ, এগুলি সাধারণ কিশোর উপন্যাসের মতই কিন্তু এই একই ধরনের উপন্যাস যে কত স্বাদের হতে পারে সেটা একবার না পড়ে দেখলে বোঝা যাবে না। তাই যারা লাইট নভেলে সায়েন্স ফিকশনের জগতে ঢুকতে চান তাহলে অন্তত উপরের উল্লেখ করা সিরিজগুলো পড়া শুরু করে দিতে পারেন।

অলঙ্করণ: সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

'সেই বিষাক্ত জঙ্গলে তখন নতুন একটা নির্বিষ অঙ্কুর জেগে উঠছে ঠিক নউসকা'র হারানো গগলসের পাশে। ভয়ংকর ওহমেরাও জেনে গেছে যে তাদের এক নতুন বন্ধু হয়েছে যে তাদের এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে'। এভাবেই শেষ হয় অ্যানিমে (জাপানী ভাষায় অ্যানিমেশন) ছায়াছবি 'নউসকা অফ্ দ্য ভ্যালি অফ্ দ্য উইন্ড'। এই শেষ কিন্তু আসলে একটা স্বপ্ন গড়ার কারখানার সূত্রপাত। বৃহত্তর টোকিও শহরতলির পশ্চিমদিকে কোগানেই (বা কোগানেইশি) অঞ্চল। ১৯৮৫ সালে যখন 'নউসকা' ছবিটা বিরাট সাফল্য লাভ করে তখন সেই সাফল্যকে আরো নতুন দিগন্তে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিন বন্ধু এই কোগানেইতেই খুলে বসলেন একটা অ্যানিমেশন স্টুডিও যার নাম 'স্টুডিও ঝিবড়ি'।

হায়াও মিয়াজাকি, ইসাও তাকাহাতা আর তোসিও সুজুকি। ঝিবড়ির এই তিনজন আদি প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে প্রথম দুজন পরিচালক আর সুজুকি ছিলেন আদতে প্রযোজক। 'ঝিবড়ি' শব্দটা আসলে মূল ইটালিয়ান শব্দ 'ঘিবলি' থেকে নেয়া যা আসলে লিবিয়া অঞ্চলের এক ধরণের মরু হাওয়াকে বোঝায়। অ্যানিমের জগতে একটা নতুন খোলা হাওয়া আনার জন্য এই শব্দটাকে বেছে নিয়েছিলেন ওরা তিনজন। এই স্টুডিও থেকে বেরোনো আশ্চর্য অ্যানিমে ছবিগুলো গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে সিনেমা-প্রেমী দর্শক আর সমালোচকদের প্রশংসা বয়ে নিয়ে চলেছে। এই ধারাবাহিক সাফল্যের মূল স্থপতি বলতে যদিও মিয়াজাকির নামই সবার আগে আসে।

'নউসকা অফ্ দ্য ভ্যালি অফ্ দ্য উইন্ড' ছবি একটা দৃশ্য

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

রূপকথা, ইতিহাস আশ্রয়ী কল্পকাহিনী, কল্পবিজ্ঞান এই সব ধারাতেই সমান সফল স্টুডিও ঝিবড়ি। ১৯৮৬ সালে হায়াও মিয়াজাকির 'লাপুতা - ক্যাসল ইন দ্য স্কাই' ছায়াছবি দিয়ে শুরু হয় এই জয়যাত্রার। লাপুতা এই শব্দটা আসলে জোনাথন সুইফট্ এর গালিভারস্ ট্রাভেলস্ এর সেই ভাসমান দ্বীপের নাম থেকে নেয়া। এই ছবিতে দেখানো ভাসমান দুর্গের গল্পে কল্পবিজ্ঞানের মোড়কে নানা ধর্মীয় অনুষঙ্গ আর কিংবদন্তীর বেশ কিছু চিহ্ন যে মুনশিয়ানার সঙ্গে ব্যাবহার করা হয়েছিল তা দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়। সাথে ছিল মিয়াজাকির তুলির আশ্চর্য টান যা অনেক স্বপ্নের মতো ফ্রেম তৈরি করেছিল এই ছবিতে। এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সে বছর বিখ্যাত অ্যানিমেজ পত্রিকা আয়োজিত অ্যানিমে গ্র্যান্ড প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করা হয় এই ছবিকে। এর পর থেকে অসংখ্য পুরস্কার আর সম্মান এসেছে স্টুডিও ঝিবড়ির ঝুলিতে। কল্পনার ছবিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে এক অন্যতম শৈল্পিক মাত্রা এনেছেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুণী শিল্পীরা। পাঁচবার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড এর মনোনীত হয়েছিল এই স্টুডিও থেকে রিলিজ হওয়া ছায়াছবি।

পূর্ণদৈর্ঘ্যের অ্যানিমে চলচ্চিত্র ছাড়াও শর্ট-ফিল্ম, টেলি কমার্শিয়াল সিরিজ এবং টেলি ফিল্ম নির্মাণের ক্ষেত্রেও রীতিমতো কৃতিত্বের দাবিদার এই স্টুডিও। জাপানী ভাষার বাণিজ্যিকভাবে সফল প্রথম ১৫টা অ্যানিমে ছবির তালিকায় স্টুডিও ঝিবড়ির আটটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি আছে। যার মধ্যে এক নম্বর স্থানে থাকা হায়াও মিয়াজাকির ছবি 'স্পিরিটেড অ্যাওয়ে (২০০১)' শুধুমাত্র জাপানেই নয় বরং সারা পৃথিবীতে এক বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পূর্ণদৈর্ঘ্যের অ্যানিমে চলচ্চিত্র ছাড়াও শর্ট-ফিল্ম, টেলি কমার্শিয়াল সিরিজ এবং টেলি ফিল্ম নির্মাণের ক্ষেত্রেও রীতিমতো কৃতিত্বের দাবিদার এই স্টুডিও। জাপানী ভাষার বাণিজ্যিকভাবে সফল প্রথম ১৫টা অ্যানিমে ছবির তালিকায় স্টুডিও ঝিবড়ির আটটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি আছে। যার মধ্যে এক নম্বর স্থানে থাকা হায়াও মিয়াজাকির ছবি 'স্পিরিটেড অ্যাওয়ে (২০০১)' শুধুমাত্র জাপানেই নয় বরং সারা পৃথিবীতে এক বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই ছবিকে তার উৎকর্ষতার জন্য বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সেরা পুরস্কার 'গোল্ডেন বিয়ার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও অস্কার এবং অন্যান্য অনেক দেশের চলচ্চিত্র উৎসব থেকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা গ্রহণ করেছে এই ছবি।

লাপুতা ছবির ভাসমান আকাশ দুর্গ

ওই প্রথম পনেরো ছবির তালিকায় থাকা আরেকটা ছবি 'মাই নেইবার তোতোরো (১৯৯৮)' র অন্যতম চরিত্র তোতোরো নামের সেই কাল্পনিক জন্তুর ছবি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে স্টুডিও কর্তারা তাকেই পরে স্টুডিওর ম্যাসকট মনোনীত করেন। সেই সময় থেকেই আমাদের ভেতরে থাকা চির-শিশুদের কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর অন্যতম ঠিকানা তোতোরোর ওই মুখটা।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

স্টুডিও ঝিবড়ির ম্যাসকটে তোতোরোর মুখ

শুধুমাত্র কল্পনার জাল বোনাই নয়, মানবিক সম্পর্কের গল্প যাতে সাধারণ মানুষের বাঁচা মরা উঠে আসে সেই ধরণের ছবির ক্ষেত্রেও সফল ঝিবড়ির সৃষ্টি সম্ভার। মনে পড়ে যায় ইসাও তাকাহাতার 'গ্রেভ অফ্ দ্য ফায়ারফ্লাইস (১৯৮৮)'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এক অনাথ কিশোর আর তার বোনের জীবনের ছবি এক গভীর মানবিক টেস্টামেন্টে উঠে এসেছে এই ছবির গল্প বয়ানে। আগুন, ধোঁয়া আর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেন জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে ছবিটাতে। ছোট্ট বোন সেইতা যে দৃশ্যে তার দাদা সেটসুকোকে জিজ্ঞাসা করে যে জোনাকিরা এত তাড়াতাড়ি মরে যায় কেন সেই ফ্রেমটা যেন ওই ছবির গণ্ডি পেরিয়ে মহাকালের বিচার-শালায় গিয়ে ইতিহাসের পাতার সব যুদ্ধবাজ শাসকের সামনে ওই প্রশ্নটা রাখে।

দাদা সেইতার পিঠে চেপে ছোট্ট বোন সেতসুকো – গ্রেভ অফ দ্য ফায়ারফ্লাইস ছায়াছবি থেকে

মিয়াজাকি আর তাকাহাতা ছাড়াও ছাড়াও আর যে কজন গুণী শিল্পী স্টুডিও ঝিবড়ির সৃষ্টি সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইয়োসিফুমি কোন্ডো, হিরোয়ুকি মোরিতা এবং হিরোমাশা য়োনেবায়াসি। এদের পরিচালিত ছবির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে কোন্ডোর 'হুইস্পার অফ্ দ্য হার্ট', মোরিতার 'দ্য ক্যাট রিটার্ণস্' এবং য়োনেবায়াসির 'দ্য সিক্রেট ওয়র্ল্ড অফ্ অ্যারিয়েটি'। শুধু পরিচালনা নয় বিভিন্ন ছবিতে অ্যানিমেটর হিসেবেও তাদের অবদান কৃতিত্বের। পরে হায়াও মিয়াজাকির ছেলে গোরো মিয়াজাকিও তার বাবার মতোই প্রতিভার সাক্ষর রেখেছে 'টেলস্ ফ্রম আর্থ সী', 'ফ্রম আপ অন পপি হিল' ছায়াছবিরগুলোর মধ্যে দিয়ে। এই অ্যানিমেগুলোতে হলিউড এবং সমগ্র পশ্চিমের প্রভাব ছাপিয়ে ভীষণভাবে এক প্রাচ্য দর্শনের রূপটান দেখা যায়। গল্প বয়ানের ক্ষেত্রে অনেক সময় অধিবাস্তববাদের প্রভাব স্পষ্ট

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

যেখানে এই চেনা পৃথিবীর মধ্যেই এক অচেনা জগতের ছবি ভেসে ওঠে। তবে সেই ছবির মধ্যেও জাপানী কিংবদন্তী এবং তাদের সংস্কৃতির ছাপটা স্পষ্ট। মিয়াজাকি নিজেই তার অনুপ্রেরণা হিসেবে হলিউডের বদলে সোভিয়েত অ্যানিমেশন বিশেষ করে ১৯৫৭ সালের ছবি 'স্নো কুইন' এর উল্লেখ করেছেন। ওঁর প্রথম কাজের ক্ষেত্র মাঙ্গা'তে আর্টিস্ট হিসেবে তিনি পাশ্চাত্যের ছায়া সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে পুরোপুরি দেশীয় রীতিতে চরিত্রদের আঁকা বিশেষত: তাদের মুখের ভঙ্গীতে আবেগের প্রকাশ করেছেন। মাঙ্গা আকার এই পদ্ধতিকে 'গেকিগা' বলা হয়। নওসিকা ছায়াছবিটাও আসলে মিয়াজাকির একই নামের মাঙ্গার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। চরিত্রের মুখভঙ্গিতে আবেগের এই সূক্ষ্ম প্রকাশ ঝিবড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার সঙ্গে পাশ্চাত্য অ্যানিমেশনের জাঁকজমক প্রকাশের অনেকটাই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ওয়েস্টার্ন অ্যানিমেশনের একমাত্রিক কালো সাদার দ্বন্দ্বের বদলে এই অ্যানিমেগুলোতে যে চরিত্ররা বারবার আসে তারা আমাদেরই চারিপাশের মানুষ। তাই যেন স্বাভাবিক মানবিক গুন আর খামতি নিয়ে গড়া। অ্যানিমে ছায়াছবিতে মানবিক এই আবহটাকে প্রকাশ করার জন্য আর যে মানুষটার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন সুরকার জো হিসাইশি (আসল নাম মামোরু ফুজিসাওয়া)। স্টুডিও ঝিবড়ির ছবির একটা অন্যতম উপাদান তার আবহ সংগীতে বারবার এই মানবিক আবেদন সাংগীতিক অভিঘাতে প্রকাশ করেছে হিসাইশির অসামান্য সুরগুলো।

ছবির আবহ সংগীত গ্রহণের মুহূর্তে জো হিসাইশি এবং বাদ্যযন্ত্রীরা

স্টুডিও ঝিবড়ির কর্তারা পাশ্চাত্যে এবং বিশেষ করে হলিউডে তাদের ছবির মুক্তি এবং বিপণনের ক্ষেত্রে 'নো এডিট' পলিসিতে বিশ্বাসী। আসলে 'নওসিকা' ছবির ক্ষেত্রে যেভাবে হলিউডের মুনাফা-লোভী স্টুডিও সিস্টেম ছবিটাকে কেটে ছোট করে তার ভেতরের জাপানী কৃষ্টির নির্যাসকে প্রায় ছেঁটে ফেলেছিল সেখান থেকেই এই শিক্ষা নেয়া। এই নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। মিরাম্যাক্সের এক কর্তা হার্ভে ওয়েনস্টাইন এক সময় স্টুডিও ঝিবড়ির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ 'প্রিন্সেস মনোনোকে' ছায়াছবিকে কিছুটা সম্পাদনার করে হলিউডে রিলিজের প্রস্তাব রাখেন। আসলে ছবিটা বিপণনের ক্ষেত্রে আমেরিকান দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য তার এই প্রস্তাব ছিল। যাহোক এর উত্তরে নাকি ঝিবড়ির এক প্রযোজক তাকে একটা লেখা নোট পাঠিয়েছিলেন যাতে উদ্যত তরোয়াল হাতে এক সামুরাই'এর ছবি ছিল যার নিচে লেখা 'নো কাট'।

এইভাবে বারবার অ্যানিমের মধ্যে দিয়ে অনবদ্য ভঙ্গিতে মানবিক সম্পর্কের গল্প বলার চেষ্টা করে গেছে স্টুডিও ঝিবড়ির থেকে বেরোনো ছায়াছবিগুলো। এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত পছন্দের বারোটা ছবির উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব আপাতত।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

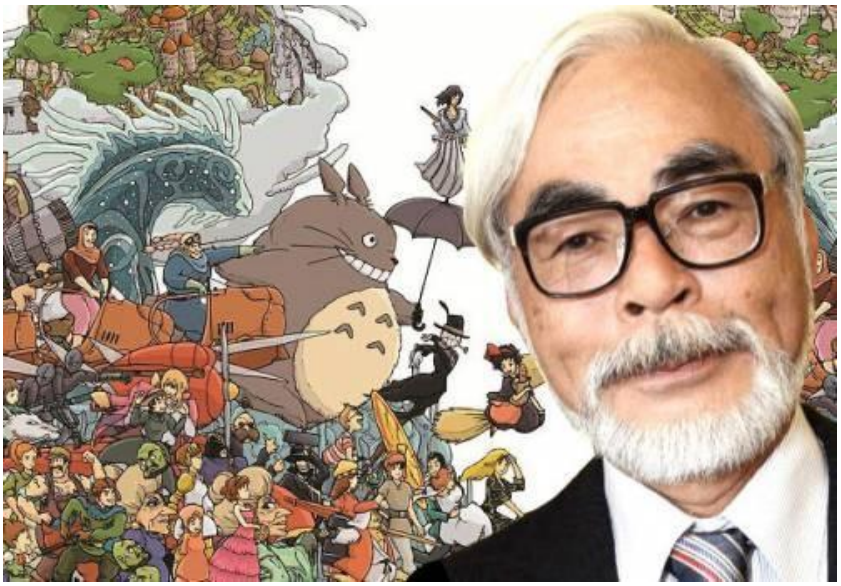

তাঁর গড়া চরিত্রদের সাথে এক ফ্রেমে স্বপ্ন গড়ার প্রধান কারিগর – হায়াও মিয়াজাকি

১) লাপুতা – ক্যাসল ইন দ্য স্কাই (১৯৮৬),
২) গ্রেভ অফ্ দ্য ফায়ারফ্লাইস (১৯৮৮),
৩) মাই নেইবর তোতোরো (১৯৮৮),
৪) কিকিস্ ডেলিভারি সার্ভিস (১৯৮৯),
৫) হুইস্পার অফ্ দ্য হার্ট (১৯৯৫),
৬) প্রিন্সেস মনোনোকে (১৯৯৭),
৭) স্পিরিটেড অ্যাওয়ে (২০০১),
৮) মিলেনিয়াম অ্যাকট্রেস (২০০১),
৯) টেলস্ ফ্রম আর্থ সী (২০০৬),
১০) পোনিও (২০০৮),
১১) দ্য সিক্রেট ওয়র্ল্ড অফ্ অ্যারিয়েটি (২০১১) এবং
১২) দ্য টেল অফ্ দ্য প্রিন্সেস কাগুইয়া (২০১৩)

অলঙ্করণ: সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

বিশেষ আকর্ষণঃ

খবরটা দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী রণেন ঘোষ। গত ২রা জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখ নাগাদ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার ওই ছোট্ট খবরে উল্লেখ ছিল যে স্পেনীয় কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কন কলকাতায় বেড়াতে এসে ট্যাক্সিতে ফেলে আসা কিছু মালপত্র আবার ফিরে পেয়েছেন। রণেনবাবুর একান্ত ইচ্ছে ছিল যে আমরা কল্পবিশ্বের পক্ষ থেকে যেন ওঁর একটা সাক্ষাৎকার নিই। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে? খোঁজ চলল খোদ কলকাতার স্প্যানিশ এম্ব্যাসিতে। শেষমেশ ইন্টারনেট ঘেঁটে পাওয়া ওঁর ফেসবুক পেজে হদিশ মিলল কার্লোসের নিজস্ব ব্লগ আর সেখানে সন্ধান পাওয়া গেল তাঁর মেইল অ্যাড্রেসের। একটা মেইল করা হল দুরুদুরু বক্ষে। জানানো হল কল্পবিশ্বের কথা আর বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান নিয়ে আমাদের স্বপ্ন। কি আশ্চর্য তিনি উত্তর দিলেন সেই মেইলের আর আমাদের জন্য সময় দিলেন আধঘণ্টা সেইদিনই সন্ধেবেলায়। সেইমতো লিন্ডসে স্ট্রীটের একটা হোটেলে গিয়ে দেখা হল কার্লোস এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে। নিরিবিলিতে কথা বলার জন্য ওদের পছন্দের জায়গা হিসেবে যাওয়া হল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'ফেয়ারলন হোটেল' এর লনে। প্রখ্যাত নাট্যশিক্ষক এবং অভিনেতা জিওফ্রে কেন্ডালের স্মৃতি বিজড়িত সেই বিখ্যাত 'ফেয়ারলন'। সেখানেই কফি সহযোগে সেই আধঘণ্টার আড্ডা কখন যে প্রায় দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল তার হদিশ কেউ তখন রাখতে পারিনি তন্ময় অবস্থায়। আলোচনার ব্যাপ্তি তখন কল্পবিজ্ঞান পেরিয়ে সমাজ রাজনীতির একটা বিরাট দিগন্তরেখায় পৌঁছে গেছে। বিদায় নেওয়ার সময় চারজনেই বুঝলাম যে সূত্রপাত হয়েছে একটা নতুন বন্ধুত্বের। কল্পবিশ্বের পাতায় রইল সেই বন্ধুত্বের দলিল।

কল্পবিশ্বঃ আমাদের মাতৃভাষা বাংলাতে স্প্যানিশ ভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে চর্চার একটা বেশ পুরোনো ঐতিহ্য আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে যেখানে এই ভাষায় কথা বলা হয় সেখানকার নিজস্ব কৃষ্টিতে এই ভাষা একটা ছাপ রেখে গেছে। যেমন ধরা যাক, দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ সাহিত্য বা পাবলো নেরুদার কবিতাগুলো...

কার্লোসঃ দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ কৃষ্টি সেখানকার সমাজের প্রেক্ষাপটকে আমার মতে আরও ভালো ধরতে পেরেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে চারিদিকের মানুষের মাটির দুনিয়াটা অনেক বেশী করে এসেছে স্প্যানিশ সাহিত্যে। তার আগে যেটা ছিল তাকে পুরাণ বা ইতিহাসের চর্বিত চর্বণ বলা যায়। ওই সময় থেকে সাধারণ মানুষের কথা অনেক বেশী করে উঠে এসেছে স্পেনীয় ভাষার আবর্তে কখনও কখনও বা হয়তো রূপকের আশ্রয়ে।

কল্পবিশ্বঃ আর কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে...

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কার্লোসঃ এই ধারাটা যদিও স্প্যানিশ সাহিত্যে অতটা নামজাদা নয়। মানে বাজারচলতি পরিমাপে হয়ত অন্যান্য অনেকে ভাষার সাই-ফির মতো অতটা নাম ছড়ায় নি। কিছু সাহিত্যিক অবশ্যই ভালো লিখছেন। যদিও আমার নিজস্ব কিছু রুচি-বোধ আছে এ নিয়ে। স্টিরিও-টাইপ স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কল্পবিজ্ঞান বা ফ্যান্টাসি অথবা স্পেস-অপেরা আমার ঠিক পছন্দের নয়। বেশীরভাগ লোক যা লিখছেন তা স্পেস অপেরা বা হরর।

কল্পবিশ্বঃ তার মানে কি ভয়ঙ্কর ভিনগ্রহী বা যন্ত্রদানবের বিভীষিকা?

কার্লোসঃ ঠিক তা না অনেকসময় লজিক্যাল টেরর। আমার ক্ষেত্রে বলি। আমার জন্ম আর্জেন্টিনাতে, স্পেনে নয়। কিন্তু প্রায় গত ৪০ বছর ধরে স্পেনেই বাস করছি। মনে হয় আমার চিন্তাভাবনাগুলো বেশীরভাগ লেখকের থেকে একটু আলাদা। আমার লেখাগুলোর বিষয় যাকে বলা যায় মানুষের চিরকালীন কিছু সমস্যা নিয়ে রূপক। এই সমাজের কিছু কিছু প্রশ্নচিহ্ন তোমরা ভেবে দেখো মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে কতটা জড়িয়ে আছে যে সেগুলোকে আলাদা করা যায় না। আমার লেখাগুলোর সঙ্গে মিল পাবে যে ধরণটা সেটা হল উরসুলা কে লেগিন গোত্রীয় লেখা বা সত্তরের দশক থেকে যে নব-তরঙ্গের স্প্যানিশ সাহিত্য শুরু হয়েছে তার সঙ্গে। তোমরা কি ক্রিস্তোফার প্রিস্টের লেখা পড়েছ?

কল্পবিশ্বঃ মনে হচ্ছে নামটা শোনা...

কার্লোসঃ অত্যন্ত নামকরা ব্রিটিশ লেখক। অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখেছেন। ওর লেখা 'দ্য ইনভার্টেড ওয়ার্ল্ড' তো পৃথিবী-বিখ্যাত। খুব ভালো লেখক। ওর উপন্যাস থেকে করা 'দ্য প্রেস্টিজ' সিনেমার নাম হয়তো শুনেছ তোমরা বা ছবিটা দেখেও থাকতে পারো।

কল্পবিশ্বঃ হ্যাঁ সেটা তো জানি। দুজন ম্যাজিশিয়ানের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে...

কার্লোসঃ হ্যাঁ একদম ঠিক। এটা ঠিক প্রথাগত সাইন্স ফিকশন হয়তো নয়।

কল্পবিশ্বঃ হ্যাঁ এর মধ্যে টেসলার চরিত্র আছে।

কার্লোসঃ ঠিক হয়তো ধ্রুপদী কল্পবিজ্ঞানের মতো নয়। তবে আমার লেখাও এমন কিছুটা। কল্পবিজ্ঞানের কিছু কিছু উপাদান নিয়ে আমি উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনা করি। আপাততঃ দুটো উপন্যাস বেরিয়েছে আমার। তবে সেই লেখাগুলোতে তথাকথিত কল্পবিজ্ঞানের কাঠামোটা কিছুটা পরোক্ষ ভাবে আছে, গল্পের মূল নির্যাস হিসেবে নয়।

[কফি আসে। এক আদর্শ হোস্টের মতো কার্লোস আমাদের পাত্রে কফি ঢেলে দেন।]

কল্পবিশ্বঃ আপনার কালকের অভিজ্ঞতাটা প্রাথমিক ভাবে হয়তো সুখকর নয়, তবে ওইজন্যই আপনার সঙ্গে পরিচয়টা হয়ে গেল আমাদের।

কার্লোসঃ হ্যাঁ, অনেকের সঙ্গে আলাপ হল গতকাল থেকে যার মধ্যে একজন স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষক যিনি আবার কলকাতায় সার্ভান্টেস ইন্সটিট্যুটের অধ্যক্ষ।

কল্পবিশ্বঃ কিছু ঘটনাচক্রে হলেও আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে আলাপটা হয়ে গেল।

কার্লোসঃ তোমাদের কথা দিচ্ছি যে খুব তাড়াতাড়ি আমার লেখা কোন গল্প বাংলা অনুবাদে বেরোবে।

কল্পবিশ্বঃ এটা খুবই আনন্দের খবর আমাদের জন্য।

কার্লোসঃ আমার একজন বাঙালীর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ আছে যিনি খুব ভালো স্প্যানিশ জানেন এবং তিনি বলেছেন অনুবাদের ব্যাপারটা দেখবেন।

কল্পবিশ্বঃ খুব ভালো। দরকার হলে আমরাও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব।

কার্লোসঃ আমার একটা ছোটগল্পই এখনও অবধি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। দু পাতার গল্প। সেটা 'অ্যামেজিং স্টোরিজ' এ বেরিয়েছিল।

কল্পবিশ্বঃ সেটা তো খুবই গৌরবের ব্যাপার।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কার্লোসঃ অন্য কিছু লেখা অনুবাদ হয়েছে ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্মান ভাষায়। জার্মান ভাষায় আপাতত দু একটা লেখা বেরিয়েছে তবে বছর-খানেকের মধ্যেই মনে হচ্ছে জার্মান ভাষায় একটা পুরো গল্পের সংকলন অনুবাদ হয়ে বেরোবে। এছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার দু একটা দেশেও আমার লেখা বেরিয়েছে।

কল্পবিশ্বঃ ল্যাটিন আমেরিকা আর ইউরোপের কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পরিসরটা কি একই না আলাদা মনে হয় আপনার?

কার্লোসঃ অবশ্যই আলাদা। শেষ ইউরোকন অধিবেশনে এই পার্থক্যটা নিয়েই একটা বক্তৃতা দিয়েছি আমি। আমার নিজের একটা ধারণা আছে এটা নিয়ে। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার ওপর ভর করে ইউরোপেই প্রথম বড়ো বড়ো শিল্প গড়ে উঠেছিল। তাই তার ছায়ায় যাকে বলা যায় আধুনিক সভ্যতাও ইউরোপেই গড়ে উঠেছিল প্রথমে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় তা সে ল্যাটিন আমেরিকা বা ভারত যেখানেই হোক না কেন, প্রযুক্তিবিদ্যা এসেছে বাইরে থেকে। এটাই আমার মনে হয় এই পার্থক্যের মূল কারণ। ইউরোপের কল্পবিজ্ঞান লেখকেরা যেমন ধরো জুল ভের্ণ বা এইচ জি ওয়েলস্ যা নিয়ে লিখেছেন সেই টেকনোলজিগুলো ততদিনে ইউরোপে আসতে শুরু করে দিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সেইগুলো এসেছে বাইরের দেশ থেকে যেটা একটা অন্য সামাজিক প্রেক্ষিত। হয়তো এটাই এই অমিলের কারণ।

কল্পবিশ্বঃ হ্যাঁ, এই পার্থক্যটা একটা ভেবে দেখার মতো কারণ হতে পারে। আমাকে এখানকার একজন কল্পবিজ্ঞান লেখক একবার বলেছিলেন যে রোজ সকালে ভিড় ট্রাফিক পেরিয়ে যে কর্মজীবন কাটাতে হয় সেখানে মানুষকে চাঁদে যাবার কথা সহজভাবে কি করে বোঝানো যাবে?

কার্লোসঃ এই সমস্যাটা আছে সত্যি। তাই আমি অনেক সময়ই রূপকের ছলে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করি বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি না বলেও।

কল্পবিশ্বঃ আপনার লেখা সম্পর্কেও আমরা যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে দার্শনিক অন্তর্দ্বন্দ্বগুলোকে নানা রকম কল্পনার মোড়কে হাজির করেন আপনি, বাহ্যত কল্পবিজ্ঞানের আদলের মধ্যে দিয়ে।

কার্লোসঃ সেটা আমার চেষ্টা থাকে। ইদানীং আমি আরেকটা ধাঁচের লেখা লিখছি। তোমরা বোর্হেসের লেখা পড়েছ?

কল্পবিশ্বঃ হ্যাঁ হোহে লুই বোর্হেস। তিনিও তো আর্জেন্টিনার লোক।

সিনিওরা কার্লোসঃ খুব শক্তিশালী লেখক। আমার খুবই পছন্দের।

কার্লোসঃ আধুনিক স্প্যানিশ সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক। বিশেষ করে ওর ছোটগল্পগুলো একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। খুব গভীর একটা কল্পনার জগত তৈরি করেছেন ওর সাহিত্যে। আমিও এমন একটা কল্পজগতের লেখা লিখি যেখানে বাস্তব আর কল্পনা প্রায় হাত ধরাধরি করে যায়। কখন যে কোনটা সামনে আসে তা সহজে বোঝা যাবে না।

কল্পবিশ্বঃ 'ম্যাজিক রিয়েলিজম' এর কথা বলছেন কি?

কার্লোসঃ না তা ঠিক নয়। ধরো তোমাকে একটা এমন একটা জগতের কথা বলা হল যার অনেক কিছুই এই চেনা পৃথিবীর কিন্তু কিছু কিছু অচেনা পার্থক্যও প্রকট ভাবেই আছে।

কল্পবিশ্বঃ বিষয়-গত ভাবে মনে হচ্ছে কাফকার লেখার কাছাকাছি...

কার্লোস এবং সিনিওরা কার্লোস একসঙ্গেঃ একদম ঠিক কাফকা।

কার্লোসঃ ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই প্রিয় কাফকা বা বোর্হেসের লেখার ধাঁচটা।

কল্পবিশ্বঃ মুরাকামি?

কার্লোসঃ মুরাকামির লেখা মোটামুটি লাগে এদের তুলনায়।

কল্পবিশ্বঃ হোসে সারামাগোর কিছু লেখাও এসে যায় এই প্রসঙ্গে।

সিনিওরা কার্লোসঃ সারামাগোর লেখা ওঁর (কার্লোসের দিকে চেয়ে) বেশী ভালো লাগে নি তবে আমার ভালো লাগে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কার্লোসঃ ওঁর লেখায় যেটা আছে সেটা কিছুটা প্রতীকীবাদ (symbolism)। রূপক (allegory) এর সঙ্গে তার পার্থক্যটা আগে ভালো করে বোঝা দরকার। যেমন ধরো দুধের জায়গায় একটা প্রতীক আনছি আমি ...

কল্পবিশ্বঃ যেমন চাঁদ...

কার্লোসঃ না বাস্তব কিছু নয় বরং মানসিক ধারণা হিসেবে। ধরো দুধ হচ্ছে শুভ আর রক্ত হচ্ছে অশুভের প্রতীক। এই ধরণে প্রতীক ওঁর লেখায় এসেছে ... এর সঙ্গে রূপকের একটা দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। সেখানে গল্পের কোন একটা উপাদান যেটা বাস্তবের একটা অবস্থানকে তুলে ধরছে তার জায়গায় আমি একটা কল্পনার ছবি দিয়ে দিলাম। বোর্হেস, কাফকা এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কল্পবিশ্বঃ মাঝে মাঝে বাইরের গদ্যটা পেরিয়ে ভেতরের তল পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়বার পড়ার পর হয়তো পাঠক কিছুটা বুঝতে শুরু করে।

কার্লোসঃ ঠিকই। আমার প্রথম উপন্যাসটাও হয়তো অনুবাদ করা অসম্ভবই ছিল। এটা অনুবাদের সময় আমার সঙ্গে অনুবাদক বারবার যোগাযোগ করেছে। গল্পটা একটা অন্য গ্রহের যেখানে কোন মানুষ নেই। সেখানকার ভাষার কাঠামোটাও একেবারে আলাদা যেটা মানুষের ভাষার মতো নয়। শুধু ওরাই বোঝে (হাসতে হাসতে)।

কল্পবিশ্বঃ আর আপনি বুঝবেন অবশ্যই।

কার্লোসঃ না মাঝে মাঝে হয়তো আমিও বুঝব না। উরসুলা কে লেগিনের এমন লেখা আছে কয়েকটা। ওঁর 'দ্য লেফট হ্যান্ড অফ্ ডার্কনেস' এরকম একটা অনবদ্য লেখা। দূর কোন গ্রহের যার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য গুলো অন্যরকম এই পৃথিবী থেকে। আমার লেখাটা ঠিক এমন না হলেও কিছুটা কাছাকাছি। আমার দ্বিতীয় উপন্যাস হয়তো প্রথম লেখার থেকে কম দুর্বোধ্য।

কল্পবিশ্বঃ আমরা আপাতত জাপানী সায়েন্স ফিকশন্ নিয়ে একটা কাজ করছি। আসলে জাপানী ভাষার কল্পবিজ্ঞানের খুব কম সংখ্যক লেখাই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে। আমরা অ্যামাজন ঘেঁটেও মোটে দু তিনটের বইয়ের সন্ধান পেয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ জাপানী ভাষাটা না জানার জন্য আমরা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করব ঠিক করেছি। সেগুলো পড়ে দেখলাম আমাদের চেনা কল্পবিজ্ঞানের ধাঁচ থেকে একেবারে আলাদা এক ধরণের লেখা। আদৌ কল্পবিজ্ঞান বলা যায় নাকি সে নিয়েও একটা ধন্দে আছি। নাকি ফ্যান্টাসি অথবা সামাজিক আখ্যান এই নিয়েও আমরা একটু সন্দিহান। গল্পগুলো পড়তে অসামান্য লাগছে কিন্তু চেনা পরিধির মধ্যে একে বাঁধা যাচ্ছে না। আসলে কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়েও নানা মত আছে আমরাও আমাদের গ্রুপের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করি।

কার্লোসঃ আলোচনার এই পরিসরটা থাকাই সমাজের স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

কল্পবিশ্বঃ যেমন অনেক লেখা তাদের সময়কালীন সমাজের নানা ছবিকে তুলেছিল ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বা কিছু কিছু নিয়মকে প্রশ্ন করেছিল তাদেরও কি এই দলে ফেলা যায়। টমাস মোরের 'ইউটোপিয়া'কেও যেমন কল্পবিজ্ঞানের একটা মহৎ দৃষ্টান্ত বলে অনেকেই মনে করেন।

কার্লোসঃ একদম ঠিক। আমিও এমন লেখাতেই বিশ্বাস করি। ঠিক এমনই একটা লেখার প্রস্তুতি চলছে এখন। তিনটে পর্ব থাকবে তাতে। নাম 'সিক্সটিন হান্ড্রেড সেলসিয়াস'। আসলে সব মিলিয়ে একটাই আখ্যান। এই কাহিনীর মূল যে চরিত্র তার জীবনের একটা দিনের গল্প হবে এটা। সে থাকে একটা বড়ো দ্বীপের মধ্যে। ওখানকার বাসিন্দাদের পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চল নিয়ে কোন ধারণা নেই। কোন একদিন ওই দ্বীপের চারিদিকে কুয়াশা বা ধোঁয়ার একটা পুরু চাদরে ঢেকে যাবে। চারিদিকে প্রায় ৩০০০ কিমি পর্যন্ত ঢেকে দেবে ওই দ্বীপকে। এই গল্পটা শুরু হচ্ছে এই ঘটনার প্রায় সত্তর বছর পরে। ততদিনে এই ধোঁয়ার স্তরটা আরো ছড়িয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছো এখানে দূষণের একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে আগামী পৃথিবীর জন্য সতর্কতা হিসেবে (হাসতে হাসতে)। ওখানকার বাসিন্দাদের জীবনে ততদিনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমাজ জীবনে বা রাজনীতিতে অস্থিরতা আর অপরাধ প্রবণতা ও বেড়ে গেছে অনেকটা।

কল্পবিশ্বঃ আপনি একটা সামাজিক কাঠামোর কথা বলতে চলেছেন এই গল্পে। যেভাবে আস্তে আস্তে সব কিছু পরিবর্তন হয়।

কার্লোসঃ চারিদিকের সমাজের অনেক কিছুর সঙ্গেই মিল পাবে। কোন কোন জায়গায় অনৈতিক যে কাজগুলো হচ্ছে যেমন ধরো হাসপাতাল

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

থেকে মানব অঙ্গের চোরাকারবারের ব্যবসা এ সব কিছু নিয়েও লিখি আমি ওই কল্পনার আবহে। এই ঘটনাগুলো আসলে মাঝে মাঝে আমাকে পাগল করে দেয়।

কল্পবিশ্বঃ আপনি কি ঈশ্বর বা কোন নিয়ন্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী?

কার্লোসঃ না একেবারেই নয়। এমন কি বিজ্ঞানকেও শেষ উত্তর বলে ভাবতে রাজী নই। সৃষ্টির এই বিরাট ব্যাপ্তিকে মানুষ কিছু সূত্র দিয়ে মাত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে সেটা আমি বিশ্বাস করি না।

কল্পবিশ্বঃ আপনার এই দার্শনিক অবস্থানটা বেশ কৌতূহল জাগাচ্ছে আমাদের...

কার্লোসঃ আসলে তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমি নিজেকে জানার জন্যই তোমাকে জানতে চাই। তোমাদের গ্যালিলিওর জীবনের একটা গল্প বলি এ ব্যাপারে যেটা হয়তো জানো না। মধ্যযুগে যাকে 'স্কোলাস্টিক' বলা হত তা আদতে চার্চ যার ক্ষমতা তখন অপরিসীম। কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষ তখন প্রাচীন গ্রীক দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ন করে তারই আলোতে নতুন কিছু তত্ত্ব নিয়ে হাজির হচ্ছে। তাকে রেনেসাঁস বা যাই বল। ওই সময় ফ্লোরেন্স বা অন্য কিছু কিছু শহরে তর্কসভা বসত আর সবচেয়ে ভালো বক্তাকে পুরস্কার দেয়া হতো। সেখানে গ্যালিলিও গিয়ে চার্চের কর্তাদের সঙ্গে তর্ক করেন। তা বলে ভেবো না সেটা খুবই শিষ্টাচার ছিল বরং বেজায় ঝগড়া করা হতো সেই সভাগুলোতে। প্রায় মুরগীর লড়াই এর মতো (হেসে উঠে) ... এরকম একটা সভায় গ্যালিলিও একবার বলেছিলেন যে দুটো ভিন্ন ওজনের জিনিস একপাত্র জলের মধ্যে রাখলে দুটো একসঙ্গেই ডুবে যাবে, সেটা কিন্তু বাস্তব নয়। উনি ডেমোক্রিটো (ডেমোক্রিটাস) এর পারমাণবিক মডেলের একটা সূত্র উল্লেখ করে এটা দেখালেন যা আর্কিমিডিসের মতবাদের উল্টো আর সেই সভাতে চার্চেরও মতের ঠিক বিপরীত। তিনি চার্চের বিরুদ্ধে মানে ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে গেছিলেন তা সত্যি। কিন্তু বুঝতেই পারছ, এটা ভুল ছিল। তার মানে গ্যালিলিও নিজে বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও চার্চের স্রেফ বিরোধিতা করতে হবে বলে এক্ষেত্রে এমন একটা পক্ষ নিলেন যেটা আদৌ বিজ্ঞান সম্মত নয়। পল ফায়ারবেন্ড বলে একজন অস্ট্রিয়ান দার্শনিক লেখা একটা নামকরা বই আছে 'এগেইনস্ট মেথড্'। আমি যদিও এর সবকিছু মানি না তবে উনি দেখিয়েছেন যে ধ্রুপদী পদ্ধতিতে তথাকথিত বিজ্ঞানের প্রমাণ বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে বেশ কিছু ফাঁক-ফোকর আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলোর এমনভাবে করা হয় যাতে যে সূত্রটা প্রমাণ করতে চাইছি সেটা প্রমাণিত হয় (সবাই হাসতে হাসতে)।

কল্পবিশ্বঃ আমরা নিজেরাও গবেষণার কাজে কিছুটা জড়িয়ে আছি। কোন সূত্র বা তত্ত্ব যে প্রস্তাব করা হচ্ছে বিজ্ঞানে সেটা কিন্তু অসংখ্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। আর যদি একটা তথ্যও সেটাকে অপ্রমাণ করে তবে সেই সূত্র বাতিল।

কার্লোসঃ কিন্তু এই প্রমাণটা তুমি যে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সাপেক্ষে করছ সেটাই তো মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়ে যায়। আমার মনে হয় জ্ঞানের সীমার মধ্যে কোনদিনই সেই চূড়ান্ত সত্যি ধরা পড়বে না।

কল্পবিশ্বঃ আপনি হয়তো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন।

কার্লোস এবং সিনিওরা কার্লোস একসঙ্গেঃ হ্যাঁ হ্যাঁ টেগোর, টেগোর...

কল্পবিশ্বঃ তাঁর একটা কবিতায় আছে "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।"

কার্লোসঃ খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে একটা বিরাট কথা বলেছেন। এক সহস্রাব্দ আগে বা পরে যখনই ভাবো না কেন সব সময়ই আপাত সত্যিটা সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত কতগুলো ধারণাকে নিয়ে চলে।

কল্পবিশ্বঃ বিজ্ঞান সব সময় কতগুলো গাণিতিক মডেলের ওপর নির্ভর করে। এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই কিন্তু কার্ট গোডেলের বিখ্যাত কাজে গণিতের সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কার্লোসঃ একদম আমার মত।

কল্পবিশ্বঃ একটু প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছি। হার্ড সাই-ফাই বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে কেউ রাজনৈতিক কোন বক্তব্য বা কোন মতবাদ বা ধরুন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ হিসেবে যদি কেউ লিখতে চায়। আমি বলতে চাইছি যেমন 'ডন কিহোতে' আদতে প্রচন্ড রকম রাজনৈতিক বক্তব্য সমন্বিত একটা উপন্যাস। তেমন যদি এই সময় কেউ কল্পবিজ্ঞানের আবহে লিখতে চায় সে লেখার ভাষা কেমন হওয়া উচিৎ?

কার্লোসঃ দ্যাখো রাজনীতির ব্যাপারে আমার নিজের অবস্থানটা ঠিক ডান বা বাম কোনদিকেরই না। সে ধর্মের মানে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের কাঠামো ভাবো বা রাজনীতি সর্বত্র একই অবস্থা। ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রে যেমন পোপ সবার ওপরে আর তার নীচে প্যাপাল সাম্রাজ্য। একটা বড়ো বা ছোট কোম্পানিতে ভাবো ম্যানেজারের দল যেভাবে আছে। সবকিছুই এক ধরণের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো। আমলারা নিজেরাই সমাজের নিজস্ব একটা শ্রেণী বা একটা দল বলতে পারো যাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করার জন্য রাখা হয়েছে। পুরোটা এক বিরাট আর জটিল কাঠামো যার একেবারে নিচে সাধারণ মানুষ আছে। এই বিশাল পিরামিডের যতো ওপরে উঠতে থাকবে তত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে। মানুষের জীবন তখন স্রেফ তথ্য বা পরিসংখ্যান। তখন তুমি কেবল একটা যন্ত্র এই সিস্টেমের। আমরা স্বৈরাচার বলতে ওপরের একটা মানুষকে দেখি কিন্তু তার নিচের এই যন্ত্রগুলো কিন্তু সেই ব্যবস্থাটাকে চালিয়ে রাখে। খারাপ ভালো যাই বল না কেন তা এই বিরাট পিরামিডের অবদান। এর ভেতরের মানুষগুলো সবাই সব সময় লড়াই করছে ওপরে পৌঁছোবার জন্য মানে সবাইকে ডিঙ্গিয়ে। তুমি একটা ছোট ভুল করলে যা হয়তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না, কিন্তু তোমার এই অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কেউ একজন সেটাকেই তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করবে তখন।

কল্পবিশ্বঃ এই কথায় কাফকার 'দ্য ট্রায়াল' মনে পড়ে গেল।

কার্লোসঃ কাফকা ছিলেন ক্রান্তদর্শী। ওঁর 'জোসেফিন দ্য সিঙ্গার অর দ্য মাউস ফোক' লেখাটার কথা ভাবো তো। এটা সম্ভবতঃ ওঁর শেষ লেখা গল্প। লেখাটার মধ্যে যা আছে সেটা আসলে সমাজের ভেতরে এই আমলাতন্ত্রের থাবা নিয়ে একটা প্রতিবাদ। আমরা কেউ কেউ চেষ্টা করি প্রতিবাদ করতে বা প্রতিবাদের নাম করে নিজেকে ভোলাতে, কেউ কেউ সত্যি সেটা পারে জোর গলায় না চেঁচিয়েও।

কল্পবিশ্বঃ সাহিত্যের তাহলে সেই ক্ষমতা আছে বলুন সমাজ পরিবর্তনের?

কার্লোসঃ আমি খুব নিশ্চিত নই এ ব্যাপারে যে আদৌ কোন বদল সত্যি সম্ভব কিনা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। আমি না লিখে পারি না মানে লিখতে হবেই বলে লিখি কিছু ভেতরের শক্তির প্রেরণায়, কিন্তু তা দিয়ে সমাজের সত্যি কোন উপকারে আসছি কি না জানি না

কল্পবিশ্বঃ হয়তো আপনার জীবদ্দশায় নয় আগামীতে।

কার্লোসঃ জানি না সেটা। তবে আমি মাঝে মাঝে বেশ নিরাশাবাদী হয়ে যাই পৃথিবীর অবস্থা দেখে ...

কল্পবিশ্বঃ কিন্তু যেমন ধরুন ফরাসী বিপ্লবের সময় ভলতেয়ার, রুশো এদের লেখা যাকে বলে অণুঘটকের কাজ করেছিল। তাতিয়ে দিয়েছিল লোককে।

কার্লোসঃ এই প্রসঙ্গটা ভালো তুলেছ আমার বোঝাতে সুবিধে হবে। যে লেখা সত্যি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে সমর্থ হয় মানে ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব বা নাৎসি বিপ্লব (সবাই মিলে হাসতে হাসতে) সেটা আসলে স্লোগান। কোন জ্ঞানগর্ভ রচনা দিয়ে তুমি অনেক লোককে তাতাতে পারবে না কারণ সেই লেখাগুলোতে আসলে সব কিছুর অন্তঃসারশূণ্যতা নিয়ে বয়ান করা আছে। বরং তুমি যদি ছোট ছোট স্লোগান লেখো যেমন 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', 'বিপ্লবের শত্রুরা নিপাত যাক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের ভেতরে কিন্তু আদতে যা লুকিয়ে আছে তা হল এক ধরণের আমলাতন্ত্রকে বাদ দিয়ে অন্য ধরনের আমলাতন্ত্রে যাবার ছাড়পত্র। বাইরে 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' কিন্তু পরে দেখো আবার সেই আমলাতন্ত্র, মানুষের ওপর অত্যাচার বা রোবস্পীয়র এসব। এগুলো খুব সহজ সাধারণ মানুষের বোঝবার জন্য। অমুক নেতার দশ সূত্র বা কমান্ডমেন্ড এসব মানুষকে সহজে বোঝাতে বা তাতাতে পারবে। অনেক সময় এভাবে অনেক ভুল মতবাদও মানুষের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। ভুল মানে সময়ের মাপে যেগুলো পরে একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে। এসব স্লোগানের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তুমি বা আমি যে পৃথিবী বা ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখি সেখানে উত্তরণ ঘটানো যাবে না এই সমাজকে। স্বপ্নের ওই মুক্তমনা সমাজে পৌঁছনোর জন্য অনেকগুলো প্রায় দুস্তর বাধা আছে। আমি যে দ্বীপে থাকি সেখানে প্রায় ৩০,০০০ লোকের বাস। তাদের কিছু নিজস্ব নিয়ম কানুন আছে। হয়তো মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বলে কিছু কিছু তাদের কিছু ব্যবস্থা আমাদের অন্যরকম বা অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু আদতে সেই একই আমলাতান্ত্রিক কাঠামো মানে অসংখ্য নিয়মের বেড়াজাল। আসলে সমস্যা মানুষের মধ্যেই। এখন যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাহায্যে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগছেন।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

একদিন হয়তো এই পৃথিবী এই কৃত্রিম মানুষে ভরে যাবে আর আমরা মানে সত্যি মানুষেরা এখানকার পাট গুটিয়ে অন্য গ্রহে পাড়ি দেব। আমরা কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম দ্যাখো। তোমাদের প্রশ্নটা ছিল সাহিত্যের দ্বারা সত্যি পরিবর্তন সম্ভব কি না, আমার উত্তর হচ্ছে যে সাহিত্যের প্রভাব ছাড়াও সমাজ তার নিজস্ব নিয়মে চলে কিছু অদ্ভুত কার্য কারণের মাধ্যমে।

কল্পবিশ্বঃ স্পেনে এখন পাঠকেরা কি কল্পবিজ্ঞান নিয়ে উৎসাহী?

কার্লোসঃ অনেকদিন ধরেই স্পেনের সাধারণ পাঠক হয়তো রোমাঞ্চকর গল্প বা হালকা সাই-ফির ধাঁচে স্পেস অপেরা এসব নিয়েই বেশী উৎসাহী ছিল। খুব আস্তে আস্তে একটু একটু করে তারা একটু নতুনত্বের স্বাদ চাইছে। আমার বেশ কিছু বড়ো আর ছোট গল্প বেরিয়েছে এর মধ্যে। তোমাদের যে গল্পটা বলেছি সেটা এক বছর পুরস্কার পেয়েছে সায়েন্স ফিকশন সোসাইটিতে, আর ওরা একটা সংকলনে রেখেছেন সেটাকে।

কল্পবিশ্বঃ এটা তো খুব ভালো খবর।

কার্লোসঃ এর মধ্যে একটা লেখা আদৌ প্রথাগত কল্পবিজ্ঞান নয়। আগামী কুড়ি বছর পরে সমাজের ছবিটা কেমন হবে তা নিয়ে একটা গল্প। সেটাও সাইন্স ফিকশন সোসাইটিতে মনোনীত হয়েছিল ২০০৭ সালে।

কল্পবিশ্বঃ আমাদের মাতৃভাষা মানে বাংলা সাহিত্যে যদি কল্পবিজ্ঞানের অবস্থা কথা বলি, তাহলে দেখব ঊন-বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিক থেকেই কিছু বিজ্ঞানীরা নিজেই বিজ্ঞান ঘেঁষা গল্প লেখা শুরু করেন। পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম নাগাদ কিছু লেখক জুল ভের্ণ বা এইচ জি ওয়েলস্ বা অন্য বিখ্যাত লেখকদের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত লেখা শুরু করেন। ওই শতাব্দীর মাঝামাঝি মানে পাঁচ আর ছয়ের দশক থেকে দুজন অগ্রগণ্য লেখক এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র আর সত্যজিৎ রায়। আপনি হয়তো সত্যজিৎ রায়ের নাম জানেন সিনেমা নির্মাতা হিসেবে।

সিনরিটা কার্লোসঃ হ্যাঁ রে'র নাম শুনেছি।

কল্পবিশ্বঃ ওঁর গদ্যটা খুব সাবলীল যদিও ছোটদের জন্য। এক সময় একটা গল্প লিখেছিলেন 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' বলে যেখানে এক সাধারণ গ্রামের লোকের সঙ্গে একজন ভিনগ্রহীর দেখা হয়। সেই এলিয়েন তাকে মানসিক তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সমাজের ছবি দেখায় যেখানে কোন হিংসা বা যুদ্ধ নেই। 'ইটি' সিনেমার সঙ্গে এর বেশ কিছু মিল আছে। একসময় এ নিয়ে নানা রকম কথাও রটেছিল যে ইটির চিত্রনাট্যে এই গল্প বা এই গল্প থেকে ওঁর করা চিত্রনাট্যের বিরাট প্রভাব আছে। যদিও দুঃখজনক ভাবে ওঁর নিজের চিত্রনাট্য থেকে ছবিটা হয়ে ওঠে নি। আপনি কি অপু ট্রিলোজির নাম শুনেছেন? তিনটে ছবিতে অপু নামে একটা ছেলের জীবনের নানা স্তর দেখানো হয়েছে তাঁর ছোটবেলা থেকে মধ্য যৌবন অবধি। সে এমন একজন মানুষ যে প্রকৃতিকে প্রায় নিজের জীবনের একটা অংশ বলেই ভাবে। আর ছোটবেলায় তাকে এই ধারনাগুলো গড়তে সাহায্য করেছিল ওঁর দিদি যে পরে মারা যায় চিকিৎসার অভাবে, কারণ ওরা বড়ো গরীব ছিল।

কার্লোসঃ আমার এটা শুনেই খুব কৌতূহল হচ্ছে। একটা মানবিক টেস্টামেন্ট বলে মনে হচ্ছে এই ছবিগুলো দাঁড়াও নামটা লিখে নিই। আমি তোমাদের শহরে এই নিয়ে তিনবার এলাম কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতাটা সত্যি অসামান্য।

কল্পবিশ্বঃ আমরাও ভাবছি যে গতকাল পর্যন্ত আমরা পরস্পরের অজানা ছিলাম মানে নামও জানতাম না কেউ কারো আর এই সন্ধেবেলা মনে হচ্ছে আমরা বন্ধু। এই অভিজ্ঞতাগুলোই হয়তো বুঝিয়ে দেয় যে আমরা আসলে পৃথিবী নামে একটা বিশাল দেশের নাগরিক।

কার্লোসঃ তোমরা এরপর যদি মাদ্রিদে আসো কোন সাই-ফাই কনফারেন্সে বা তা সে ইউরোপের অন্য কোন শহরেই হোক না কেন একবার জানাবে আমায় ঠিক পৌঁছে যাব। আমরা এখন রিটায়ার্ড আর পৃথিবীটাও অনেক ছোট হয়ে এসেছে। আমি যেটা করতে পারি তা হল আমার একটা লেখা মানে ইংরেজি অনুবাদে তোমাদের দিয়ে দেব যদি তোমরা বাংলায় লিখতে চাও সেটা। সেই লেখাটাও কিন্তু একটু নিরাশার।

কল্পবিশ্বঃ সেটা আমাদের সৌভাগ্য হবে। আমরা শুধু শিশুপাঠ্য কল্পবিজ্ঞান নয় বরং পরিণতমনস্ক লেখা নিয়েই কাজ করতে চাই। আচ্ছা এত কিছু অবিশ্বাসের পরেও আপনি কি কিছুর ওপর আস্থা রাখেন?

কার্লোসঃ হ্যাঁ সব কিছুর পরেও আমার আস্থা কিছুটা হলেও আছে সাধারণ মানুষ আর মানবিকতার ওপরে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কল্পবিশ্বঃ বাংলায় নতুন করে যারা কল্পবিজ্ঞান লিখতে চাইছেন তাদের জন্য কি পরামর্শ আছে আপনার?

কার্লোসঃ একটাই কথা বলব চারিদিকের পৃথিবীটাকে ভালো ভাবে অনুধাবন করো। লেখা নিজে থেকেই চলে আসবে।

কল্পবিশ্বঃ আমরা আশা রাখব আপনাদের দুজনের সঙ্গেই কল্পবিশ্বের যে বন্ধুত্বের সূচনা হল সেটা অটুট থাকবে।

কার্লোসঃ আমি অবশ্যই যোগাযোগ রাখব তোমাদের সঙ্গে...

সময়ের ফ্রেমে ধরা সেই অমলিন স্মৃতির মুহূর্তকে

পরের কথাঃ কার্লোস তাঁর দেয়া কথামতো এর পরে বেশ কিছু মেইলের মধ্যে দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। আমেজিং স্টোরিজে তাঁর লেখা গল্পের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজিতে লেখা তার একটা নির্যাস তিনি পাঠিয়েছেন কল্পবিশ্বকে। এর সঙ্গে ফ্রিডরিশ নীৎসে (নীচে), মেরি ডগলাস, পল লিগেন্ডার প্রমুখ বিখ্যাত চিন্তাবিদের অসংখ্য বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন আমাদের জন্য যা কল্পবিশ্বকে আগামী রচনার দিশা জোগাবে। আমরা আশা রাখব যে এই পারস্পরিক চিন্তাস্রোতের আদানপ্রদান বাংলা সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞানে একটা নতুন যুগের সূচনা করবে।

কার্লোস সুচলওস্কি কন – সংক্ষিপ্ত জীবনী

আধুনিক স্প্যানিশ সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান এবং অধিবাস্তববাদী ধারায় একটা উজ্জ্বল নাম কার্লোস সুচলওস্কি কন। জন্ম ১৯৪৮ সালে আর্জেন্টিনায় কিন্তু কর্মসূত্রে ১৯৭৬ থেকেই স্পেনের বাসিন্দা কার্লোস। সেই সাতের দশক থেকেই ওঁর লেখা আর্জেন্টিনা এবং স্পেনের নানা সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অ্যাক্সন, আর্টিফেক্স, মাইক্রোরিলেটস্ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে প্ল্যানেটাস প্রহিবিডোস্ এর মতো বিখ্যাত ওয়েব ম্যাগাজিনেও তার অনেক লেখা বেরিয়েছে। ওঁর নিজস্ব ভাবনাগুলো ব্লগ হিসেবেও প্রকাশ করে থাকেন কার্লোস। বেশ কিছু নামী কল্পবিজ্ঞান সংকলনে ওঁর লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৮৮ সালে ওঁর একটা গল্প এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত স্তরে মনোনীত হয়েছিল। স্প্যানিশ সি এফ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সংকলনে তিনবার মনোনীত হয়েছে কার্লোসের লেখা। এর মধ্যে ২০০৭ সালের সংকলিত লেখাটা সেই বছরের সেরা ছোটগল্প বলে মনোনীত হয়। ২০০৭ সালে প্রকাশনা সংস্থা মান্দ্রাগোরা এডিশন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

থেকে ওঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় যার নাম 'উনা ন্যুয়েভা কনসিয়েন্সিয়া'। ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে ওঁর লেখা অনূদিত এবং সমাদৃত হয়েছে বারবার। বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় আয়োজিত বিখ্যাত সাহিত্য প্রতিযোগিতা 'গোল্ডেন কান' এর চূড়ান্ত স্তরে অন্ততঃ দুবার মনোনীত হয় ওঁর লেখা। আর্জেন্টিনার প্রকাশনা সংস্থা অ্যান্ড্রোমিডা থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় ওঁর লেখা গল্পের সংকলন। ২০১৪ সালে প্রকাশিত ওঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ওয়ান্স টিয়েম্পস্ ডে ফ্যুতুরো' ইতিমধ্যেই বহু প্রশংসা এবং সম্মান লাভ করেছে। আগামী দিনে কার্লোসের কলম থেকে আমরা আরো অনেক শক্তিশালী লেখার প্রত্যাশী।

অলঙ্করণ: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

যাত্রাশুরু 'সেরা কল্পবিশ্ব-২০১৬'

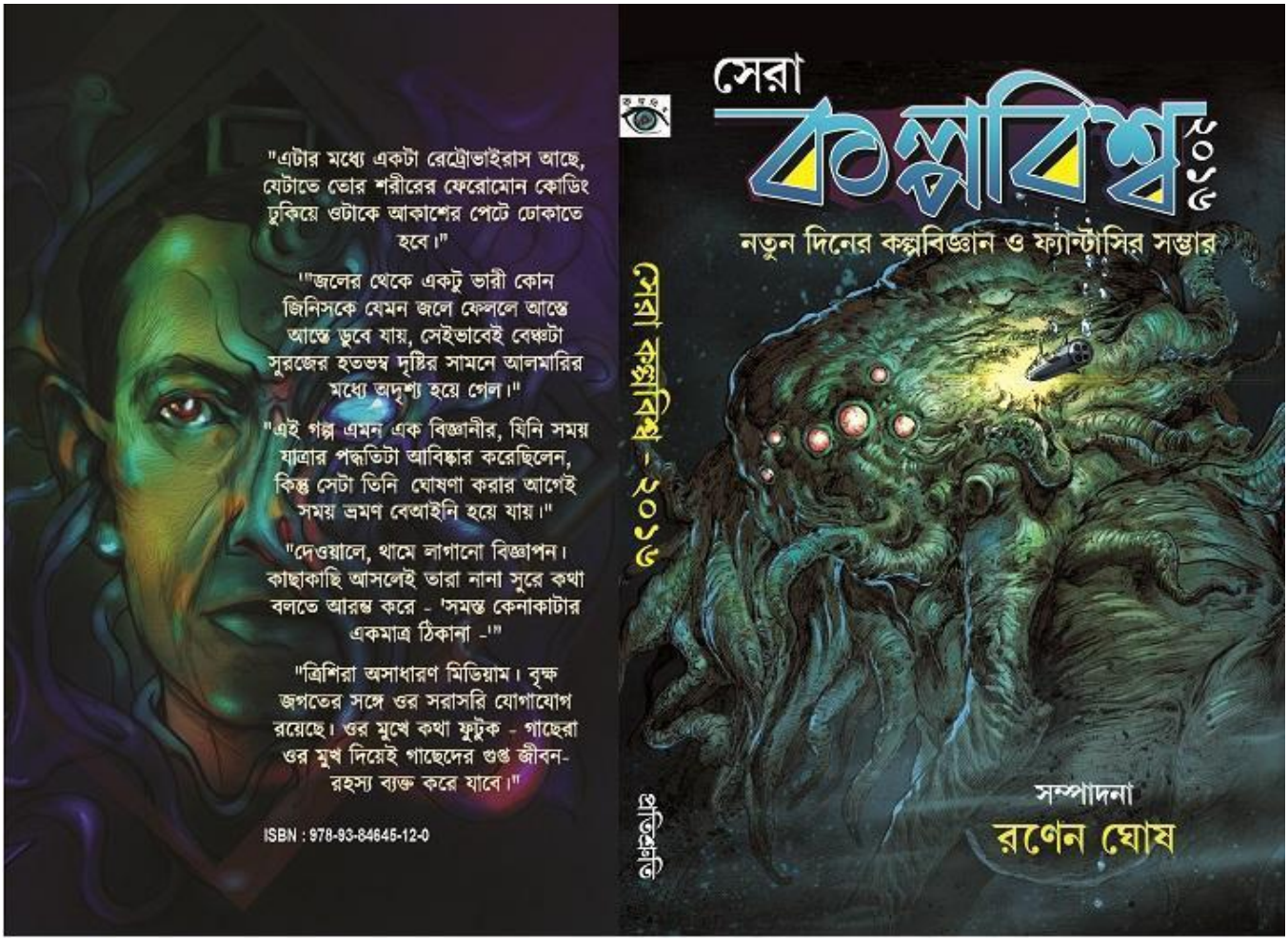

প্রিয় পাঠক,

আপনাদের প্রিয় পত্রিকা 'কল্পবিশ্ব'২০১৬-এর জানুয়ারি মাসে পথচলা শুরু করে আজ অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে। আমাদের এই চলার পথে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ও আনন্দের পর্যায় আমরা পার করে এসেছি কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০১৭-এ। এই বইমেলায় আমরা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছি বৈদ্যুতিন আকার-এর পাশাপাশি ছাপার হরফেও। প্রকাশিত হয়েছে কল্পবিশ্ব ওয়েব-ম্যাগাজিনের প্রথম বর্ষের নির্বাচিত কিছু লেখা নিয়ে একটি সংকলন, 'সেরা কল্পবিশ্ব-২০১৬'।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে 'সেরা কল্পবিশ্ব-২০১৬'-এর পথ চলা শুরু হয়েছে বাংলা বিজ্ঞান তথা জঁর সাহিত্যের দুই স্তম্ভ শ্রী রণেন ঘোষ ও শ্রী অমিতানন্দ দাস –এর হাত ধরে।

এই সংকলন প্রকাশের মুহূর্ত আমাদের কাছে আরো স্মরণীয় হয়ে থাকবে আরো একটি কারণে। এই আনন্দঘন মুহুর্ত আমরা উদযাপন করেছি বাংলা ভাষায় অত্যন্ত জনপ্রিয় আরো দুটি ওয়েব-ম্যাগাজিন, জয়ঢাক ও ম্যাজিক-ল্যাম্প-এর সঙ্গে। এই প্রথম বাংলা ভাষার তিনটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ওয়েব-ম্যাগাজিন এক মঞ্চে একসাথে একস্বরে ঘোষণা করেছে বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরিত মাধ্যমের জয়ধ্বনি।

আপনাদের জন্য রইলো আমাদের সংকলন প্রকাশ ও বাংলার তিন ওয়েব-ম্যাগাজিনের সমবেত অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত নিচের ভিডিও-টিতে।

https://www.youtube.com/watch?v=0Rw0G0SIGhA&feature=youtu.be

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

জাপানি উপকথা:

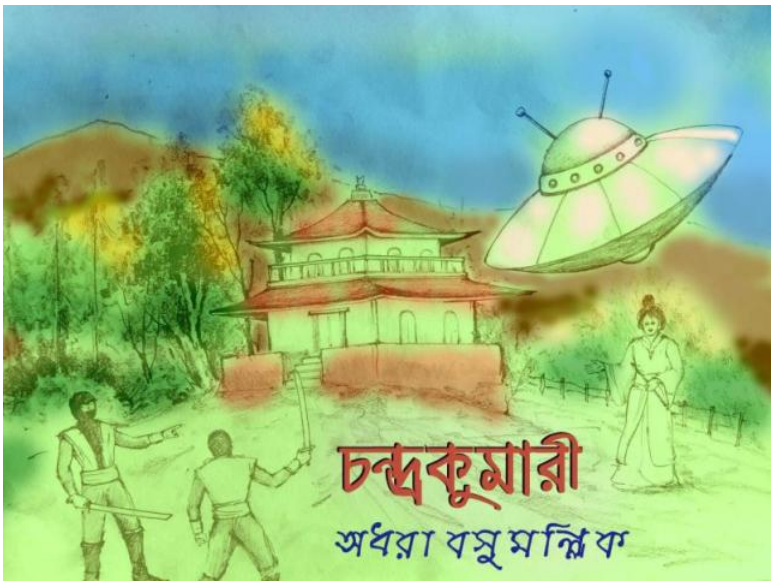

জাপানের এই উপকথাটা খুব আশ্চর্যরকমের সুন্দর। অনেকে বলে থাকেন আধুনিক কল্পবিজ্ঞানের গল্পের আদিরূপ এই উপকথাতেই প্রথম পাওয়া যায়। অনেকে আরো বলেন, উপন্যাস ইত্যাদির বীজও লুকোনো ছিল এই উপকথায়।

এক দেশে এক গরীব কাঠুরিয়া থাকতো। গ্রামপ্রান্তের ছোটো এক কুটিরে কাঠুরিয়া আর তার স্ত্রী বাস করতো। সকালবেলা দু'টি খেয়ে নিয়ে কাঠুরিয়া নিজের কুড়ুলটি আর ঝোলাটি নিয়ে বেরিয়ে যেতো, সারাদিন বনে বনে কাঠ, বাঁশ কাটতো, দিন ফুরালে সব বোঝা বেঁধে পিঠে নিয়ে ঘরে ফিরতো। ঘরে তখন তার বৌ গরম খাবার বানিয়ে অপেক্ষা করতো, সে ফিরলে হাতমুখ ধোয়ার জল দিতো, গামছা এগিয়ে দিতো, তারপরে তারা দুইজনে খেতে বসতো। হাটের দিনে কাঠুরিয়া ঐসব সংগ্রহ করা কাঠ বাঁশ সব নিয়ে হাটে বিক্রি করে যা টাকা পেতো তাই দিয়ে খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিস কিনে আনতো।

এইভাবে তাদের দিন কাটছিলো, গরীব হলেও সেই নিয়ে তাদের তেমন দুঃখ ছিলো না, মোটা ভাত মোটা কাপড়েই তারা সন্তুষ্ট ছিলো। কেবল একটিমাত্র দুঃখ তাদের, বহু বছর তাদের বিবাহ হয়েছে, একত্রে সংসার করছে তারা বহু বছর, কিন্তু আজো সন্তানের মুখ দেখতে পেল না। মাঝে মাঝে কাঠুরিয়ার বৌ স্বামীকে বলতো, "সারাটা দিন তুমি বাইরে থাকো কাজে, আমি টুক টুক করে এটা করি সেটা করি, রান্না করি, সেলাই করি, পাখা বানাই - কিন্তু মাঝে মাঝে দিন যেন আর কাটতে চায় না। একটা সন্তান থাকলে তাকে নিয়ে দিন আমার কেটে যেতো, কত যত্ন করে বড় করতাম তাকে।" বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলতো আর কাঠুরে বলতো, "কেঁদো না বৌ, আমাদের ভাগ্যে থাকলে হবে, না হলে নাই। ঈশ্বর দয়া করলে হবে। এ তো জোর করে লাভ নেই, কপালের উপরে তো আমাদের হাত নেই।"

এমনি করে দিনের পর দিন যায়। একদিন কাঠুরিয়া সারাদিন বনে কাঠ কেটেছে, কাজ করতে করতে কখন যে সূর্য ডুবে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তার খেয়াল নেই। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে দেখে সে তাড়াতাড়ি কাঠ বাঁশ বোঝা বেঁধে বাড়ির দিকে চললো। চলতে চলতে বনের প্রায় প্রান্তে এসে গেছে সে, সামনে একটা খোলা মাঠ মাত্র, সেটুকু পেরোলেই তার গ্রাম। বনের মধ্যে হঠাৎ সে দেখলো ঝোপের আড়াল থেকে জ্যোৎস্নার মতন আলো বেরিয়ে আসছে। এখানে আলো? কেমন করে এলো? কৌতূহলী হয়ে কাঠুরিয়া এগিয়ে গেল।

গিয়ে দ্যাখে, একটা মস্ত মোটা বাঁশের মতন কী একটা জিনিস, কিন্তু চকচকে সেটা, যেন বা ধাতুর তৈরী। সেটার থেকে জ্যোৎস্নার মতন আলো আসছে, যেন চাঁদ নেমে পড়ছে বনে। মন্ত্রমুগ্ধের মতন আরো এগিয়ে গেলো কাঠুরিয়া, কাছে গিয়ে শোনে ভিতর থেকে ওয়াঁ ওয়াঁ শব্দ

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আসছে, যেন বা সদ্যোজাত শিশুর কান্না। এর ভিতরে মানুষ আছে নাকি?

বোঝা নামিয়ে রেখে নিজের কুঠারটি দিয়ে সে আঘাত করে সেই অদ্ভুত আলোময় বাঁশের গায়ে, অমনি একটা টুকরো ভেঙে যায়, সেই গর্ত দিয়ে উঁকি দিয়ে কাঠুরিয়া দ্যাখে ভিতরে বিস্ময়কর কান্ড! ভিতরে একটা নরম তুলো-তুলো বিছানা, সেই বিছানায় শুয়ে আছে একটা খুব ছোট্টো মেয়ে, এত ছোটো যে কাঠুরিয়ার হাতের তালুতে এঁটে যাবে, সেই মেয়েই ওয়াঁ ওয়াঁ করে কাঁদছে। বাচ্চাটির শিয়রের কাছে কতকগুলো সোনার মোহর।

কাঠুরিয়া খুব সাবধানে বাচ্চা মেয়েটিকে বার করে আনে, তারপরে তুলো তুলো বিছানাটাও। সোনার মোহরগুলোও। তুলো তুলো বিছানা দিয়ে বাচ্চাটিকে সাবধানে জড়িয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে কাঠুরিয়া দ্রুত নিজের বাড়ীতে ফিরে আসে। বাড়ীতে এসে নিজের বৌকে সব ঘটনা বুঝিয়ে বলে সে। বৌ তো মেয়েটিকে পেয়ে খুব খুশি, এতদিনে সে তার মনের সাধ পুরিয়ে এই বাচ্চাকে মানুষ করতে পারবে।

তারপরে দিন যায়, দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতন বাড়তে থাকে তাদের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। কাঠুরিয়া আর তার বৌ মেয়ের নাম রাখে চন্দ্রকুমারী। কাঠুরিয়াদের আর দুঃখ নেই, দারিদ্র্যও নেই। সেই যে সোনার মোহরগুলো পেয়েছিলো, সেগুলো ভাঙিয়েই তাদের দারিদ্র্য ঘুচে গেছে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর কাটে। চন্দ্রকুমারী এখন কিশোরী হয়ে উঠেছে। সে এত সুন্দরী হয়েছে যে তার দিকে চাইলে মানুষ চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়। উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে চন্দ্রকুমারীর কথা।

কিন্তু চন্দ্রকুমারী কেমন যেন আত্মমগ্ন, সে নিজের মনে নিজের লেখাপড়া আর শিল্পকর্ম নিয়ে থাকে। গ্রামে তার কত বন্ধু বন্ধুনী, তাদের সঙ্গে ছোটো থেকে খেলাধূলা করে সে বড় হয়েছে, কিন্তু তাও কেন জানি সকলের থেকে সে আলাদা। তার মনের নাগাল কেউ পায় না, বন্ধুরা না, বাবা না, মা না। তার বাবা-মা মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে তাকে তারাভরা রাতের আকাশের নিচে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে দ্যাখে আর কেমন একটা আনন্দবিষাদ তাদের ঘিরে ধরে, ও যে পৃথিবীর মেয়ে নয়, কোথা থেকে একদিন এসেছিলো তাদের ঘরে, আবার বুঝি কবে চলে যাবে!

তারপরে চন্দ্রকুমারীর যখন বিবাহের বয়স হলো তখন চার দিক থেকে চার রাজপুত্র এসে তার পাণিপ্রার্থী হলো। কিন্তু চন্দ্রকুমারীর মন পৃথিবীর মানুষকে বিবাহ করতে সায় দেয় না। এদিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেও এই রাজকুমারেরা হয়তো ক্ষুব্ধ হবে, তাহলে উপায়? বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, একটা খুব চমৎকার উপায় সে ঠিক করলো।

প্রথম রাজপুত্রকে সে বললো, "রাজপুত্র, আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি এক শর্তে।"

রাজপুত্র সাগ্রহে জানতে চায়, "কী শর্ত?"

চন্দ্রকুমারী বলে, "জম্বুদ্বীপে আছে মহাভিক্ষু দশবলের পবিত্র ভিক্ষাপাত্র। সেই ভিক্ষাপাত্র খুব পবিত্র, সর্বদা তা থেকে দিব্যজ্যোতি স্ফুরিত হয়। যদি ঐ ভিক্ষাপাত্র এনে দিতে পারো আমায়, তবেই তোমাকে আমি বিবাহ করবো।"

এই শুনে রাজপুত্র জম্বুদ্বীপের দিকে রওনা দেয়।

দ্বিতীয় রাজপুত্রকে সে বললো, "রাজপুত্র, আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি এক শর্তে।"

রাজপুত্র সাগ্রহে জানতে চায়, "কী শর্ত?"

চন্দ্রকুমারী বলে, "প্লক্ষদ্বীপে আছে এক আগুনমুখো ড্রাগন, সেই ড্রাগনের গলায় আছে এক অপূর্ব রত্নহার, সেই রত্নহারের কেন্দ্র মণিটি, তার জোড়া নেই ভুবনে। যদি সেই মণিটি আমাকে এনে দিতে পারো, তবেই তোমায় আমি বিবাহ করবো।"

এই শুনে রাজপুত্র প্লক্ষদ্বীপের দিকে রওনা দিলো।

তৃতীয় রাজপুত্রকে সে বললো, "রাজপুত্র, আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি এক শর্তে।"

রাজপুত্র সাগ্রহে জানতে চায়, "কী শর্ত?"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

চন্দ্রকুমারী বলে, "শাল্মলীদ্বীপে আছে এক আশ্চর্য বৃক্ষ, যার প্রতিটি শাখা রত্নময়। যদি সেই গাছের একটি শাখা আমায় এনে দিতে পারো, তবেই তোমায় আমি বিবাহ করবো।"

এই শুনে রাজপুত্র শাল্মলীদ্বীপের দিকে রওনা দিলো।

চতুর্থ রাজপুত্রকে সে বললো, "রাজপুত্র, আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি এক শর্তে।"

রাজপুত্র সাগ্রহে জানতে চায়, "কী শর্ত?"

চন্দ্রকুমারী বলে, "ভদ্রাশ্ববর্ষে আছে এক অদ্ভুত অগ্নি-মুষিক। সেই অগ্নিমূষিকের আছে এক আলো-ঝলমল দিব্যবস্ত্র। সেটা আমায় এনে দিতে পারলে তবেই আমি তোমায় বিবাহ করবো।"

এই শুনে রাজপুত্র ভদ্রাশ্ববর্ষের দিকে রওনা দিলো।

প্রথম রাজপুত্র জম্বুদ্বীপের দিকে রওনা দিয়েছিলো বটে কিন্তু যেতে যেতে মনে করলো মহাভিক্ষু দশবলের ভিক্ষাপাত্র পাওয়া কি সোজা কথা? তার চেয়ে এখানকার কোনো ভিক্ষু উপাশ্রয় থেকে দামী একটা ভিক্ষাপাত্র কিনে নিয়ে যাই। তো সে তাই করলো, একটি দামী ভিক্ষাপাত্র এনে চন্দ্রকুমারীকে দিল। কিন্তু সেটা যে জাল, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি চন্দ্রকুমারীর, ভিক্ষাপাত্র থেকে কোনো দিব্যজ্যোতি বেরোচ্ছিলো না।

দ্বিতীয় রাজপুত্র রওনা হয়েছিলো প্লক্ষদ্বীপের দিকে কিন্তু যেতে যেতে মনে করলো ওরে বাবা, ড্রাগনের গলার হারের মণি, সে কি সোজা কথা? আর প্লক্ষদ্বীপ এমনিতেও অনেক দূরে, সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। সে এক নাবিককে অনেক টাকা দিয়ে প্লক্ষদ্বীপে যেতে রাজী করালো, কথা হলো সেখান থেকে নাবিক তাকে ড্রাগনের গলার হারের কেন্দ্রমণিটা এনে দেবে। নাবিক টাকাকড়ি সব নিয়ে নিজের লোকজন নিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লো প্লক্ষদ্বীপের দিকে।

তারা তো আর আসে না আর আসে না, ঝড়ে পড়ে ডুবে গেল নাকি? কিংবা ড্রাগন ওদের সবাইকে খেয়ে ফেললো? এইসব ভেবে দ্বিতীয় রাজপুত্র তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের রত্নভান্ডার থেকে খুব দামী একটা মণি নিয়ে রওন হলো চন্দ্রকুমারীর কাছে। সেটা যে জাল, তা ধরে ফেলতে চন্দ্রকুমারীর সামান্য সময় লাগলো। ধরা পড়ে মুখ চুন করে ফিরে গেলো রাজপুত্র।

তৃতীয়জনও জাল জিনিস এনে দেখিয়েছিলো ও ধরা পড়ে গেছিল। চতুর্থজন ফিরে আসেনি আর, হয়তো বা কাজটি না করতে পারার লজ্জায়।

এর কিছুকাল পরে দেশের মহারাজ স্বয়ং মৃগয়ায় এলেন চন্দ্রকুমারীদের গ্রামের কাছে। সেই সময়ে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এই বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী চন্দ্রকুমারীর। মহারাজ তো তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুত্ব করলেন। তারপরে যখন তাদের বন্ধুত্ব খুবই দৃঢ় হয়েছে, তখন মহারাজ চন্দ্রকুমারীকে বিবাহ করতে চাইলেন।

তখন ছিলো সন্ধ্যেবেলা। মহারাজ আর চন্দ্রকুমারী প্রান্তরে বেড়াচ্ছিলো পঞ্চমীর চাঁদের আলোয়। নানা কথা বলছিলো, হাসছিলো তারা দু'জনে। যেন তারা একজন দেশের মহারাজ আর একজন গ্রামের এক সামান্য মেয়ে নয়, যেন তারা দুই সমপর্যায়ের বন্ধু। তারপরেই একসময় এলো মহারাজের বিবাহপ্রস্তাব। শুনে চন্দ্রকুমারী হঠাৎ বিষন্ন হয়ে গেল, বললো, "মহারাজ, পৃথিবীর কোনো মানুষকেই যে বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব না! আমি পৃথিবীর কেউ নই। ঐ যে চাঁদ, ঐখানে আমার আসল ঘর। শীঘ্রই আমার নিজের লোকেরা আমাকে ফিরিয়ে নিতে আসবে। সব ছেড়ে আমার চলে যেতে হবে, হয়তো আর কোনোদিন এখানের কারুর সঙ্গে দেখা হবে না।" জ্যোৎস্নায় মহারাজ দেখলেন চন্দ্রকুমারীর দুই চোখে টলটল করছে অশ্রু।

রাজা দু'হাত দিয়ে চন্দ্রকুমারীর দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "কে তোমাকে নিয়ে যাবে? কেউ নিতে পারবে না। আমি আমার সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করবো তোমাদের বাড়ির চারপাশে। দেখি কে তোমাকে কীভাবে নিয়ে যায়।" শুনে চন্দ্রকুমারী কেবল ম্লান হাসলো।

মহারাজ সত্যিই বিরাট সেনাবাহিনী এনে মোতায়েন করলেন কাঠুরিয়ার বাড়ির চারপাশে। আর ভয় নেই, কেউ চন্দ্রকুমারীকে কেড়ে নিতে পারবে না।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

পূর্ণিমার রাতে আশ্চর্য দিব্যবিমানে চড়ে চন্দ্রকুমারীর দেশের লোকেরা এসে নামলো কাঠুরিয়ার বাড়ির সামনে। পাহারাদার সৈন্যরা সকলে আলোর ঝলকানিতে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গেল, অবশ হয়ে গেল। কোনোরকম লড়াই তো দূরের কথা, কোনো বাধা দেবারও সামর্থ্য তাদের রইলো না, তাদের নড়াচড়ার ক্ষমতাই সাময়িকভাবে হরণ করে নেওয়া হয়েছিল।

চন্দ্রকুমারীর আপন লোকেরা তার ঘরে গেল, সেখানে তাদের অপেক্ষাতেই ছিলো তাদের মেয়ে।

কিন্তু মেয়ের চোখে তখন অশ্রু, পৃথিবীর এই মানুষগুলো তার বড় আপন, তার এই পালক পিতামাতা যারা নিজের সন্তানের মতন তাকে পালন করে শৈশব থেকে এত বড়টি করেছেন, এই গ্রামভর্তি তার বন্ধুরা যাদের সাথে খেলেধূলে সে বড় হয়েছে, এই মহারাজ যিনি তাকে অকপট বন্ধুত্ব দিয়েছেন - এই সবাইকে ছেড়ে যেতে তার মন চায় না, তার বুকের মধ্যে অশ্রুসমুদ্র উথলে ওঠে। কিন্তু যেতে তো হবেই, উপায় তো নেই।

চন্দ্রকুমারী চিঠি লিখে সব জানিয়ে মহারাজের জন্য রাখে সেই চিঠি। চিঠির সাথে রাখে একটি উপহার। তারপরে সে তার বাবামায়ের কাছে বিদায় নিতে যায়। কাঁদতে কাঁদতে সে জানায় আজ সে চলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু একদিন সে আবার ফিরে আসবে।

এদিকে সময় গড়িয়ে চলেছিল, চাঁদের দেশের লোকেরা তাড়াতাড়ি এসে তাদের মেয়েকে একটি পালকের পোশাক পরিয়ে দিল। যেই না সেটা পরানো অমনি চন্দ্রকুমারীর মন থেকে পার্থিব মায়া আর পিছুটান লুপ্ত হয়ে গেল। যারা তাকে নিতে এসেছিল, তাদের সাথে চন্দ্রকুমারী গিয়ে দিব্যবিমানে চড়ে বসলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দিব্যবিমান শূন্যে মিলিয়ে গেল।

কাঠুরিয়া আর তার স্ত্রী পালিতা কন্যার শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। সাঁঝের বেলা উঠোন থেকে চাঁদের দিকে চেয়ে তারা কেবল চন্দ্রকুমারীর কথাই ভাবতো। বয়সও হয়েছিলো তাদের, একসময় তারা অসুখ হয়ে মারা গেল দুইজনেই।

প্রতি রাতে মহারাজ চন্দ্রকুমারীর চিঠিটি আর উপহারটি হাতে নিয়ে আকাশভরা তারার নিচে ঘুরে ঘুরে ভাবতেন সে কি আবার আসবে, কখনো আসবে?

নাকি "এ পৃথিবী একবারই পায় তারে, পায় নাকো আর!"

(সমাপ্ত)

অলঙ্করণ: ধ্রুবজ্যোতি দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

জাপানি গল্পের অনুবাদ:

কোন কারণ নেই।

কেন সবসময় কারণ থাকতেই হবে? মানুষ শুধু কারণ খোঁজে, কিন্তু আসল কারণ গুলোর পেছনের যুক্তিকে কখনোই ব্যাখ্যা করা যায় না। এই যে মানুষের সমস্ত জীবন কেন এরকম? কেন শুধু এইভাবেই চলে, অন্য কোনভাবে কেন নয়?

এই ধরনের প্রশ্নকে কি কেউ কোনদিন ব্যাখ্যা করতে পেরেছে?

****

প্রচন্ড আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে জানলার বাইরে তাকিয়ে মানুষটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। কখনো কখনো হঠাৎই এই ধরনের উন্মত্ততা তাকে উদ্বেল করে তোলে। তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে এক অযৌক্তিক হিংস্র ধ্বংসের তাড়না। এটা সে কাউকে বোঝাতে পারবে না। ভেতরের ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে, হ্যাঁচকা টানে পর্দাটা টেনে দিয়ে সে নিজেকে শক্ত করে ফুসফুস ভরে শ্বাস নিল।

"এই সৃষ্টি, যাতে আমরা বাস করি, বিশ্রীরকমের হাস্যকর। আর বেঁচে থাকা! সেটা তো অত্যন্ত হাস্যকর রকমের বিশ্রী। আর সবথেকে বড় কথা আমার মত ফালতু মানুষ, অসহ্য রকমের হাস্যকর।

কেন এত ফালতু?

কেন? আবার সেই কেন।

অপদার্থ, হাস্যকর, কারণটা খুব সহজভাবে বললেও হাস্যকর আর অপদার্থ। সবকিছু – সমৃদ্ধি, বিজ্ঞান, প্রেম, যৌনতা, রুজিরুটি, বুদ্ধিজীবি মানুষ – প্রকৃতি, পৃথিবী, মহাবিশ্ব – সবকিছু ন্যক্করজনক ভাবে কুৎসিত, হতাশাজনক ভাবে নির্বোধ। এই জন্যে-

না। "এইজন্যে" নয়, কিন্তু সে যাই হোক গে, আমি আসলে কাজটা করব।

"আমি করবই।" সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মানুষটা নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি করেই ছাড়ব।"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অবশ্যই, যদিও এটাও বাকি সবকিছুর মতই একটা মূর্খামি। হয়তো এই পৃথিবীর সমস্ত বোকামিগুলোর মধ্যে সব থেকে বড় বোকামি এটা। তবুও এটার মধ্যে একটা অন্যরকমের স্বাদ আছে, ঝাঁঝালো, তীক্ষ্ণ। সম্ভবতঃ সেটা এই নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনার অন্তঃস্থলে যে পাগলামির ছোঁয়া আছে, হয়ত তারই ফলাফল। হতে পারে, কিন্তু তবুও –

আমি এখন যা করতে চলেছি তা এই পৃথিবীতে আগে কেউ তার সুস্থ মস্তিষ্কে করার চেষ্টা করেনি।

পৃথিবী ধ্বংস করা? কত হাজার হাজার মানুষ ইতিহাসের পাতা জুড়ে কল্পনাটাকে পোষণ করে এসেছে। না, এই মানুষটির পরিকল্পনাটা অতও বস্তাপচা নয়। তার মনুষ্য জীবনের উপরে এই প্রচন্ড আক্রোশ এত গতানুগতিক ফালতু পরিকল্পনায় মিটতে পারেনা।

আমাকে জ্বালিয়ে খাক করা আগুনের শিখাটাকে নেভাতে পারে একটা সত্যিকারে বেপরোয়া কাজ...

*****

ভেতরের ঘরে ঢুকে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল, আলোটাও নিভিয়ে ফেলল। "এইবার" - চিন্তাটাই তার চোখে ক্রুর ঝিলিক তুলল – এইবার আসল কাজ শুরু হবে।

শীতল আলোয় ঘরের ভেতরটা চকচক করছিল। এক কোণে একটা ইলেকট্রিক রেঞ্জ আর ওভেন, একটা গ্যাসবার্নার, একটা মাংস কাটার দা, একটা বড় আর একটা ছোট ফ্রাইংপ্যান, বিভিন্ন রকমের ছুরির সমাহার, এবং একটা রান্নাঘরের ক্যাবিনেট ভর্তি হরেকরকমের সস, মশলা আর সব্জিপাতি। সেগুলোর পাশে একটা অটোমেটেড অপারেশন টেবিল, মানব শরীরের উপর যেকোনো ধরনের অস্ত্রোপচার করার জন্য পুরোপুরি প্রোগ্রামড আর জিনিসপত্রে সজ্জিত, তা সে যতই জটিল আর দুরূহ হোক না কেন – সেরা হাসপাতালগুলোর থেকেও সেরা ব্যবস্থাপনা। আর তারপাশেই, কৃত্রিম অঙ্গের স্তুপঃ হাত, পা, মানবদেহের যতধরনের অত্যাধুনিক কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাওয়া যায়।

সবকিছু প্রস্তুত। সম্পূর্ন একমাস সময় লেগেছে তার, এই পরিকল্পনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তৈরি করতে, আর একমাস লেগেছে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতে। তার হিসাব অনুযায়ী আরও একমাসের একটু বেশী লাগবে সম্পূর্ন কাজটা শেষ করতে।

ঠিক আছে, তাহলে – এবার শুরু করা যাক।

ট্রাউজার খুলে, মানুষটা অপারেশন টেবিলে উঠল। বেশ কিছু কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রোড শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে ভিডিওটেপটা চালু করল।

কাজ শুরু হল –

নাটকীয়ভাবে সে অপারেশন টেবিলের পাশে রাখা স্ট্যান্ড থেকে সিরিঞ্জটা তুলে নিল। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক করে নিয়ে সে একবার প্রেসারটা চেক করলো, – সামান্য হাই হয়ে আছে। স্বাভাবিক, প্রথমবার তো। ডান উরুতে লোকাল আনস্থেটিকের সূঁচটা প্রবেশ করালো সে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পায়ের সমস্ত অনুভূতি চলে গেল। তারপর সে অটোমেটিক অপারেটিং মেশিনটা চালু করল। যান্ত্রিক গুনগুন আর ভোঁ ভোঁ শব্দ, অত্যুজ্জ্বল আলোর দপদপানি; তার সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠল প্রতিবর্ত ক্রিয়ায়। কালো যন্ত্রটার একটা হাত থেকে আরও অনেক বাহু প্রসারিত হচ্ছে তার দিকে।

অপারেটিং টেবিলের ক্ল্যাম্পগুলো তার পা-টাকে জড়িয়ে ধরল জঙ্ঘায় আর গোড়ালিতে। একটা ধাতব বাহুর নখে ধরা সংক্রমন প্রতিরোধক তুলোর প্যাড ধীরে ধীরে এসে তার উরূসন্ধি ঢেকে দিল। বৈদ্যুতিক ছুরিটা মাখনের মত কেটে বসল পায়ে, নিঃসাড়ে ঢুকে গেল চামড়ার মধ্যে; বিশেষ রক্ত ছিলনা। মাসল টিস্যু কেটে গেল। একটা বড় ধমনী খুলে এল। সেটিকে ফরসেপ দিয়ে চেপে ধরা, লিগাটেশ, জোড়া লাগতে চাওয়া পেশীগুলির মধ্যে ফাটল তৈরি করা, গুনগুনে করাতটা ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল ঠিক যেখানে মাসল আর টিস্যুর ফাঁক দিয়ে ফিমার দেখা যাচ্ছে। করাতটা হাড় স্পর্শ করতেই, আকস্মিক ধাক্কায় মানুষটা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অথচ কোনরকম কম্পনই ছিলনা। হীরে বসানো আলট্রাহাইস্পিডের করাতটা অতি মৃদু একটা ঘস ঘস আওয়াজ তুলে হাড়টা কাটতে লাগল, একইসাথে কাটা জায়গা জুড়ে একটা শক্তিশালী উৎসেচকের মিশ্রণও ঘষতে থাকল জায়গাটায়। ঠিক ছয় মিনিটের মধ্যে তার ডান পাটা পরিষ্কারভাবে উরুসন্ধি থেকে বিভক্ত হয়ে গেল।

একটা গজকাপড়ের টুকরো দিয়ে ঘামে ভিজে যাওয়া মুখটা মুছে নিল মানুষটা। যান্ত্রিক হাত এগিয়ে এসে তাকে একগ্লাস ওষুধ ধরিয়ে দিল। এক ঢোঁকে সমস্ত ওষুধটা গিলে ফেলে বুক ভরে শ্বাস নিল সে। তার নাড়ি দ্রুততালে দৌড়াচ্ছে, আরও আরও ঘাম গড়াচ্ছে কপাল বেয়ে। কিন্তু বিশেষ রক্তক্ষরণও হয়নি, আর যন্ত্রণার কোন অনুভূতিও নেই। নার্ভ ট্রিটমেন্টটা খুবই ভালো কাজ করেছে। এই অত্যাধুনিক চিকিৎসায় কোন রক্ত দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। সে ফুসফুসে সামান্য অক্সিজেন টেনে মাথা ঘোরাটা কমাতে চাইল।

তার ডান পাটা তার শরীর থেকে আলাদা হয়ে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকরের মত টেবিলের উপরে পড়ে আছে। যেখানে ফেলা হয়েছিল সেইখানেই। একটা সঙ্কুচিত গোলাপী মাংসপেশি হলুদ চর্বির আস্তরণে ঘেরা, কালচে লাল রঙের মজ্জা সাদা হাড়ের ঠিক মাঝখানে; স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মধ্যে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রক্তক্ষরণ নেই বললেই হয়। সে তাকিয়ে রইল ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকা লোমশ বস্তুটার দিকে। পাগল করা হাসিতে আরেকটু হলেই তার দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন হাসার সময় নয়। এখনো অনেক কাজ বাকি।

সে বেশ কিছুক্ষন বিশ্রাম নিল দূর্বলতা কাটাতে। তারপর পরিকল্পনার পরবর্তী অংশ সম্পাদন করার জন্যে উঠে বসল।

ব্যান্ডেজবিহীন চিকিৎসায় জায়গাটা এরমধ্যেই সেরে উঠেছে; যন্ত্রটা থেকে একটা ধাতব হাত বেরিয়ে এসে একটা আর্টিফিসিয়াল পা তুলে নিল। কৃত্রিম সাইন্যাপস্ সেন্টার থেকে একটি সংকেতপ্রান্ত নিয়ে জোড়া হল কাটা জায়গার একটা স্নায়ুকোষের সাথে। শেষপর্যন্ত, একটা স্ট্র্যাপ আর কিছু বিশেষ বন্ধনীর সাহায্যে কৃত্রিম অবলম্বন অবয়বটি দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে গেল অবশিষ্ট উর্বস্থির সঙ্গে। সে সতর্কভাবে নতুন পাটাকে ভাঁজ করার চেষ্টা করল।

এতক্ষণ অবধি সব ঠিকঠাক আছে। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার বড় দূর্বল লাগছে, হাল্কা কাঁপছেও; কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে আর ধীরে ধীরে হাঁটতেও সক্ষম। নকল চরণটি কোন বিশেষ প্রকার হাল্কা ধাতু দিয়ে তৈরি। প্রতি পদক্ষেপে একটা ক্ষীণ ধ্বনি উঠছে। বেশ, যথেষ্ট ভালো। বেশীরভাগ সময়ে সে হুইলচেয়ারই তো ব্যবহার করবে।

মানুষটা নিজের ডান পাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল। সে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, এতটাই ভারী! ভেতরে ভেতরে আরও একবার সেই পাগলপারা হাসির আক্রোশ তাকে অভিভূত করে দিচ্ছিল। সারাজীবন ধরে আমি এত ভার টেনে বেড়িয়েছি। কত কিলোর বোঝা থেকে সে মুক্তি পেল এই অবলম্বনটাকে দেহ থেকে বাদ দিয়ে?

"বেশ", সে নিজের মনেই বিড়বিড় করল, ফিকফিক করে হাসতে হাসতে, "যথেষ্ট হয়েছে... এবার রক্তটা বের করে ফেলতে হবে।"

সদ্যবিচ্ছিন্ন দূর্বহ অঙ্গটাকে অপারেশন টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সে প্লাস্টিক জ্যাকেটটাকে ছাড়াল। গোড়ালিটা বেঁধে পা-টাকে কড়িবরগা থেকে ঝুলিয়ে তাকে শক্ত হাতে নিংড়াতে শুরু করল। টপ টপ করে রক্ত পড়তে থাকল কাটা মুখটা থেকে।

কিছু পরে সেটাকে বেসিনে ভালো করে ধুতে, জল লেগে স্যাঁতস্যাঁতে লোমশ পাটাকে মনে হচ্ছিল একটা রাক্ষুসে ব্যাঙের পায়ের মত ফ্যাকাসে।

কিছুক্ষন সে বস্তুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। খোঁচা হয়ে বেরিয়ে থাকা হাঁটু, ভাঁজ না হতে চাওয়া মাংসপেশী, হাজা ধরা আঙুল – এটা আমার পা! এবার সে রীতিমত কাঁপতে লাগল, পেটে হাত চেপে নুয়ে পড়ল খিল ধরিয়ে দেওয়া তীব্র হাসিটাকে সামলাতে। শেষপর্যন্ত এই নাছোড়বান্দা খেলুড়ে পা-এর একটা গতি হতে চলেছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এবার রান্না চাপানো যাক।

একটা বড় ছুরি দিয়ে সে পাটাকে হাঁটু থেকে দুখানা করল। একটা ধারালো মাংস কাটার ছুরি দিয়ে ছালটা ছাড়াতে শুরু করল। উরুর কাছে মাংসটা বেশ পুরু আর লোভনীয়। হতেই হবে, এটা যে রাং-এর মাংস। গ্রন্থিগুলো খুবই শক্ত। কাটতে কাটতে সে আবার ঘামে ভিজে উঠল। দ্রুত কাটা মাংসের স্তুপ তৈরি হল। মাংসগুলোয় ঝিল্লী লেগে আছে। টেংরি-র টুকরোগুলোকে সে ফোটাতে দিল একটা হাঁড়িতে। একে একে তাতে পড়তে থাকল তেজপাতা, লবঙ্গ, সেলেরি, পেঁয়াজ, মৌরি, কেশর, মরিচ, আরও নানানরকম মশলা আর সব্জির টুকরো। হাঁটুর কাছে সামান্য মাংস লেগে থাকা বাকি পাটাকে সে ফেলে দিল। স্টেক বানানোর জন্য সে যে রাং-এর মাংসটা সরিয়ে রেখেছিল এবার তাতে নুন আর মরিচ আর প্রচুর দই মাখালো সুস্বাদু করার জন্য।

আমার সাহস হবে এটা খাওয়ার? এতক্ষণে তার মনে প্রশ্ন জাগল। কি একটা যেন গলার কাছে সারাক্ষন দলা পাকিয়ে আছে। সে কি হজম করতে পারবে এটা?

ঘামে ভরে গেছে তার কপাল, দাঁতেদাঁত চেপে মানুষটা বলল, "আমি খাবই"। এটা তো আর পাঁচ দশটা রান্না করা জন্তুর মাংসের থেকে আলাদা কিছু নয়। যেমন মানুষ গরু বা ভেড়া খায়, ওরাও তো ভদ্র, সভ্য, তৃনভোজী; করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। আদিম মানুষরা তো মানুষের মাংসও খেত, এমনকি আজকের দিনেও কিছু বুনোজাতি আছে যারা মানুষের মাংস খায়। খাদ্যের জন্য একটা পশুকে হত্যা করা, এর কি সত্যিও কোন কারণ রয়েছে? অন্যান্য মাংসাশী প্রানীদেরকে বেঁচে থাকতে গেলে হত্যা করতে হয়। কিন্তু মানুষ???

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেদিন থেকে তাদের অস্তিত্ব বর্তমান, মানুষ তাদের লক্ষ লক্ষ সঙ্গীকে হত্যা করেছে কিন্তু খাদ্যের জন্য নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে এটা তো একদমই নিরীহ ব্যাপার। আমি তো আর কাউকে খুন করতে জাচ্ছি না। এমনকি অবলা জন্তুগুলোকেও আমি বধ করছি না। আমি শুধু আমার নিজের, একান্ত নিজের মাংস খাচ্ছি। আর কোন খাদ্য কি এতটা নির্দোষ হতে পারে?

ফ্রাইং প্যানের তেলটা চিড়বিড়িয়ে উঠল। কাঁপা হাতে সে একটা বড় মাংসখন্ডকে খামচে ধরে দ্বিধাগ্রস্তের মত ছুঁড়ে দিল ফ্রাইং প্যানে। চর্বি ভাজার রসাল গন্ধে ভরে যাচ্ছিল ঘরের বাতাস। কাঁপতে কাঁপতে লোকটা হুইল চেয়ারের হাতলদুটোকে এতজোরে চেপে ধরল যে ঐগুলো প্রায় ভেঙ্গেই যাচ্ছিল।

বেশ। আমি একটা শুয়োর। অথবা, সমস্ত মানুষই শুয়োরের থেকেও বেশী কদর্য, জঘন্য। আমার ভেতরে একটা অংশ আছে যেটা শুয়োরের থেকেও হীন, আর অন্য অংশটি "মহান"; আর এই মহান অংশটা অসম্ভব লজ্জিত ও রেগে আছে ঐ শূয়োরের থেকেও ঘৃণ্য অংশের জন্য। তাই আজ এই মহান অংশটা ওই পশুর চেয়েও অধম অংশটাকে খেয়ে ফেলবে। এতে ভয়টা কোথায়?

মুচমুচে লালচে করে ভাজা মাংসটা প্লেটের উপরে রাখা আছে। মানুষটা তার উপরে কাসুন্দী ঢালল, একটু লেবুর রস চিপে নিল আর সামান্য মাখন, একটু গ্রেভী তুলে নিল পাত্রে। খাওয়া শুরু করার আগে তার কাঁটাচামচ আর ছুরি ধরা হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে প্লেটের গায়ে ধাক্কা লেগে অনবরত ঝন ঝন আওয়াজ তুলতে লাগল। ঘামে ভিজে গিয়ে, সে ছুরিটাকে সর্বশক্তি দিয়ে মুঠো করে ধরল, গায়ের জোরে কাটতে থাকল মাংসের টুকরোটা, কাঁটা চামচটা ঠেলে ঢোকাল টুকরোটায় আর অসম্ভব আতঙ্কের সাথে মুখের ভেতরে ঢোকাল মাংসখন্ডটাকে।

তৃতীয় দিনে, সে বাম পা-টাকে কাটল। ঠিক আগের বারের মতই, চর্বি মাংস হাড় এবং অন্য সবকিছু। খন্ডগুলোকে লোহার কাঠিতে বিঁধিয়ে ভালো করে ঘি মাখিয়ে বড় চুল্লীটায় সে তন্দুরী বানানোর জন্য ঢোকাল। এবার আর তার কোন ভয় নেই। সে যে এত অদ্ভুতরকমের সুস্বাদু, তা তার জানাই ছিল না। এই আবিষ্কারটার সাথে সাথে একটা অন্যরকমের রাগ আর পাগলামি তার মনের মধ্যে শিকড় গেঁড়ে বসে গেছে।

এক সপ্তাহ পরে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে গেল। এবার তাকে দেহের নিম্নাংশকে কেটে বাদ দিতে হবে।

হুইলচেয়ারে লাগানো টয়লেটে, সে জীবনের শেষবারের মত সশরীরে মলত্যাগের পুলক অনুভব করল। বিষ্ঠা ত্যাগের সাথে সাথে সে হো হো করে হেসে উঠল।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কি অবস্থা! আমি কি হাগছি, নিজেকেই। আমার পেটের মধ্যে আমারই অংশ হজম হয়ে আমার নিষ্ঠীবন হয়ে বেরোচ্ছে!

এটাই সম্ভবত নিজেকে অবমাননার চূড়ান্ত রূপ – অথবা এটাই হয়তো আত্মশ্লাঘার সর্বোৎকৃষ্ট পথ?

তবে গ্লুটাস মাক্সিমাসের অংশটাই সবথেকে বেশী সুস্বাদু ছিল।

কোমরের তলা থেকে কিছুই আর নেই। যান্ত্রিক পাদুটোর কাজও শেষ, সে সেইসময়ের জন্যে ওইদুটোকে সরিয়ে রাখল। এবার দেহের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পালা। অটোমেটিক অপারেশন মেশিনের যান্ত্রিক মস্তিষ্কের সাথে মানুষটা পরামর্শ করতে বসল। "আমি যদি আমার পাকস্থলী খেয়ে ফেলি, তারপরেও কি আমার খিদে হবে?"

উত্তর এল, "প্রায় আগের মতই হবে।"

সে বৃহদন্ত্রটা ফেলে দিল, আর ক্ষুদ্রান্ত্রটিকে শাকসব্জীর সাথে স্টু বানাবে বলে সেদ্ধ করতে দিল এবং পাকস্থলীর ঠিক নিচের অংশ ডিওডেনামটিকে সসেজ বানাবে বলে সরিয়ে রাখল। কিডনি আর যকৃৎটাকে কৃত্রিম প্রত্যঙ্গের দ্বারা প্রতিস্থাপন করল, তারপর সে আসল অঙ্গগুলোকে ভালো করে ভেজে খেয়ে নিল। অন্যান্য অঙ্গগুলো খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে পাকস্থলীটা সরিয়ে একটা প্লাস্টিকের পাত্রে পুষ্টিকর অম্লতরল দিয়ে জারিয়ে রাখল।

তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে সে হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসটা প্রতিস্থাপন করল। শেষমেশ মানুষটা নিজের ধক ধক করা হৃদয়টা খেল, পাতলা পাতলা করে কেটে, ভেজে; এই কাজটা অ্যাজটেকদের সেই ভয়ংকর হৃৎপিন্ড বলিদান নীতি প্রচলনকারী পুরোহিতদেরও চিন্তার বাইরে।

এরমধ্যেই সে তার নিজের পাকস্থলীটাকে একদিন রান্না করল। সোয়া সসে চুবিয়ে, রসুন আর লাল লঙ্কা দিয়ে একটা চাইনীজ প্রিপারেশন- সে এখন ভালোই বুঝতে পারছে মানুষ দিব্যি খেয়ে যেতে পারে যখন খাদ্যের কোন চাহিদা থাকে না তখনও।

মানুষ যে এত অসংখ্য ও নানা ধরনের রান্নার প্রণালী আবিষ্কার করেছে; তারমধ্যে কতগুলো সত্যিকারের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তৈরি হয়েছে, আর কতগুলো শুধু আরও কি কি স্বাদের খাবার বানানো যায় সেই কৌতুহলের ফলাফল হিসাবে, তাতে ঘোর সন্দেহ আছে। এমনকি যখন সমস্ত কৌতুহল মিটে যায় তখন মানুষ তার সবথেকে কল্পনাতীত জিনিসগুলো খেতে শুরু করে, অন্ততঃ যতক্ষণ রাগ থাকে। প্রচন্ড রাগের মাথায় নিজের স্বজাতির মাংস ছিঁড়ে খাওয়া, অনেকটা কাঁচের গ্লাস কড়মড় করে চিবানোর মত।

একটা খিদে সবসময় ঘুমিয়ে থাকে এক বর্বর আগ্রাসন তাড়নার অন্তরে; শিকার করা আর খাওয়া, ছেঁড়া আর চিবানো, গেলা আর চুষে নেওয়া – এটাই হচ্ছে পৈশাচিক খিদের আসল রূপ।

এখন, কণ্ঠনালীর শেষ অংশটা শুধু একটা ডিসপোজেবল টিউবের সাথে জোড়া। বাঁচিয়ে রাখা জন্য বাকি থাকা দেহকোষগুলিকে সরাসরি রক্তে চুবিয়ে রাখা হয়েছে একটা পুষ্টিকর তরল ভর্তি পাত্রের মধ্যে, আর কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির দ্বারা অন্তঃস্রাবী ক্রিয়াটা চলছে।

মাসের শেষের দিকে, হাতদুটোও খাওয়া হয়ে গেছে, শুধু পড়ে আছে গলা থেকে উপরের অংশটা।

চল্লিশতম দিন, মুখের সমস্ত পেশীগুলো খেয়ে শেষ করেছে মানুষটা; বাকি রেখেছে শুধু ঠোঁট দুটো। একগাদা যান্ত্রিক স্প্রিং পেশীর সাহায্যে চিবানোর কাজটা সম্পাদন করছে তারা। শুধুমাত্র একটা চোখ বেঁচে আছে। অন্যটাকে চুষে চিবিয়ে খাওয়া হয়ে গেছে।

কি বসে আছে ওখানে ওটা? একগাদা পাইপ আর টিউবের গোলকধাঁধার স্তুপের উপরে আরূঢ় একটা মুখসর্বস্ব খুলি, আর ওই খুলির মধ্যে টিকে রয়েছে একটা জ্যান্ত মস্তিষ্ক।

না...

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এবার অপারেশন মেশিনের একটা যান্ত্রিক হাত এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে করোটীর ছালটা ছাড়াতে লাগল, একটা ছোট্ট করাত বেরিয়ে এল হাতটা থেকে, সেটার সাহায্য করোটিটা পরিষ্কারভাবে কাটা হল।

কেটে ফেলা করোটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা শিরঃস্থিত মজ্জাটা স্পন্দিত হচ্ছে। তার উপরে নুন, লঙ্কা আর লেবুর রস ছড়াতে ছড়াতে, খুলির ভিতরের মজ্জাটা ভাবল - আমার মস্তিষ্ক, আমি কিভাবে এমন একটা জিনিস খেতে পারি? একটা মানুষ কিভাবে তার নিজের মাথার ঘুলির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে?

একটা চামচে ধূসরবর্নের ঘিলুর মধ্যে ডুবল। ব্যাথা নেই – কোন অনুভুতিই নেই করোটিতে। যান্ত্রিক হাতটা ইতিমধ্যে ঘিলুর মধ্যে থেকে এক চামচ ছাইরঙা নরম মন্ড তুলে এনেছে, মুখের সামনে। আর জিহ্বা সেটাকে লেহন করে গিলতে শুরু করল, "স্বাদ" আর বোঝা গেল না।

"খুন"!!!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাছির মত ছেঁকে ধরা রিপোর্টারগুলোর উদ্দেশ্যে শব্দটা ছুঁড়ে দিলেন ইনস্পেক্টর। "সঠিকভাবে বলতে গেলে, এটা এক নজিরবিহীন রকমের নৃশংস আর পাশবিক একটা খুন। খুব সম্ভবত খুনী এক বদ্ধ উন্মাদ ডাক্তার। হত্যার রকম দেখে মনে হচ্ছে একটা বিকৃত গবেষণা। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে টুকরো টুকরো করে কেটে বের করে এনে, সেখানে কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন করেছে..."

ইনস্পেক্টর প্রেসের লোকদের বিদায় করে আবার ঘরটায় এসে ঢুকলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন, এবার তাঁর নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে।

চুল্লীর সামনে থেকে গোয়েন্দা এগিয়ে এলেন ইন্সপেক্টরের কাছে, তার চোখে প্রশ্ন। "টেপগুলো পোড়ানো হয়ে গেছে।" গোয়েন্দা মন্তব্য করলেন, "কিন্তু... আপনি এটাকে খুন বললেন কেন?"

"শান্তি আর শৃঙ্খলা বজার রাখার জন্য", ইন্সপেক্টার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "খুন বলেই ঘোষণা করে দাও – একটা অফিসিয়াল তদন্ত শুরু কর – আর যাহোক একটা হাবিজাবি লিখে দিয়ে কেসফাইল বন্ধ করে ফেল। যদি সমস্ত ঘটনাকে একসাথে করা হয় – তাহলে এই কেসটা কোনো যুক্তির ধার ধারে না। তোমার কোনো অধিকার নেই, সাধারণ তথাকথিত ভদ্রমানুষদের এরকম একটা চরম উন্মাদের অন্তঃকরণে উঁকি দেওয়াতে। এরকম আত্মবিধ্বংসী চিন্তা হয়ত অনেকেরই মনের গহ্বরে লুকিয়ে আছে। আমরা যদি অসাবধানতা বশতঃ মানুষদের দেখিয়ে ফেলি তাদের মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা নরখাদক পশুটার ঝলক – তাহলে, তুমি নিশ্চিত থাক কেউ না কেউ, কখনো না কখনো এই লোকটার উদাহরণ ঠিক অনুসরন করবে। আর এই ধরনের লোক – তারা যে কি করতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না..."

"সাধারণ মানুষ যদি হঠাৎ করে এরকম একটা ঘটনার কথা জানতে পারে, তাহলে মানুষের নিজের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে যাবে – তারা নিজেদের ভেতরের অন্ধকার দিকটা ছিঁড়ে ফুড়ে দেখতে চাইবে। তারপর সেই অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়ে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।"

"মানুষ মানুষকে খুন করছে, ছিঁড়ে খাচ্ছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ধ্বংস করছে - এসব উপসর্গরা ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে। এই একজন জ্বলন্ত ডিনামাইট খেয়ে আত্মহত্যা করল – কেউ নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল – আর একজন দিনেরবেলা শহরের মাঝখানে রাস্তা ভরা লোকের সামনে ধর্ষণ করতে শুরু করল একটা মেয়েকে!!! যখন আর হাতে কোন কারণ থাকে না আক্রমণ করার, তখন খাঁচায় বন্দী পশুর মত সে নিজেকেই নিজে ছিঁড়ে খায়।"

"আঁআঁআঁআঁ"

তীব্র আর্তনাদ করে, তরুণ গোয়েন্দাটি চেঁচিয়ে ছিটকে সরে এল পচা মুন্ডুটার কাছ থেকে। নাড়িভুঁড়ি ওলটানো গন্ধওলা চামচটা সে সবে ঠোঁটদুটো থেকে সরানো চেষ্টা করছিল, খুলিটা হঠাৎ তার হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, খুবলে নিয়েছে একটু মাংস।

"সাবধান।" ইনস্পেক্টর চেঁচিয়ে উঠলেন। "সমস্ত জীবের মূল ভিত্তিই হল এই প্রচন্ড আগ্রাসী নিষ্ঠুর পৈশাচিক খিদে..."

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

খুলিটার ঘিলু বেরিয়ে এসেছে, একমাত্র চোখটা কোটর থেকে ঝুলছে আর মাংসপেশীর বদলে বসানো শক্ত স্প্রিংগুলো এবার ধীরে ধীরে কোঁচকাতে শুরু করল আর সদ্য ছিঁড়ে নেওয়া মাংসের টুকরোটা চিবোতে শুরু করল পচে যাওয়া জিভ আর কঠিন দাঁতে।

লেখক পরিচিতিঃ সাকিয়ো কোমাৎসু – (১৯৩১ – ২০১১)

জাপানের অন্যতম বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান গল্পকার। ভদ্রলোক জাপানের ওসাকাতে জন্মগ্রহন করেন, এবং কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতালিয়ান সাহিত্যে স্নাতক হন। তাঁর লেখালেখি মূলত শুরু হয় ১৯৬০ এর দশক থেকে কোবো আবে- এর রচনা এবং ইতালিয়ান সাহিত্য পড়াশোনা করে। ক্রমশ কোমাৎসুর ধারণা জন্মায়, যে আধুনিক সাহিত্য এবং কল্পবিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। কোমাৎসু সারা জীবন লিখেছেন প্রচুর, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে জাপানের ওপর পারমাণবিক আক্রমণের অভিশাপ। তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না, ঐ ধ্বংসের পরে লুটিয়ে পড়া জাপান যে একসময় উন্নতির মহাশিখরে উঠবে তাই নিয়ে তিনি লিখে গেছেন তাঁর কল্পবিজ্ঞান। জীবনে বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন, তার মধ্যে ১৯৮৫ সালে Nihon SF Taisho Award তাছাড়া ২০০৭ সালে ইয়োকোহমাতে অনুষ্ঠিত ৬৫ তম বিশ্ব কল্পবিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি জাপানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১১ সালে, আশি বছর বয়সে, নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

ইংরেজি অনুবাদ - **জুডিথ মেরিল**

বাংলা অনুবাদ – **অঙ্কিতা**

অলঙ্করণ: সুমন দাস ও দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কল্পবিজ্ঞানের গল্প:

দীর্ঘ দুমাস নিস্তরঙ্গ ভাবে ভেসে আসা বিষ্ণুবাহন-৫ মহাকাশযানটা অবশেষে একটা মৃদুস্পন্দন তুলে হঠাৎ যেন জেগে উঠল। যানের যাত্রী পাঁচজন কিন্তু ইতিমধ্যেই উত্তেজনায় সজাগ। ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযানের শরিক এই পাঁচজন। ক্রমশ মহাকাশযানের গতিবেগ কমে এল আর মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তার গতিপথ সংশোধন করে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। তাদের গন্তব্য পৃথিবী থেকে পনেরো কোটি মাইল দূর দিয়ে সূর্যের দিকে ধেয়ে আসা নতুন আবিষ্কৃত ধূমকেতু রুদ্রাণী। ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণাসংস্থার লাদাখে অবস্থিত গামা-রে টেলিস্কোপে রুদ্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা ধূমকেতুদের অস্তিত্ব হঠাৎ ধরা পড়া কোন বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু এই ধূমকেতুটা আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। রুদ্রাণীর থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছনো বিকিরণের বিশ্লেষণ করে চমকে উঠেছিল সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহল। জানা গিয়েছিল যে রুদ্রাণীর শরীরের উপাদান মানুষের বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ন অজানা। স্পেক্ট্রাল অ্যানালিসিস বলেছিল কম করে দশ রকমের মৌল ও তাদের বিভিন্ন যৌগিক উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে এই ধূমকেতুতে। কিন্তু সেই মৌলগুলো সম্পূর্ন অজানা ধরনের। পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থিত স্পেস ষ্টেশনের যন্ত্র বলেছিল এই মৌলগুলির অনেকগুলোই তেজস্ক্রিয় আর তাদের থেকে যেসব কণার বিকিরণ হয়ে চলেছে, তার অনেকগুলোর অস্তিত্বই মানুষ আজ পর্যন্ত শুধু অনুমানই করে এসেছে; আর এর মধ্যে কিছু কিছু কণার অস্তিত্ব তো একেবারেই মানুষের বিজ্ঞানের ধারনার বাইরে।

পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে গেল। যে করেই হোক ওই ধূমকেতুর কাছে পৌঁছে তার উপাদানের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা একান্তই প্রয়োজন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র আর একধাপ এগিয়ে ভাবল। শুধু বিশ্লেষণ নয়। তারা আজ বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। বিভিন্ন মিত্র দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা পরিকল্পনা করল এক অসাধ্য সাধনের। মহাকাশযান পাঠিয়ে সংগ্রহ করে আনতে হবে রুদ্রাণীর একটা খণ্ড। কে বলতে পারে কি অজানা মহারহস্য লুকিয়ে রয়েছে ওই বিভিন্ন নতুন মৌলের মধ্যে থেকে বিকিরিত কণাগুলির উৎপত্তির আড়ালে? সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার বাস্তবরূপ হল বিষ্ণুবাহন-৫।

আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। বিষ্ণুবাহনের পাঁচজন যাত্রীরই দৃষ্টি এখন কন্ট্রোলরুম-এর ভিউয়ারপ্যানেল-এ। যানের যন্ত্র-মগজ বলছে রুদ্রাণীর থেকে তাদের দূরত্ব আর মাত্র তিনলক্ষ মাইল।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

- "কন্ট্রোল-থ্রাস্টার গুলো ট্রিগার হল"।

অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন এই অভিযাত্রী দলের কমান্ডার ত্রিদেব চান্দেল। দলের বাকি চারজন সদস্য হল কমলিকা রায়, অভিজিৎ মালিক, সাগর দ্বিবেদী ও ঋক গুহ। এদের মধ্যে কমলিকা ও ঋক বায়ুসেনার দক্ষ পাইলট যাদের বিশেষ পদ্ধতিতে বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এই অভিযানের জন্য। অভিজিৎ ও সাগর পদার্থবিজ্ঞানী।

অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে। এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিযান শুরুর আগে ছ'মাসের প্রশিক্ষণ পর্বে প্রত্যেকে নিজের নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সবই স্বয়ংক্রিয়। বিষ্ণুবাহনের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রথমে যানটিকে রুদ্রাণীর থেকে দশমাইল দূরত্বে নিয়ে যানের গতিপথকে রুদ্রাণীর গতিপথের সমান্তরাল ও যানের গতিবেগকে তার গতিবেগের সমান করবে; যাতে বিষ্ণুবাহন ও রুদ্রাণীর মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ এর মান শূন্য হয়ে দাঁড়ায়। তারপরের পর্যায়ে অভিজিৎ ও সাগর কিছু বিশেষ অত্যুন্নত যন্ত্রের সাহায্যে রুদ্রাণীকে বিভিন্ন রকম ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। এই পর্যবেক্ষণ শেষ হলে শুরু হবে এই অভিযানের সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক পর্যায়। বিষ্ণুবাহন থেকে নির্গত একটি ছোট সংগ্রাহক যান পৌঁছে যাবে রুদ্রাণীর একদম কাছে। রুদ্রাণীর পৃষ্ঠদেশে একটা উপযুক্ত অংশকে আঁকড়ে ধরবে সেই যানের একটি রোবটিক আঁকশি। আর অন্য একটি রোবটিক বাহু উচ্চশক্তিসম্পন্ন লেসার এর সাহায্যে ড্রিল করে রুদ্রাণীর শরীর থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করবে সেই আঁকড়ে ধরা অংশ। এইভাবে সংগ্রহ করা হবে মানুষের বিজ্ঞানের পরবর্তী শিখরজয়ের পথের হদিশ। কোন কারণে একটি সংগ্রাহক যান বিফল হলে অন্যটা পাঠানো হবে এই পরিকল্পনা করে বিষ্ণুবাহনে মোট দুটি সংগ্রাহক যানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২

আজ রাতে আবার জ্বর এসেছিল সুমিত্রার। এখন ছেড়েছে মনে হচ্ছে। শান্ত হয়ে ঘুমচ্ছে ও। এই নিয়ে আজ দশদিন হয়ে গেল। কিন্তু পার্থর মন এখনো বিশ্বাস করতে চায় না। তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে তার ও সুমিত্রার। এখনো বিয়ের লাল চেলী আর পাটবস্ত্র গিঁটমারা অবস্থায় আলমারির ওপরের তাক থেকে পর্যায়ক্রমে বিতাড়িত হতে হতে নিচের তাকের কোনায় পৌঁছে উঠতে পারেনি। বিয়ের পরের দিন সকালে পার্থর মা সুমিত্রাকে বলেছিলেন

- "ওই চেলী আর পাটবস্ত্র খুব যত্ন করে রাখবে। তোমরা তো বিদেশে গিয়ে ঘর বাঁধবে। কিন্তু এটা সঙ্গে করে নিয়ে যেও। ওখানে যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দিও। অন্তত কোল যতদিন না ভরে ততদিন।"

সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফেলেছিল পার্থ। সুমিত্রা যথেষ্ট আধুনিক মেয়ে। তবু যেন পার্থর মনে হয়েছিল একঘর লোকের সামনে শাশুড়ীর সেই প্রগলভতায় সুমিত্রার মুখে একটা রক্তিম আভা ফুটে উঠেছিল। পরে ও যদিও তা স্বীকার করেনি। বলেছিল আগের রাতে মেকআপ ঠিকমত তোলা হয়নি। সেটাই নাকি পার্থ দেখেছে। আজ জ্বরে আচ্ছন্ন সুমিত্রার পাশে বসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পার্থ মনেমনে সেই রক্তাভ ছায়াটাই খুঁজে চলেছে। সেডেটিভের প্রভাবে একটা পরিযায়ী ঘুম ওর আধবোজা দুচোখে বাসা বেঁধেছে কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু কাগজের মত বিবর্ণ চোখের পাতা আর গালের মধ্যে শুকিয়ে থাকা দুফোঁটা অশ্রু পার্থকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আজ মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট জানিয়েছে যে ওর শরীরে বাসা বাঁধা ক্যান্সারের প্রতিকারে যে কেমোথেরাপি আজ একমাস ধরে চলছে তার প্রভাবে ওর ক্যান্সার এর গতি এখনও রুদ্ধ হয়নি। উলটে তা ছড়িয়ে পড়েছে ওর জরায়ুতে। চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা সুস্থ হয়ে উঠলেও তার পক্ষে সন্তানধারণ হয়ত আর কোনদিনই সম্ভব হবে না।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

পার্থর চোখে কখন ঘুম এসেছিল তা সে টের পায়নি। হঠাৎ ভোররাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেয়াল ঘড়ির কাঁটা বলছে রাত প্রায় তিনটে বাজে। প্রথম রাতে বৃষ্টি পড়ছিল ।এখন বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশে চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে। আজ কোন তিথি পার্থ জানত না। তবে আকাশে নিখুঁত গোল চাঁদই জানিয়ে দিচ্ছে যে আজ পূর্নিমা। অন্ধকার ঘরে কাঁচের জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো দেখতে দেখতে কিরকম একটা ঘোর লেগে গেছিল পার্থর। সে ঘোর ভাঙল সুমিত্রার গলার স্বরে।

- "বাইরে চাঁদ উঠেছে তাই না?"

- "হ্যাঁ সুমি।"

- "জানালাটা খুলে দাও না একটু ভালো করে চাঁদ দেখি।"

বৃষ্টির জন্য জানালা বন্ধ ছিল এতক্ষণ। এখন ঘরটা বেশ গুমোট লাগছে। পার্থ তাই জানালা খুলে দিল। জানালা খুলতেই একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকে সুমির ইন্দ্রিয়গুলোকে যেন আর একটু জাগিয়ে তুলল।

- "আজ পূর্নিমা তাই না?"

- "হ্যাঁ সুমি।"

সুমির মুখের দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলোতেও পার্থ দেখতে পেল তার দুগাল বেয়ে দুফোঁটা জলের ধারা নেমে এসেছে। পার্থ এগিয়ে গিয়ে সেই জলের ধারা আলতো হাতে মুছিয়ে দিয়ে বলল

- "সুমি ভরসা রাখো। এখনও তোমার কেমোর অর্ধেকও হয়নি। আজ সবে প্রথম রিপোর্ট। আর পনেরো দিন বাদে পরের ডোজ পরবে আর সেদিন আবার টেস্ট হবে। তুমি দেখো সেদিনের মধ্যে তুমি অনেকটা সেরে উঠবে।"

- "আজ পূর্নিমা।" অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে সুমিত্রা। এতক্ষণ পার্থর বলা কথা গুলো যেন সে শুনতেই পায়নি।

- "হ্যাঁ সুমি। চারদিকে চাঁদের আলোর বন্যা। প্রকৃতি আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে।"

- "না পার্থ তুমি বুঝতে পারছ না। আজ থেকেই তো চাঁদের ক্ষয় শুরু। আর পনেরো দিনে সে একেবারে হারিয়ে যাবে। আর হয়ত আমিও! প্রকৃতিও বোঝে। প্রাণের উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির প্রবাহকে বজায় রাখা। যে প্রাণ তা পারেনা তার কি মূল্য প্রকৃতির কাছে? তাই সে জানান দিয়ে যাচ্ছে। এই শেষের শুরু; চাঁদের সাথে আমারও।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে সুমিত্রার চোখ বেয়ে। পার্থ বুঝে উঠতে পারে না কি জবাব দেবে। আজকের রিপোর্ট আসার আগে অবধি সুমিত্রা বেশ শক্তইছিল। দুজনে স্থির করে নিয়েছিল যে যাইহোক, এই প্রাণঘাতী রোগের সাথে দুজনে একসাথে শেষ অবধি লড়ে যাবে। কিন্তু আজকে যখন টেস্টরিপোর্ট বলেদিল যে আর যাইহোক, সুমিত্রার পক্ষে সন্তানধারণ করা আর সম্ভব নয়, তখনই মনে হয় সুমিত্রা মনেমনে এই যুদ্ধে অস্ত্রসমর্পণ করে ফেলেছে।

পার্থ আর কিছু বলতে পারে না। নিঃশব্দে সুমিত্রার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে ও টের পেল যে ওর জ্বর আবার বেড়েছে।

৩

শেষ বাহাত্তর ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাসে কেটেছে বিষ্ণুবাহনের পাঁচমহাকাশচারীর। মানুষের বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জকে হেলায় হারিয়েছে বিষ্ণুবাহনের অভিযাত্রীরা। ঠিক বাহাত্তর ঘণ্টা আগে মহাকাশযান স্থাপিত হয়েছে রুদ্রাণীর সমান্তরাল গতিপথে। যানের কম্পিউটারের হিসেবে রুদ্রাণীর সাথে বিষ্ণুবাহনের দূরত্ব এখন ঠিক নিরানব্বই মাইল। কন্ট্রোলরুমের ভিউয়ার প্যানেলের প্রায় সবটা জুড়েই এখন ফুটে উঠেছে রুদ্রাণীর ছবি। সেই প্যানেলের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন ত্রিদেব।

সার্থক নামকরণ হয়েছে রুদ্রাণীর। যদিও এই নামকরণ আসলে চিরন্তন প্রথা মেনে এর প্রথম পর্যবেক্ষক লাদাখে কর্মরতা একজন জুনিয়র জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামে। কিন্তু নামের সঙ্গে চেহারার মিলের এরকম অদ্ভুত সমাপতন তার আশাতীত ছিল। রুদ্রাণীর গড় ব্যাস প্রায় সাড়ে সাত মাইল। সূর্যের অভিকর্ষের ও তাপের প্রভাবে অন্য ধূমকেতুর মত একটা হাল্কা ল্যাজের আভাস দেখা দিয়েছে বটে তবে বিশ্লেষণ বলছে যে রুদ্রাণীর উপাদান প্রায় পাথরের মতই শক্ত। জমাট বাঁধা গ্যাসের অংশ কম। কাজেই খুব একটা বড়ল্যাজের বিস্তার রুদ্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যাবে না। কিন্তু ওর আসল বৈশিষ্ট্য হল ওর রঙে ও আলোয়। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উজ্জ্বল লাল রঙের একটা নিজস্ব আলো রয়েছে রুদ্রাণীর। অথচ যন্ত্র বলছে যে ওর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস একশ সাতাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ কোন আগ্নেয় বা আণবিক বিক্রিয়া এই আলোর উৎস নয়। অর্থাৎ এই লাল আলো রুদ্রাণীর একগুচ্ছ অজানা উপাদানের কোন একটার থেকে বিকিরিত হচ্ছে। যেমন রেডিয়াম-এর থেকে হয়ে থাকে। রুদ্রাণীর এরকম রূপ অভিযাত্রীদের কাছে একদমই অপ্রত্যাশিত ছিল। ত্রিদেব বৈজ্ঞানিক নন, সেনাবাহিনীর লোক। তাই এই রূপের বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন রুদ্রাণীর প্রথম নিকটদর্শন-এর মুহূর্ত থেকেই। এইমুহূর্তে তার কিছু করনীয় নেই। আপাতত অভিযানের প্রধান কাজ দুই বিজ্ঞানী অভিজিৎ ও সাগরের। দ্রুত হাতে রুটিন মেনে সব যন্ত্র চালু করা, যন্ত্রের সংগৃহীত তথ্য সুপার কম্পিউটারে ভরে তার তাৎক্ষনিক বিশ্লেষণ, সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য পৃথিবীর পর্যবেক্ষন কেন্দ্রে পাঠানো – এসবই তারা করে চলেছে দ্রুত ও অভ্যস্ত দক্ষতার সাথে। এখন এই কাজগুলো শেষ পর্যায়ে। শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে সেই দুরূহ অন্তিম পর্যায়। কমলিকা ও ঋক-কে প্রায় বারো ঘণ্টা আগেই রিজুভিনেশন চেম্বারে পাঠিয়ে দিয়েছেন ত্রিদেব। এই শেষপর্যায়ের প্রস্তুতির জন্য শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন এই দুজনের। আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। ইতিমধ্যে তিনি নিজে ছোট যান দুটির সিস্টেম চেক সেরে এসেছেন। সবই এখনও পর্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক চলছে তেল খাওয়া নতুন মেশিনের চালে।

রিজুভিনেশন চেম্বারে নিজের বাঙ্কে শুয়ে কমলিকা কানে হেডফোন লাগিয়ে হালকা ধরনের একটা গান চালিয়ে শুনছিল। যদিও কমান্ডার তাকে আর ঋককে বিশ্রামে পাঠানোর সময়ে বলে দিয়েছিলেন যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে ও তরল কিছু খাবার খেয়ে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে, কিন্তু এই অবস্থায় ঘুমনোর চেষ্টা বৃথা। যদিও যান্ত্রিক উপায়ে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা এই যানে রয়েছে। কিন্তু কমলিকার মন চাইল না। সে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অত সহজে শারীরিক বা মানসিক কোন রকম ক্লান্তিই তাকে আচ্ছন্ন করে না। উল্টো দিকের বাঙ্কে ঋক কিন্তু অকাতরে ঘুমচ্ছে। কিন্তু কমলিকার মন জুড়ে শুধুই অভিযানের আসন্ন পর্যায়ের প্রতিটি পদক্ষেপের ছবি ফুটে উঠছে। সাথে একটা চিন্তার কাঁটা তাকে দুচোখের পাতা এক করতে দিচ্ছে না।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হঠাৎ কমলিকা দেখল পাশের বাঙ্কে ঋক নড়েচড়ে উঠে বসল। ঘুম ভেঙ্গেছে তার।

-"নাহ, ঘুমটা একটু বেশী হয়ে গেল। মাথাটা একটু হাল্কা করা দরকার। একটু কফি চলবে নাকি ক্যাপ্টেন কমলি?"

একসাথে একবছর প্রশিক্ষণ নেওয়া আর এতদিন একসাথে যাত্রা করার ফলে ঋকের সাথে কমলিকার স্বাভাবিক ভাবেই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আর তারা দুজন প্রায় সমবয়সীও; কাজেই ঋক তার নামটা ছোট করে নিয়ে তাকে কমলি বলেই সম্বোধন করে। কমলিকা কোন কথা না বলে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালো। ঋক লঘুপায়ে প্রভিশন চেম্বারের দিকে চলে গেল কফি আনতে।

ঋক চলে যেতেই কমলিকার মনে আবার সেই চিন্তাটা ফিরে এল। সারা জীবন সে সবক্ষেত্রে বরাবর প্রথম হয়ে এসেছে। কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রতিযোগী তার সামনে টিঁকতে পারেনি কোনদিন। অথচ আজ এই কয়েকঘণ্টা পরে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশনে সে নামতে চলেছে আর এখানেই কিনা .....।

ঋক ফিরছে কফি হাতে। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল কমলিকার। কফির একটা টেট্রাপাউচ কমলিকার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্যটাতে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিতে দিতে কমলিকাকে আড়চোখে লক্ষ্য করল ঋক। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে যানের ইন্টারকম-এ কমান্ডারের গলা ভেসে এল।

-"অফিসারস, তোমাদের মিশনের ব্রিফিংএর জন্য কন্ট্রোলরুমে রিপোর্ট কর।"

৪

"আমাদের জন্য পরিস্থিতিটা কঠিন হয়ে পড়ল মিস্টার রায়। কেমোতে রেসপন্স স্লো মানেই আপনারা আশা ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? এখনো ট্রিটমেন্ট এর বেশিরভাগ টাই বাকি রয়েছে। আর এখন মেডিক্যাল সায়েন্স অনেক উন্নত হয়েছে। কেমোতে রেসপন্স না পেলে স্টেমসেল থেরাপি রয়েছে। কিন্তু ইমিডিয়েট আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সুমিত্রার মানসিক অবস্থা। হঠাৎ ও কি করে একিউট ডিপ্রেশনে চলে গেল বুঝতে পারছি না। যাই হোক, সিডেটিভের ডোজ বাড়িয়ে দিয়েছি। এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই আমাদের। ওর কাউন্সেলিং দরকার আর সেটা আপনি করলেই বেটার। আপনার চেয়ে বেশি বিশ্বাস ও এইমূহুর্তে ..."

সুমিত্রার অঙ্কোলজিস্ট ডঃ মিত্র বলে চলেছে। পার্থ শুনছে, কিন্তু তার দৃষ্টি সুমিত্রার দিকে। সুমিত্রা এখন সিডেটিভের প্রভাবে অচেতন। ওর মুখ এই কদিনে আরও বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। চোখের তলায় কালচে ছোপ পড়েছে। সেইরাতে পূর্নিমার চাঁদ দেখার পর থেকেই ওর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে ওর প্রাণশক্তিও আকাশের চাঁদের মুছে যাওয়ার সাথে এক অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। শেষ কদিন ও রোজ রাতে পাগলের মত চাঁদ দেখার জন্য অপেক্ষা করেছে। আর প্রত্যেকবার চাঁদের ক্ষয় দেখতে দেখতে একমনে প্রলাপ বকে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও পার্থ ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে পারেনি।

পার্থকে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ডঃ মিত্র বিদায় নিলেন। উনি কয়েকদিন ধরেই সুমিত্রাকে হাসপাতালে শিফট করতে চাইছেন। কিন্তু সুমিত্রা সেটা বুঝতে পারার সাথে সাথে এমন রিএক্ট করেছিল যে শেষ পর্যন্ত সে ভাবনা বাতিল করতে উনি বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া সুমিত্রার

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

মানসিক অবস্থা যা তাতে এইমুহূর্তে পার্থর থেকে দূরে রাখলে ওর অবস্থার আরও অবনতি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

সন্ধে হয়ে এল। সুমিত্রা পার্থকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে যে রাতে চাঁদ উঠলে সে ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেনা। ওকে সে চাঁদ দেখতে দেবে। পার্থ প্রথমে ভেবেছিল এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে কিন্তু শেষপর্যন্ত তার মনে হয়েছে যে এই ব্যাপারটা যে ভুল আর সেটা সুমিত্রার কাছে প্রমাণ করতে হলে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। অমাবস্যার অন্ধকার রাতটা অব্ধি যদি সে সুমিত্রাকে সামলে নিতে পারে তাহলে তার ভুল আপনিই ভেঙ্গে যাবে। তখন সে নিশ্চয়ই আবার নতুন করে তার অসুখের সাথে লড়াই করবার মনোবল ফিরেপাবে। এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে রয়েছে পার্থ। আজ ত্রয়োদশী। আর মাত্র দুটোদিন সামলে নিতে হবে মনের জোর রেখে।

ক্রমে দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আকাশের কোনায় তারাগুলো একটা একটা করে মুখ দেখাতে শুরু করেছে। পার্থর চোখে পড়ল পূব আকাশে একটা হাল্কা বাঁকা আলোর রেখা দানা বাঁধছে। সে ধীরপায়ে এগিয়ে এসে সুমিত্রার মাথায় হাত রাখল। সুমিত্রার চোখ খোলা ও অভিব্যাক্তিহীন। সে কখন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তা পার্থ এতক্ষণ টেরও পায়নি। পার্থর হাতের স্পর্শ পেয়ে সুমিত্রা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার দূর্বল শরীর সহযোগিতা করল না। পার্থ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ওকে শান্ত হতে বলে সন্তর্পনে ওকে উঠিয়ে হুইল চেয়ারে বসিয়ে দিইয়ে হুইল চেয়ারটা ঠেলে বারান্দায় নিয়ে গেল।

আকাশে সেই ক্ষীণ চাঁদের আভা এখন বেশস্পষ্ট। সুমিত্রা বলে উঠল -

"আর কতদিন?"

"আর দুদিন সুমি। আর দুদিন গেলেই তুমি বুঝবে তোমার এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল।"

পার্থর কথাগুলো কোন প্রভাব ফেলল না সুমিত্রার মুখমণ্ডলে। এখন আর অবক্ষীয়মান চাঁদের অবয়ব তার মনে ভয় বা হতাশা জাগায় না। যা ঘটবেই তাকে আর ভয় কিসের। পার্থর অবস্থাও সে দেখছে। তার এই রোগ যে পার্থকেও পরোক্ষে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ওর শ্বাসরোধ করছে তাও সে দেখতে পারছে। আর মাত্র দুদিন। তারপরে তাদের দুজনেরই মুক্তি।

এই আশ্বাসে এখন সুমিত্রা নিশ্চিন্ত। পেছনে দাঁড়ানো পার্থ একটা হাত সুমিত্রার ডান কাঁধে রাখতে সুমিত্রা নিজের বাঁহাতটা তার ওপরে রাখল। পার্থ আবিষ্কার করল গত তেরো দিনে এই প্রথম, সুমিত্রার আজ জ্বর আসেনি।

৫

বিষ্ণুবাহন রওনা দিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর পথে। কমলিকার মন থেকে হতাশার মেঘও উধাও। মহাবিশ্ব তাকে গৌরবের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেনি। এই অভিযানের প্রথমদিন থেকেই সে মুখিয়েছিল যাতে রুদ্রাণীর দেহাংশ সংগ্রহ করবার গৌরব তারই হয়। কথা ছিল প্রথমে বিষ্ণুবাহনের কোন একটি সংগ্রাহকযান প্রথম প্রয়াস করবে। একমাত্র সেই প্রয়াস কোন কারণে বিফল হলেই দুনম্বর যান পাঠানো হবে। সেই প্রথম যানে কে থাকবে, কমলিকা না ঋক তার সিদ্ধান্ত কমান্ডারের। কমান্ডারের কাছে ইন্দ্রাণী আর ঋক দুজনেই এই অভিযানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু তিনি কোনভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। দক্ষতা, দীর্ঘ মহাকাশযাত্রার শারীরিক ও মানসিক ধকল

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সামলানোর পরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ভিত্তিতে তিনি কোনভাবেই দুজনের মধ্যে থেকে যোগ্যতর হিসেবে একজনকে বেছে নিতে পারেননি। অবশেষে দুজনকে রিজুভিনেশন চেম্বারে পাঠানোর আগে একটা র‍্যান্ডম লটারির মাধ্যমে ঋক এর নাম উঠে আসে যানের কম্পিউটারে।

এভাবে আশাভঙ্গ হওয়ায় কমলিকা যথেষ্ট মুষড়ে পরেছিল। তাই কমান্ডার ব্রিফিং এ ডাকার পরে কোনোরকমে নিজেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে কন্ট্রোলরুমে। ঋক এর যান যখন বিষ্ণুবাহন থেকে নির্গত হল, সেদিকে তাকাতে অবধি মন সায় দেয়নি তার। দেখতে দেখতে প্রথম যান পৌঁছে গিয়েছিল রুদ্রাণীর কাছে। একটি রোবটিক বাহুযান থেকে প্রসারিত হয়ে আঁকড়ে ধরেছিল তার কম্পিউটারের হিসেবমত পুর্বনির্ধারিত একটা অংশকে। কিন্তু তাতেই ঘটে গেল এক বিপত্তি। সেই বাহুর সাথে ঘর্ষনের ফলে রুদ্রাণীর শরীর থেকে কিছু ছোট ছোট খণ্ড ছিটকে বেরিয়ে এল। প্রায় একটা ফুটবলের আকারের আলগা পাথুরে খণ্ড এসে আঘাত করল ঋকের যানটির গায়ে। আঘাতের তীব্রতায় যানটির বিপদ সংকেত বেজে উঠল। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে বিষ্ণুবাহনের বাকি চারযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে যানটির সমস্ত সিস্টেমচেক চালিয়ে দিল। যানের বাকি সব ব্যবস্থাই ঠিক আছে। শুধু দ্বিতীয় রোবটিক বাহুতে অবস্থিত লেসারসিস্টেমে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কমলিকা বুঝতে পারল যে এবার দ্বিতীয় যান লঞ্চ করতেই হবে কমান্ডারকে। কিন্তু কমান্ডার বিচক্ষণ ব্যক্তি। উনি নির্দেশ দিলেন যে দ্বিতীয় যান রুদ্রাণীকে স্পর্শ করবে না। বোঝাই যাচ্ছে যে রুদ্রাণীর বাইরের আবরণ বেশ ভঙ্গুর পদার্থে তৈরি। আর তাছাড়া প্রথমযান এখনও সফলভাবে নির্দিষ্ট অংশ আঁকড়ে রয়েছে। কাজেই দ্বিতীয়যান কোনরকম ঝুঁকি নেবে না। তার কাজ হবে প্রথম যানের পাশে পৌঁছে শুধুমাত্র লেসারের সাহায্যে সেই আঁকড়ে ধরা অংশকে কেটে বার করা।

কমান্ডারের নির্দেশমত কমলিকা দ্বিতীয়যান নিয়ে বিষ্ণুবাহন থেকে নির্গত হয়েছিল। কাজটা যথেষ্ট কঠিন, বিশেষত প্রথম যানের সামনে পৌঁছে তাকে লেসার চালাতে চালাতে নিজের যানের গতি রুদ্রাণীর সমান রাখতে হবে যেটা আদৌ সহজ হবে না। একথা ভেবেই তার মনের হতাশার মেঘ কেটে গিয়েছিল। অসামান্য দক্ষতায় সে দ্বিতীয়যান নিয়ে প্রথম যানটির একদম পাশে পৌঁছে গিয়েছিল ও একজন দক্ষ শিল্পীর তুলিচালনার মত নিখুঁতভাবে লেসার চালিয়ে কেটে বের করে এনেছিল রুদ্রাণীর একটা বড়সর পাথরের চাঁই-এর মত অংশ।

বিষ্ণুবাহনের কম্পিউটার এখন আবার অভিযানের পরিচালনার ভার তুলে নিয়েছে। রুদ্রাণীর সংগৃহীত খণ্ডটা এখন বিষ্ণুবাহনের পেটের দিকে একটা শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে ঘেরা মোটা সীসার চাদরে তৈরি কক্ষে সুরক্ষিত রয়েছে। তার ওপর সবরকম প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবার বাকি পরীক্ষা নিরীক্ষা পৃথিবীর গবেষণাগারে হবে। অভিযানের সাফল্যে সকলেই বেশ খুশী।

"আমাদের অবস্থান এখন পৃথিবী থেকে চার লক্ষ মাইল দূরে। আমরা এখন চাঁদের কক্ষপথে। চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে তার মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে বিষ্ণুবাহনের গতি হ্রাস করা হয়ছে। এবার আমরা পৃথিবীর পথে রওনা দেব। সব ঠিক চললে আরো প্রায় দশ ঘণ্টা পরে বিষ্ণুবাহন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে।"

কমান্ডার ত্রিদেব ঘোষণা করলেন।

হঠাৎ যানের কন্ট্রোলপ্যানেলে একটা জোরোলো সংকেত বেজে উঠল। অভিজিৎ আর সাগর পালা করে রুদ্রাণীর সংগৃহীত অংশটার ওপর পর্যবেক্ষক যন্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য রাখছিল। সংকেতটা বেজেছে তাদের পর্যবেক্ষণ স্টেশনেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের সামনের প্যানেলে। বিষ্ণুবাহনের যন্ত্র-মস্তিষ্ক ইতিমধ্যে চরম বিপদসংকেত বাজিয়ে দিয়েছে। রুদ্রানীর খণ্ডিত অংশের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার থেকে নির্গত বিকিরনের হারও হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। সব লক্ষণ নির্দেশ করছে যে ধূমকেতুর অংশটিতে একটা আনবিক বিক্রিয়া

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

শুরু হয়েছে। যন্ত্রমস্তিষ্ক অবিলম্বে যান পরিত্যাগ করবার সংকেত দিয়ে দিল।

ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিক দিক পরিবর্তনে সবাই হকচকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অভিজিৎ প্রথম মুখ খুলল।

'ওই অজানা পাথরের খণ্ডে বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে। আর আমাদের হাতে মাত্র মিনিট কুড়ি সময় রয়েছে'।

'কিন্তু কিভাবে? ও কেন?' প্রশ্ন করে ঋক।

'তার উত্তর খোঁজার যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে নেই। এখুনি সবাই দু'দলে ভাগ হয়ে সংগ্রাহক যানগুলোতে ওঠ। ঋক আর আমিএকটা যানেও কমলিকা, অভিজিৎ আর সাগর অন্যটায়'।

তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ ভেসে এল কমান্ডারের কাছ থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষ্ণুবাহনের থেকে দুটো ছোট যান নির্গত হয়ে দুটি বিপরীত দিকে পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলল। প্রতিটামিনিট এখন মূল্যবান। বিষ্ণুবাহণ কিন্তু যন্ত্র-মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে কুড়ি মিনিট অতিক্রান্ত হল। কিন্তু এ কি! বিষ্ণুবাহন এখনো অক্ষত! বিস্ফোরণের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। নিরাপদ দূরত্বে থেকে আরো কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল সকলে। কিন্তু না, বিষ্ণুবাহণ নিজের নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলেছে। বিষ্ণুবাহনের থেকে ভেসে আসা যন্ত্র-মস্তিষ্কের তথ্য বলছে রুদ্রানীর পাথরের খণ্ডটার বিক্রিয়ার তীব্রতা অনেকটা কমে এসেছে। বিস্ফোরনের সম্ভবনা আর নেই। সকলেই হতবাক।

'আপাতত বিস্ফোরনের সম্ভবনা আর না থাকলেও এই পাথরটার এরকম আচরনের কারণ কি?' প্রশ্ন করল ঋক।

'কারণ আছে'। বলে ওঠে অভিজিৎ।

'আমি এই পাথরটার সীসার চেম্বারে গত চব্বিশ ঘন্টার পারিপার্শিকতার তারতম্যের তথ্য বিশ্লেষণ করেছি। অন্য সব কিছু স্থির থাকলেও একটা জিনিসের বিশাল তারতম্য ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। সেটা হল মাধ্যাকর্ষণ। চাঁদের কক্ষপথে ঢোকার আগে অবধি এই পাথরটার ওপর মাধ্যাকর্ষণ বল ছিল অত্যন্ত নগন্য। রুদ্রাণীর গতিপথের কাছাকাছি সেরকম বড় কোন মহাজাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব নেই নিশ্চই। আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করবার পরেও ওটা অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহের পাশ দিয়ে আসে নি আর ফলে এই ধুমকেতুর ওপর তাদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আমরা জানতে পারি নি। আমরা চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করার পর প্রথম এই পাথরটার ওপর শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়েছে। আর তাতেই এই বিপত্তি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু রয়েছে যা শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে আনবিক বিক্রিয়ার সূত্রপাত করে। এই জন্যেই আমাদের চেনা গ্রহ বা নক্ষত্রের মধ্যে এই মৌল গুলো অনুপস্থিত'।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সকলে অবাক হয়ে শুনছিল। এবার কমলিকার শঙ্কিত স্বর ভেসে আসে।

'কিন্তু তার মানে ত আমাদের সামনে আর এক প্রবল বিপদ। এই পাথরটা পৃথিবীর কাছাকাছি পৌছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে। আর সেটা যদি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে হয়? যদি মাটির যথেষ্ট কাছাকাছি পৌঁছে ঘটে বিস্ফোরণ?'

'একদম ঠিক ক্যাপ্টেন রায়। এই পাথরটাকে কোন অবস্থাতেই পৃথিবীতে পৌঁছতে দেওয়া চলবে না'।

৬

গভীর ঘুমের মধ্যে চোখে স্বপ্ন এলে অনেক সময় চোখের পাতা ঘুমের মধ্যেও সামান্য খুলে যায়। সেই অবস্থায় চোখের মণি দ্রুত সঞ্চালিত হয়ে স্বপ্নের পিছু পিছু ছুটে বেড়ায়। সুমিত্রা ঘুমোচ্ছে। তার চোখও আধবোজা। কিন্তু তার চোখের মণি পাথরের মত স্থির। পার্থ একমনে সুমিত্রার ঘুমন্ত চোখে সেই স্বপ্নচারণের আশ্বাস খুঁজে চলেছে।

আজ সকালেও ডঃ মিত্র এসেছিলেন। সুমিত্রার মানসিক অবস্থার কথা জানতে পেরে উনি আগামী কয়েকদিন রোজ একবার করে এসে ওকে দেখে যাবেন বলেছিলেন। জ্বর আসা বন্ধ হওয়াটা উনি ভালো লক্ষণ বলেই মনে করছেন। কিন্তু আপাতত সুমিত্রার মন থেকে জীবনবিমুখতাকে দূর করাটাই প্রধান লক্ষ্য।

সিডেটিভের প্রভাবে সুমিত্রা এখনো ঘুমে অচেতন। সন্ধ্যে প্রায় পার হয়ে এলো। আর কিছুক্ষণ বাদেই সুমিত্রাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে হবে পার্থকে। তবে আজ পার্থ আশাবাদী। আজ রাতে আকাশের চাঁদ অস্ত যাবে না। মাঝ আকাশেই একটু একটু করে পৃথিবীর ছায়ায় মুখ লুকিয়ে মুছে যাবে আবার নতুন আলোয় আত্মপ্রকাশ করতে। পার্থ আশায় বুক বেঁধেছে যে হয়ত সেই নতুন চাঁদের আলো সুমিত্রার মনে বদ্ধমূল এই নৈরাশ্যকেও মুছে ফেলবে।

এইসব ভাবনায় ক্ষনিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল পার্থ, আবার সুমিত্রার দিকে চাইতেই সচকিত হয়ে উঠল সে। সুমিত্রার চোখ খোলা আর তা সটান খোলা জানলার বাইরের আকাশের দিকে স্থির। কখন সে ঘুম থেকে জেগেছে পার্থ টেরও পায় নি। পার্থ গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখল ও আশ্বস্ত হল।

'আমাকে আজ একটু ব্যালকনীতে বসতে দেবে?' বলে ওঠে সুমিত্রা।

আজ পার্থ ঠিক করে রেখেছে যে সুমিত্রার সব ইচ্ছে পূরন করবে। আর আজ বাইরে বেশ ভাল আবহাওয়া। বাতাসে শীত বিদায়ে বসন্তের আভাষ। তাই সে রাজী হয়ে গেল। সুমিত্রাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে সেটা ঠেলে ব্যালকনিতে নিয়ে এলো আর নিজেও তার পাশে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। সুমিত্রার দৃষ্টি একটানা আকাশের দিকে। পার্থ যেন অস্তিত্ববিহীন; কারণ আকাশে সে সরু ধনুকের মত একটা শীর্ণকায়া চাঁদের দেখা পেয়ে গিয়েছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আজ খুব অল্প সময়ের জন্যই চাঁদ উঠেছে। আর ইতিমধ্যেই সেটা ম্লান হতে শুরু করেছে। আকাশের আবছা বাঁকা সাদা দাগটা আরো আবছা, আরো ছোট হয়ে আসছে। সুমিত্রার দৃষ্টি সেইদিকে স্থির। তার মনে দুঃখের চেয়ে স্বস্তি বেশি। কিছুক্ষনের মধ্যে আকাশের বুক থেকে সাদা আলোর শেষ দাগটুকুও মুছে গেল। সুমিত্রা তার কয়েক মুহূর্ত আগেই চোখ বুজে ফেলেছে।

পার্থ এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। সে সুমিত্রার হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে ওঠে।

'চোখ খোল সুমি। চেয়ে দেখ। আকাশে আর চাঁদ নেই। অথচ তুমি এখনো বেঁচে আছ। এবার ত এই ভুল ধারণা মন থেকে দূর কর! আকাশের চাঁদ প্রকৃতির নিয়মে বিদায় নিয়েছে আপাতত। কয়েকদিন পরে সে ফিরেও আসবে। কোন মানুষের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না! এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই।'

'কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ত বলে মানুষ তার ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্ম দেবে। সেই নিয়মটা আমার ক্ষেত্রে কেন ভাঙল পার্থ? আমি ইঙ্গিত পেয়ে গেছি। আজ আমাকে মরতেই হবে। এটাও প্রকৃতির ইচ্ছে। আমি এখন প্রকৃতির কাছে মূল্যহীন, বর্জনীয়!'

এই বলে পার্থর হাত ছাড়িয়ে হুইলচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল সুমিত্রা। কিন্তু দূর্বল শরীর তার সাথে সহযোগিতা করল না। আবার চেয়ারে ঢলে পড়ল সে। তার দুচোখ বেয়ে অঝোরে জলের ধারা নেমে এলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পার্থ হুইলচেয়ারটা ঠেলে সুমিত্রাকে ঘরের দিকে নিয়ে চলে। কিন্তু সুমিত্রা আপত্তি জানায়।

'আর একটু থাকতে দাও আমাকে ব্যালকনিতে, প্লিজ। আকাশের তারা গুলো বেশ লাগছে আজ'।

সুমিত্রার এই কথাটা পার্থর মনে অবশেষে একটু শান্তি এনে দিল। অনেকদিন বাদে সুমিত্রার মুখ থেকে একটা আশাব্যঞ্জক বাক্য শুনতে পেল সে।

'আমাকে একটু জল খাওয়াবে?'

'হ্যাঁ সুমি নিশ্চই'। জল আনতে ঘরের ভেতরে চলে গেল পার্থ।

৭

কম্যান্ডার চান্দেলের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। যানের বাকি যাত্রীরাও চিন্তিত। সাময়িক ভাবে বিস্ফোরণের সম্ভবনা কমে যাওয়ায় সকলে আবার বিষ্ণুবাহণ-৫ এ ফিরে এসেছে ঠিকই কিন্তু যানের যন্ত্রমগজে শেষ কয়েক ঘণ্টার সমস্ত তথ্য ফিড করার পর জানা গেছে যে আর মাত্র তিন ঘণ্টা সময় রয়েছে। তার পরেই পৃথিবীর আকর্ষণ বল আবার ওই পাথরটার অণু পরমাণুগুলোকে চঞ্চল করে তুলবে আর তার পরে যে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। বিষ্ণুবাহনকে ধ্বংস হতে দিলে তাদের পক্ষে পৃথিবীতে ফেরা সম্ভব হবে না। সংগ্রাহকযান গুলোর পাতলা আবরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়নি। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্র বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষনে উৎপন্ন তাপে সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আবার পাথরটাকে মহাশূন্যে ভাসিয়ে দিলে তা পৃথিবীর আকর্ষণে সোজা গিয়ে আঘাত হানবে তার বায়ুমণ্ডলে। তার ফলে ধ্বংস নেমে আসতে পারে সারা পৃথিবীতে। বিষ্ণুবাহনে যথেষ্ট জ্বালানী নেই যার সাহায্যে এই পাথর নিয়ে সে পৃথিবীর আকর্ষণের আওতার বাইরে গিয়ে পাথরটা ফেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে।

একমাত্র উপায় হল একটি সংগ্রাহকযানের সাহায্যে পাথরটাকে অন্য পথে চালনা করা। কিন্তু সেই যানের চালকের পক্ষে আর পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। দলনেতা হিসেবে এই আত্মবলিদান কম্যান্ডারেরই কর্তব্য। তাই কম্যান্ডার চান্দেল এই প্রস্তাব সবার সামনে রাখলেন।

'আমি এই যানের কম্যান্ডার হিসেবে বিশেষ ক্ষমতাবলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আমার অবর্তমানে যানের কম্যান্ডার হবে ক্যাপ্তেন ঋক গুহ। পৃথিবীর মিশন কন্ট্রোলের অধিকর্তা ও আমার কম্যান্ডিং অফিসারকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে এবং ওঁরা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। রুদ্রানীর অংশটা ইতিমধ্যে বিষ্ণুবাহনের রোবটিক লিফটারের সাহায্যে সংগ্রাহকযানে তোলা হয়ে গেছে'।

ত্রিদেব চান্দেল নিজের বক্তব্য শেষ করতে সবে সকলে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে যাবে, ঠিক এমন সময় হঠাৎ যানের সতর্কতা সংকেত বেজে উঠল। সকলে সচকিত হয়ে লক্ষ্য করল যে একটা সংগ্রাহকযান বিষ্ণুবাহন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে। আর সাথে সাথে ঋকের গলা শোনা গেল,

'কমলিকা! কমলিকা কোথায়?'

সকলে আবিষ্কার করল যে কমলিকা যানের কন্ট্রোলরুমে নেই। হুমড়ি খেয়ে কম্যান্ডার চান্দেল বিষ্ণুবাহনের কমিউনিকেটর প্যানেলের ওপর পড়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন

'ক্যাপ্টেন রায়! এটা কি পাগলামি হচ্ছে!'

'পাগলামি নয় কম্যান্ডার। এটা ন্যায়বিচার'। কমিউনিকাটরে কমলিকার গলা ভেসে আসে।

'এই মুহূর্তে আপনি মূল-যানে ফিরে আসবেন! এ আমার আদেশ!' গর্জে উঠলেন ত্রিদেব চান্দেল।

'আমি আপনার আদেশের উর্ধ্বে চলে গেছি ক্যাপ্টেন। এ আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত। আমাকে বাধা দেবেন না। আর বাধা দিতেও পারবেন না। বিষ্ণুবাহনের স্বয়ংক্রিয় ন্যাভিগেশন আপনারা যাতে বন্ধ না করতে পারেন তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। আপনাকে এই পাথরটা সংগ্রাহকযানে তুলতে দেখেই আমি আপনার প্ল্যানটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তখনই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আর আমাকে আপনারা ফেরাতে পারবেন না। অন্য সংগ্রাহকযানটিরও সিস্টেম রিস্টার্ট করে এসেছি। ওটা এখন কয়েকঘণ্টার মধ্যে আর ওড়ার অবস্থায় পৌঁছবেনা'।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

'কিন্তু কেন? কমলি কেন?' ঋকের ক্ষোভ আর বিস্ময় মেশানো কণ্ঠস্বর কমিউনিকেটর হয়ে আছড়ে পড়ল মহাশূন্যে ধেয়ে চলা কমলিকার সংগ্রাহক যানটার ওপর।

কিছুক্ষণ কোন উত্তর নেই; তার পরে ভারী গলায় কমলিকা বলে উঠল।

'কারণ আছে ঋক। এটা আমার ভবিতব্য। আমার ঈর্ষার, আমার অন্যায়ের উপযুক্ত বিচার'।

'কি বলছ কমলিকা!'

'হ্যা ঋক। মনে পড়ে এই অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আমাদের শেখানো হয়েছিল যে অভিযানে জীবন বিপন্ন করেও একে অপরকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্য আমি পালন করতে পারিনি ঋক! জানো তোমার সংগ্রাহক যানের লেজার রশ্মি তুমি রওনা হওয়ার আগের মুহূর্তে আমিই বিগড়ে দিয়েছিলাম। রুদ্রাণীর সঙ্গে সংঘর্ষে তা বিকল হয় নি!'

'কিন্তু কেন!'

'ঈর্ষা আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছিল। রুদ্রাণীর সংগ্রাহক হিসেবে তোমার নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে আর আমি পার্শচরিত্র হয়ে সেই পাতার এক কোনায় পড়ে থাকব, এটা আমি মেনে নিতে পারিনি ঋক। ঈর্ষা আমাকে এতটাই অন্ধ করে তুলেছিল যে আমি আমার ভালোবাসার মানুষকে অবধি সম্ভাব্য বিপদের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করিনি। হ্যাঁ ঋক। আজ অবশেষে তোমাকে আমার মনের কথা জানিয়ে যেতে চাই। ট্রেনিং বা অভিযানের আইন আমাদের সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক গড়ার অনুমতি দেয় না। কিন্তু সেই আইন আমি ভঙ্গ করেছি। তোমাকে কোনদিন বুঝতে দিইনি কিন্তু মনে মনে তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। ভেবেছিলাম পৃথিবীতে ফিরে তোমাকে মনের কথা জানাবো। কিন্তু আমার ঈর্ষা আমার ভালোবাসাকে পরাজিত করল'।

কমলিকার রুদ্ধ কণ্ঠে প্রথমবার একটা ভেজা ভাব লক্ষ্য করল ঋক আর তার পরেই তার কমিউনিকেটরের সংকেতস্তব্ধ হল। কমলিকা তার কমিউনিকেটর বন্ধ করে দিয়েছে।

'কমলিকা রুদ্রানীর পাথরটা নিয়ে সোজা চাঁদের দিকে ছুটে চলেছে'।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বিষণ্ণ কণ্ঠে ঘোষনা করল অভিজিৎ।

৮

জলের গেলাস হাতে ব্যালকনির দরজায় দাঁড়াতেই পার্থ আবিষ্কার করল যে ব্যালকনির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তীব্র আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে দরজাতে ধাক্কা দিল সে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

'সুমি! দরজা খোল! দরজা বন্ধ করেছ কেন? দরজা খোল বলছি!'

'না, পার্থ! না। প্রকৃতির নির্দেশ আমি পেয়েছি। তার প্রতি আমার অন্য কোন কর্তব্য যখন আমি পালন করতে পারলাম না তখন এই শেষ নির্দেশটা আমাকে পালন করতেই হবে। আমাকে বাধা দিও না।

একটা ঠান্ডা আশঙ্কার স্রোত বয়ে যায় পার্থর শিরদাঁড়া বেয়ে। পাগলের মত দরজা ধাক্কা দিতে থাকে সে।

'প্লিজ সুমি, প্লিজ! এভাবে হার মেনে নিও না! আজ ডঃ মিত্র বলে গেলেন যে তোমার অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে'।

'কি লাভ? আমি সেরে উঠলেও এই নিষ্ফলা জীবন নিয়ে আমি কি করব? আর আমার এই রোগ যে দিনে দিনে তোমাকেও ক্ষয় করে চলেছে তা ত আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি। আজ তাই তোমাকেও এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে চাই আমি'।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুমিত্রা। দরজাটা বন্ধ করতে তার দূর্বল শরীর অনেকটা শক্তি ব্যয় করে ফেলেছিল। কোনরকমে দরজা বন্ধ করেই সে ব্যালকনির চেয়ারে ঢলে পড়েছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে তাকে বাধ্য করেছিল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শক্তি সঞ্চয় করতে। কিন্তু আর দেরী নয়। পার্থ পাগলের মত দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। তাই আর অপেক্ষা করা যাবে না। টলতে টলতে সে এগিয়ে চলল ব্যালকনির রেলিঙের দিকে।

রেলিঙের অনেক নিচে মাঝরাতের জনহীন রাজপথ তাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে বলেই অপেক্ষা করে রয়েছে। কালো অন্ধকার আকাশে ক্ষীণ আলোর তারা গুলো শহরের নিয়ন ও ভেপার ল্যাম্পের আলোর প্রকোপে আরো ক্ষীন হয়ে নিরর্থক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে চলেছে ঠিক যেন তারই মত। শরীরের শেষ শক্তি প্রয়োগ করে একটা চেয়ার টেনে রেলিঙের সামনে এনে তার ওপরে উঠে দাঁড়ালো সুমিত্রা।

নিচের দিকে পা বাড়ানোর আগে শেষ বারের মত দুচোখ মেলে আকাশের দিকে তাকালো সে।

দরজার পাশে পড়ে থাকা একটা ফুলের টব দেখতে পেয়ে হঠাৎ খানিকটা সম্বিত ফিরে পেল পার্থ। দুহাতে টবটা মাথার ওপরে তুলে ধরে ছুটে এসে সর্বশক্তিতে আঘাত হানলো দরজার ল্যাচলক -এর অংশে। আঘাতের তীব্রতায় থরথরিয়ে কেঁপে উঠে ভেঙে পড়ল দরজার প্রতিরোধ।

দরজা পেরিয়ে ব্যালকনিতে এসে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল পার্থ। রেলিঙের ধারে সুমিত্রার ক্ষীন আবয়বের ছায়া। হতবাক সুমিত্রা বিস্ফারিত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে।

আর আকাশ! এ আকাশ ত কালো অমাবস্যার আকাশ নয়! প্রকৃতির সব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে এই আকাশে জ্বলে উঠেছে পূর্ণচন্দ্রের অলৌকিক এক রূপ। এই চাঁদ আর ফ্যাকাশে সাদা রক্তশূন্য নয়। এই চাঁদের রঙ ঘোর রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। যেন প্রকৃতি এই মাত্র সিঁদুর পরিয়ে নববধূ রূপে গ্রহণ করেছে তাকে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে সুমিত্রাকে জড়িয়ে ধরে রেলিঙের থেকে সরিয়ে আনল পার্থ। সর্বশক্তিতে পার্থকে আলিঙ্গন করে পার্থর বুকে মাথা রেখে ভেজা গলায় বলে উঠল সুমিত্রা,

'আমাকে আকাশ আবার তোমার কাছে ফিরিয়ে দিল। আমাকে বাঁচার লড়াই করতেই হবে। পারবে আমাকে জিতিয়ে দিতে?'

সুমিত্রার মাথায় হাত রেখে তার রুক্ষ ক'খানি চুলে হাত বোলাতে বোলাতে রুদ্ধ কণ্ঠেপার্থ বলে উঠল,

'নিশ্চই পারব সুমি'।

সুমিত্রার উষ্ণ নিঃশ্বাস বুক পেতে অনুভব করতে করতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পার্থ দেখল তার রক্তশূন্য ফ্যাকাশে গালের ওপরে আজ আবার পড়েছে অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া সেই রক্তিম আভা।

লেখকের কৈফিয়তঃ এই গল্পের প্লট মৌলিক হলেও বিশ্বসাহিত্যের একটি বিখ্যাত গল্পের কিছুটা প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণা এই গল্প লিখতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। গল্পের নাম উল্লেখ করছি না। পাঠক যদি গল্পটিকে চিনতে পারেন জানাবেন।

অলঙ্করণ: সুমন দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

জাপানি গল্পের অনুবাদ:

তার মনে হলো সে হয়ত পথ হারিয়েছে। এতক্ষন ধরে সে নির্দেশিত পথেই চলছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে ল্যান্ডমার্কটার কথা তাকে বলা হয়েছিল, সেটা পেরিয়ে এসেছে ভুলে। এই ঘিঞ্জি জায়গায় বেশ কিছুক্ষন এদিক ওদিক করার পর, সে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

আচ্ছা – এই নোংরা প্যাঁচালো গলিঘুঁজি ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠে আবার সেখান থেকে খোঁজ শুরু করলে কেমন হয়? ব্যাপারটা কেঁচে গণ্ডুষ হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু তাছাড়া সে আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছে না আপাতত। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। বড় রাস্তাটা পাবার জন্য কিছুটা হাঁটতেই, ল্যান্ডমার্কটা দেখতে পেল সে।

দোকানের সামনেটা যেরকমটি থাকবে বলে তাকে বলা হয়েছিল, তার থেকে অনেকটাই অন্যরকম দেখাচ্ছে। সেই লোকটি কিন্তু পইপই করে বলে দিয়েছিল যে এটা একটা ডুবসাঁতারের পোষাক বিক্রি করার দোকান। কিন্তু দোকানটা পুরানো আমলের সেকেন্ড হ্যান্ড রোবোট, দ্বিমাত্রিক টিভি সেট - এই সব প্রাচীন জিনিসপত্রে ঠাসা। দেখে তো এটাকে অ্যান্টিক জিনিসপত্রের দোকান বলে মনে হচ্ছে!

সে ঠিক করলো, দোকানীর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবে। বয়স্ক দোকানদারকে দেখে মনে হচ্ছিল, সেই হয়ত দোকানটার মালিক।

"শুনছেন? দোকানটা একটু দেখতে পারি?"

চকচকে পরচুলা পরিহিত দোকানী তাঁর নিষ্প্রভ চোখ তুলে অদ্ভুতভাবে তাকে দেখলেন। এতক্ষন তিনি তাঁর সামনে রাখা ত্রিমাত্রিক টিভি সেটে কিছু একটা অনুষ্ঠান দেখছিলেন। দোকানী তার দিকে তাকাবার পর সে বুঝল, দোকানীর একটি চোখ ছাই-রঙা ইলেকট্রন গ্লাসে তৈরি, সেইজন্যই চোখটা কিরকম একটু ফ্যাকাসে আর বিকৃত লাগছে।

"পরিচয়পত্র আছে কিছু?" রুক্ষ স্বরে দোকানী বলে উঠলেন।

সে পকেট থেকে অদ্ভুত দর্শন স্বাক্ষর সম্বলিত একটা কাগজের টুকরো বের করল যেটা তাকে ওই অচেনা লোকটি দিয়েছিল। আর সঙ্গে পাঁচ ডলারের একটা নোট। বুড়ো দোকানী স্বাক্ষরটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন, তারপর কাউন্টারের নীচে রাখা একটা মেশিনের নীচে কাগজটা রাখলেন। ব্যাঙ্কে যেরকম চেকের সই মেলানোর যন্ত্র থাকে – দেখে অনেকটা সেরকমই মনে হলো। তারপর তিনি কাউন্টারের ওপর থেকে পাঁচ ডলারের নোটটা পকেটস্থ করে বললেন,

"আসুন"।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

দোকানঘরের একদম শেষপ্রান্তে একটি দরজা খুলে দিলেন তিনি। "এই দরজা দিয়ে আসুন।"

"আচ্ছা, এই দোকানটা কি বদলে গেছে?" সে কৌতুহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "আমি শুনেছিলাম এটা ডুবসাঁতারের পোষাক বিক্রি করার দোকান।"

"ওহ – আচ্ছা। না না সেরকম কিছু না। দোকানের ওই মুখটা রাস্তার অন্যদিকে আছে। মানে এর ঠিক বিপরীতে। আপনি ভুল করে এদিক দিয়ে ঢুকেছেন। কিন্তু যেদিক দিয়েই আসুন না কেন, দোকানের ভেতরটা একই।" দোকানী ব্যাখ্যা করে দিলেন।

দরজার পিছনে একটা সিঁড়ি খাড়া নেমে গেছে নীচে পর্যন্ত। সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দোকানী বললেন, "ওখানে একটা দরজা আছে, সেটা দিয়ে সোজা ঢুকে যাবেন। একটাই করিডোর – কিন্তু বড় অন্ধকার। সাবধানে চলে যান।"

বলা বাহুল্য এই নির্দেশটুকু দরকার ছিল। ভালোভাবে ঠাওর করলেই বোঝা যায়, সিঁড়িগুলি খুব পলকা কিছু জিনিসের বিভিন্ন টুকরো জোড়া লাগিয়ে বানানো হয়েছে। বড় বড় কন্সস্ট্রাকশন সাইটে যেভাবে ভারা বাঁধা থাকে- মোটামুটি সেইসব দিয়েই বানানো। এতটাই পলকা, তার যেন মনে হচ্ছিল যে শরীরের ভার রাখতে পারবে না সিঁড়িগুলো, এখুনি হুড়মুড় করে ভেঙে নীচে পড়ে যাবে সবশুদ্ধ। একটা আঙুলও যদি বেখাপ্পা ভাবে এই ঝুরঝুরে রেলিঙে ঠেকে যায়, তাহলেই আর দেখতে হবে না।

চারপাশে কোনো আলো লাগানো নেই, কিন্তু সিলিং থেকে একটা পুরোনো ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ঝুলছে। সেই আলোতেই হাল্কা একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে পায়ের তলার মড়মড়ে সিঁড়ির ধাপগুলোর। সিঁড়ির দুলুনি থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সিঁড়িটার তলায় চাকা লাগানো আছে। সিঁড়ির তলায় নেমে সামনেই যে দরজাটা দেখা যাচ্ছে, ভালো করে ঠাওর করে বোঝা গেল সেটাও সদ্য বসানো হয়েছে। পুরো কাঠামোটাই এমন ভাবে তৈরী যেন মুহূর্তের ইঙ্গিতেই বমাল সমেত সমস্ত গায়েব করে দেওয়া যেতে পারে।

সিঁড়ির নীচে বিচিত্র ধরনের লোহার দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্যাঁতস্যাতে ভাব তাকে ঘিরে ধরলো। তার মনে হলো, এখানে আশেপাশে নিশ্চই কোনো বাতাস পরিষ্কার করার আয়োনাইজড যন্ত্র বসানো রয়েছে। সেটা সত্ত্বেও কিরকম একটা নর্দমামার্কা বোটকা গন্ধ যেন সম্পূর্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এদিকে পায়ের তলায় লাল কার্পেট পাতা, দুপাশে দেওয়ালে রঙ গুলিও চমৎকার –উচ্চ রুচির পরিচায়ক। তবে কার্পেটে পা দিয়েই সে বুঝতে পারল, এই পুরো করিডোরটাই সদ্য জোড়াতালি দিয়ে তৈরী করা এক অস্থায়ী কাঠামো।

কিরকম একটা বিশ্রী গন্ধওয়ালা জায়গা রে বাবা!! কিন্তু এটা যদি সত্যিই সেই জায়গা হয়.....

লম্বা করিডোরটার শেষপ্রান্তে এরকম আরও একটা বন্ধ দরজা। সেটিতে নক করতেই, ভেতর থেকে স্পষ্ট ক্যামেরা ক্লিকের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই একটা গম্ভীর শব্দ করে ভারী দরজাটা খুলে গেল।

দরজার পিছনে একটা আয়তাকার বিশ্রামকক্ষ – দেখে মনে হয় পেছনে ফেলে আসা করিডোরটারই একটা প্রলম্বিত অংশবিশেষ। অনেকটা যেন পুরনো আমলের রেলওয়ে ওয়াগনের ভেতরের অংশের মত চারপাশটা। পায়ের তলায় এখন গাঢ় সবুজ কার্পেট – ওপর ওপর দেখলে বেশ দামী মনে হয়, কিন্তু চারপাশের আসবাবপত্রগুলো একদম রদ্দি। দেওয়ালে একটা ত্রিমাত্রিক টিভি সেট ঝোলানো। গনিকালয়ের রিসেপশনগুলি যেরকম ভাবে আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকে, তার সঙ্গে কি প্রচন্ড মিল এই জায়গাটার। সে কয়েকবার নাক টেনে গভীর শ্বাস নিয়ে ভুরু কুঁচকে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল। অনেকগুলো চেয়ার পাতা রয়েছে এদিক সেদিক। যদিও চেয়ারগুলোতে বসতে তার প্রবৃত্তি হলো না। সে একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

এইভাবে কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর, পাশের ঘরের দরজা খুলে একটা নিষ্প্রাণ চোখের বেঁটে খাটো মানুষ ঢুকে এলো এবং তাকে ভিতরে আসার আমন্ত্রন জানালো।

"এরকম আর কত ঘর পেরোতে হবে কে জানে" –এইসব ভাবতে ভাবতেই সে পাশের ঘরটিতে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তার মনে হলো, সে এবারে একদম শেষ কক্ষে এসে হাজির হয়েছে কিন্তু তারপরেই সে ঠাওর করে দেখলো, ঘরে রাখা একটা টেবিলের পেছন দিকে আরও তিনটে দরজা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভালো করে দেখে সে বুঝতে পারল, এই তিনটি দরজার প্রতিটারই উপর অংশটি কিরকম সিনেমার পর্দার মতো।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

"বসুন" – সেই বেঁটে লোকটি অস্পষ্ট স্বরে যেন একটু অন্যমনষ্কভাবেই তাকে বলল।

চেয়ারে বসার পরেই সে আশা করতে লাগল, এখুনি হয়ত ঐ তিনটি দরজার কোনো একটি থেকে ম্যানেজার গোছের লোক বেরিয়ে আসবে, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। বরং সেই বেঁটে লোকটিই এখন তার সামনে ডেস্কের অপরপাশের চেয়ারটিতে জাঁকিয়ে বসল।

"কেউ কি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু জানিয়েছে আপনাকে?" বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করল।

সে তখন তার স্বল্পপরিচিত অচেনা লোকটির প্রতীকী নাম উল্লেখ করে বলল যে তার সঙ্গে লোকটির একটি ভাটিখানায় দেখা হয়। দেখার পর টুকটাক কথায় আলাপ জমার পর সেই লোকটি তাকে এই ব্যাপারে সামান্য কিছু আলোকপাত করে। যদিও বিশদে তাকে কিছু বলা হয়নি।

পুরোটা শুনে সেই বেঁটে লোকটি একটু বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বলল, "হুম – ঠিকই আছে। ও আমাদেরই একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। যাইহোক, আপনি কি পুরো টাকাটা এখানেই দেবেন?"

"নিশ্চই – আমি পুরো টাকা সঙ্গে করে এনেছি –পঁচিশ লাখ, তাই তো?"

"চেকে না ক্যাশে?"

"না না, ছোট ছোট ক্রেডিটে - যেমনটা বলা হয়েছিল।"

"বেশ।" বেঁটে লোকটি মাথা নাড়ল। সে পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করতে উদ্যত হতেই, লোকটি তাকে বাধা দিল। "এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। আপনি পরেও টাকাটা দিতে পারেন। এত বড় একটা অ্যামাউন্ট – যখন আপনি সত্যি সত্যি ব্যাপারটা করতে চাইবেন, তখনই দেবেন, তার আগে নয়।"

সে ভাবল বেঁটেটা ঠিকই বলছে – এত তাড়াহুড়োর কি আছে? দেখাই যাক না কি ব্যাপার। সে তার হিপ পকেট থেকে হাত সরিয়ে নিল।

"বেশ তাহলে শুরু করা যাক।" থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে সামনে ঝুঁকে এল সেই বেঁটে লোকটি, "এই জিনিসটা নিয়ে আপনার ধারণা কি?"

"আমি শুনেছিলাম – কেউ তার নিজের ভবিষ্যত কে বেছে নিতে পারে, এরকম কিছু একটা ব্যাপার।"

"ব্যাস? এটুকুই?"

"মানে – ওই আর কি –এটুকুই।"

বেঁটে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে আর অন্য হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে উঠল, "তাহলে তো দেখি ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে পড়ল। আমি জানিনা আপনি কি ভেবে এসেছেন, কিন্তু এটা যে কোনো ম্যাজিক নয়, সেটাও আপনার জানা উচিত। আপনার ভবিষ্যতের ওপর তাৎক্ষনিক ভাবে খুব সুক্ষ্ম ভাব পড়বে এই ব্যাপারটার। যদিও খুব বিশাল আবিষ্কার টাইপ কিছু না –তবে বলতে পারেন খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যাপারটা ঘটে গেছ আর কি।"

"সে যাই হোক – একটু বুঝিয়ে বলবেন দয়া করে?" উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল সে। বেঁটে লোকটির এই কুন্ঠিত ভাব সাব দেখে তার আগ্রহ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল – যদিও এসব লোকঠকানো কৌশলও হতে পারে।

"তাহলে সত্যিটাই বলি। আমি বা আমার পার্টনার –আমরা কেউই বর্তমান দুনিয়ার অধিবাসী নই।"

"তার মানে? তাহলে আপনারা.....?" একটা ঢোঁক গিলে সে বলল, "কোনোভাবে কি আপনারা.....?"

"যা ভাবছেন তাই। আমরা ভবিষ্যত থেকে এসেছি – সময় ভ্রমণ বা টাইম ট্রাভেল করে। আমাদের সময়কার বিশ্বে টাইম ট্রাভেল নিয়মের কড়াকড়ি থেকে কোনরকমে পালিয়ে এসেছি বলতে পারেন।"

সে ভাবতে লাগল, সে যা শুনল সেটা সত্যি কি না – সামনে বসা বেঁটে লোকটিকে এবার খুব মনোযোগ দিয়ে সে দেখতে থাকল। সেরকম

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

বিরাট আলাদা কিছু তো দেখতে নয় একে – বর্তমান দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মতোই আকার প্রকার। একটু অগোছালো ধরনের আর একটু অস্থির মনে হচ্ছে যদিও –তাছাড়া তো.....।

"তারপর?" সে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"তারপর এই দুনিয়াতে এসে আমরা একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি, যার দ্বারা সময় ভ্রমন অনেক বেশী নিয়ন্ত্রিত এবং দ্রুত করা যেতে পারে। আমরা এখন এমন দেশ –কালে ভ্রমন করতে পারি, যেখানে ওই সব সময়-আধিকারিকরা আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। সময় জালের জটিল আবর্তে আমরা যখন তখন বিলীন হয়ে যেতে পারি।"

"এক মিনিট," সে বাধা দিয়ে উঠল, "কি হয়েছিল? আপনারা কি কোনো বিপদে পড়েছিলেন?"

"আপনি এখানে বসে আন্দাজও করতে পারবেন না, সময় ভ্রমনের নিয়ে আমাদের দুনিয়াতে নিয়মের কি মারাত্মক কড়াকড়ি।" বেঁটে লোকটা খুব দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়ল, "একটা অনুমতিপত্র যোগাড় করতে কত যে লাল ফিতার ফাঁসের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়, তার ধারণাও করা দুষ্কর। তারপরও, সময় ভ্রমন কালে একজন সময়-অধিকর্তাও লেজুড় হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে। বলতে গেলে, সর্বক্ষণই সময়ভ্রমন নিয়ন্ত্রন অধিকর্তার কড়া নজরে থাকতে হয়। একা একা সময় ভ্রমণ করা বলতে গেলে আমাদের দুনিয়ায় একটা প্রথম শ্রেনীর অপরাধের পর্যায়েই পড়ে।"

"হয়েছে হয়েছে। যথেষ্ট" সে বলে উঠল, "আপনাদের সমাজের গতিবিধি আমার পক্ষে সম্পূর্ন অনুধাবন করা ততটাই অসম্ভব, যতটা গরুর গাড়ীতে অভ্যস্ত একটা সমাজব্যবস্থাকে হাইওয়ে দিয়ে প্রচন্ড স্পিডে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে সতর্ক করা। কিন্তু আপনাদের তৈরী সময় ভ্রমন পদ্ধতি ব্যবহার করে একজন তার ভবিষ্যতকে কিভাবে বেছে নিতে পারে, সেটা একটু বোঝালে ভালো হয়।"

"বলতে পারেন, আমাদের দুনিয়ার সময় ভ্রমন পদ্ধতির মধ্যে সামান্য কিছু রদবদল ঘটিয়ে সেটা করা যেতেই পারে। শুধু একটা টাইম স্পেস চ্যানেল সিলেক্টর আর একটা টাইম স্কোপ হলেই ব্যাপারটা করা সম্ভব।"

"আমার মনে হচ্ছেনা আপনার কথা আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি বলে।"

"সেটা খুবই স্বাভাবিক। আপনার যদি সময় ভ্রমন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানা না থাকে, তাহলে এটা ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এখন। যাইহোক, মেশিনের এই চালন ক্ষমতাকে ইচ্ছেমতো আমরা ব্যাবহার করতে পারি না। অর্থাৎ, আপনাকে ধরে একটা মেশিনে বসিয়ে দিলাম আর সে আপনাকে ভবিষ্যতে রেখে এল, ব্যাপারটা অতটা সোজা নয়। এরকম করলে, গতির অভিঘাতে সময় আবর্তে যা চাঞ্চল্য দেখা দেবে, তাতে সময়-অধিকর্তারা যে কোনো মুহূর্তে টের পেয়ে যেতে পারে।"

"আচ্ছা – তবে?"

"সেই জন্যই তো টাইম-স্পেস চ্যানেল বা দেশ-কাল সুড়ঙ্গ ব্যাবহারের কথা আসছে। এটার জন্য একটা বহুমাত্রিক জায়গা তৈরী করে ফেললেই, কেল্লাফতে।"

"একটু সোজা করে বোঝাবেন?" সে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে এবার, "আমার ভবিষ্যত নির্বাচন করার সঙ্গে এই হাবিজাবিগুলোর সম্পর্ক কোথায়?"

বেঁটে লোকটি এবার একটু সহানুভুতির সুরে বলল, "একজন কিভাবে সময় ভ্রমণ করবে সেটা বুঝতে গেলে এগুলোর ব্যাপারে একটু ধারণা থাকা জরুরি। যদিও আমি যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, আপনার কাছে দুর্বোধ্যই ঠেকবে, তাই একটু অন্যরকম ভাবে চেষ্টা করছি। আপনি কি জানেন যে আমাদের এই বর্তমান দুনিয়া এবং তার সম্পূর্ন ইতিহাস একমাত্র সম্ভাবনা নয়? আরও গননাতীত সম্ভাবনা আছে অতীতে, ভবিষ্যতে নানা ধরনের সম্ভাব্য দুনিয়া এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ইতিহাসের পাশাপাশি বাস করার।"

"না সেরকম তো.....কিন্তু দাঁড়ান, আমার মনে হয় আমি এর আগে এই ধরনের একটা কিছু শুনেছি।" সে অনিশ্চিত ভাবে বলে উঠল, "এই ব্যাপারটা একদম উড়িয়ে দেওয়ার নয়।"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

"তাহলেই দেখুন, আপনি যদি নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি পড়েন তাহলে বুঝবেন যে একটা বিন্দুর উপর দিয়ে যদি একটা সরলরেখা যায়, এবং তার সমান্তরালভাবে যদি আরও অসংখ্য সরলরেখা আঁকা হয়, তবে তারা সেই বিন্দুর উপর দিয়ে যাওয়া সরলরেখাটির উপর অবস্থিত হবে না। তাই সময় ভ্রমনের সূচনালগ্নে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে সময় ভ্রমণকারী দেশ-কালের সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে পারেনি যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল। ধরে নেওয়া যাক, আপনি একটা বিন্দু P থেকে যাত্রা শুরু করলেন ভবিষ্যতের A বিন্দুতে। এবার A ভবিষ্যত কিন্তু P এর থেকে বেরোনোর পর একমাত্র সম্ভাবনা নয়। সেখানে A_1, A_2, A_3.....A_nএরকম অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আবার আপনি ধরুন যে কোনো একটা ভবিষ্যতে চলে গেলেন, কিন্তু সময়ের সিঁড়ি বেয়ে কি আপনি সেই ফেলে আসা বিন্দুতে ফিরে আসতে পারবেন যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন? প্রায়ই সেটা সম্ভব হবে না, কারণ আপনার অধুনা ভবিষ্যত A এর অসংখ্য সম্ভাব্য অতীত থাকতে পারে যেমন P_1, P_2, P_3 ..... P_n.

"ওহ, এই ব্যাপার - তারপর?" মনে বিরক্তি চেপে বাইরে বোঝার ভান করে সে বলে উঠল।

"এই সময়ের গোলোকধাঁধা এড়াবার জন্য, দেশ-কাল সুড়ঙ্গ নির্ণায়ক বা টাইম-স্পেস চ্যানেল সিলেক্টর বানানো হয়েছে, যেটা একটা অনুনাদ পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। দেশ-কালের কম্পনের অনুনাদ কে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপর একটি সম কম্পনের দেশ-কালের বিন্দুকে খুঁজে বের করা হয়। এর ফলে, আপনি যদি দেশ-কালের P বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে থাকেন, তাহলে সঠিক ভাবেই A বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবেন আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসতে পারবেন একটুও এদিক ওদিক না করে। কিন্তু মুশকিলটা হলো গিয়ে, আপনি এরকম ভবিষ্যত বা অতীতে যেতে পারবেন না যেখানে এই দেশ-কালের শাখা প্রশাখা বহুলাংশে বিধৃত। আপনি শুধু দেশ কালের সেই সুড়ঙ্গেই যাত্রা করতে সক্ষম হবেন যেখানে এই অনুনাদী তরঙ্গ কাজ করে, তাও সেটা আবার এই অসিলেটর যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। মানে, অসিলেটর যত শক্তিশালী হবে, আপনার একাধিক অতীত বা ভবিষ্যত ভ্রমনের সম্ভাবনা ততই বাড়তে থাকবে। আমাদের কাছে যে অসিলেটরটি আছে, তা দিয়ে আপাতত আপনি তিনটে আলাদা আলাদা চ্যানেলে সময় ভ্রমণ করতে পারবেন।"

এতক্ষণে কিছু জিনিস তার কাছে বোধগম্য হতে শুরু করেছে, "তারমানে, আমি আমার ভবিষ্যতের বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারব, এই তো?"

"অনেকটা সেরকমই," বেঁটে লোকটি মাথা নাড়ল, "আমাদের চ্যানেল সিলেক্টর আজ এইখানে এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আপনার তিনটি সম্ভাব্য ভবিষ্যত নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু এটা শুধুই আপনাকে কতকগুলি সম্ভাবনা নির্দেশ করে দেবে, এর বেশি কিছু না। তাই যে ভবিষ্যত আপনি বাছবেন, সেটি সঙ্গে সঙ্গে আপনার চারপাশে প্রতিভাত নাও হতে পারে। আমরা যে ভবিষ্যৎ জগতগুলি আপনাকে দেখাবো, তার থেকে আপনি আপনার পছন্দমতো ভবিষ্যত বেছে নিতে পারেন। এবং সেই মুহূর্তে, সেই বিশেষ বিন্দু থেকে আর যে সমস্ত সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় আমাদের প্রবেশাধিকার আছে, তার মধ্যে ওই একটি নির্দিষ্ট দিকেই আপনি, আপনার পারিপার্শ্ব এবং বিশ্বের সমস্ত ইতিহাস চালিত হতে থাকবে।"

"অন্যভাবে বললে", শুকনো গলায় ঢোঁক গিলল সে, "এই ঘরের মধ্যেই তিনটে দরজা আছে যা তিনটে আলাদা আলাদা ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে পারে, তাই নয় কি?"

"একদম ঠিক", বেঁটে লোকটি তার পিছন দিকে আঙুল তুলে দেখাল, "প্রত্যেকটি দরজার পেছনে এক একটা অসিলেটার বসানো রয়েছে। আপনি এক একটা চ্যানেল দরজা দিয়ে ঢুকলেসেখানে ভিন্ন দেশ-কালের আবর্তে এক অন্য ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করবেন।"

"এই তিনটে ভবিষ্যৎ দুনিয়া কিরকম হবে? আমি কি তার একটা আভাস পেতে পারি?" সে এবার ঝুঁকে এল। উত্তেজনার চরমে পৌঁছে তার গলা এবার কাঁপতে শুরু করেছে।

"নিশ্চয়ই", বেঁটে মানুষটি তার ডেস্কের নীচে হাত দিল, "আমি চ্যানেলের মধ্যে টাইমস্কোপ চালিয়ে আপনাকে তিনটি ভবিষ্যতের একটা আভাস দিতে পারি।"

ঘরটা হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেল আর তিনটি দরজার উপরিভাগ কেমন যেন একটা হাল্কা আলোর আভায় ভরে উঠল ধীরে ধীরে। "একদম ডানদিকের দরজার থেকে তৃতীয় দরজা অবধি এক, দুই তিন করে নাম্বারিং করা আছে। এগুলি পর পর ভবিষ্যৎ রাস্তার দিক নির্দেশক", লোকটি বলে উঠল, "দরজার উপরিভাগের অংশটিই হলো টাইমস্কোপ।"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

একদম ডানদিকের এক নম্বর দরজার টাইমস্কোপ সক্রিয় হয়ে উঠেছে – হাল্কা আলো এখন অনেক জোরালো। বাকি দরজা গুলি এখনও আধো অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ডানদিকের দরজার দিকে চেয়ে মনে হতে লাগল, ওর ভেতরে যেন কিছু একটা ঘটছে, একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। এবার সেটা আস্তে আস্তে একটা প্রতিকৃতি নিল – অনেকটা ত্রিমাত্রিক ছবির মতো ব্যাপারটা।

ভবিষ্যতের যে ছবিটা ফুটে উঠল, সেখানে একটা শহর তৈরী হচ্ছে - আধুনিক শহর। অবিশ্বাস্য গতিতে তৈরী হয়ে চলেছে ইমারতের পর ইমারত। অদ্ভুত তাদের আকৃতি, কোনোটা গোলাকার শংকু আকৃতি, কোনোটা মৌচাকের মত খোপ খোপ, কোনোটা আবার চোঙের মত লম্বা, গোল বলের মত, ইত্যাদি। এক একটা আকৃতি নিজেই এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ন শহর – আর তারা পাইপের মত রাস্তা দিয়ে একে অপরের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে দূর থেকে দেখে মাকড়সার জাল বলে ভুল হতে পারে।

কোনো যন্ত্র ছাড়াই মানুষজন আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন এরা অভিকর্ষবিরোধী যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। আরো দেখা যাচ্ছে, একটা বিরাট রকেট উড়ে চলেছে এক দূর গ্যালাক্সীর দিকে। রকেট তো নামেই – একটা পুরো শহর যেন মহাশূন্যে ভেসে চলেছে! ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে, বাড়িঘর, কল-কারখানা গজিয়ে উঠেছে – যেন একটা বিশাল কৃত্রিম উপগ্রহকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছে এই অত্যাধুনিক দুনিয়ার অধিবাসীরা।

"আর দেখবেন?" লোকটি জিজ্ঞেস করল।

"থাক –যথেষ্ট হয়েছে।" বিড়বিড় করে সে বলে উঠল, "এবার দ্বিতীয়টা দেখান।"

দ্বিতীয় দরজার উপরিভাগ এবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। প্রায় একই দৃশ্য, তবে শহরের ইমারতের স্থাপত্য আগেকার মতো অত জটিল নয়, বেশ সোজাসাপটা। বাড়িগুলিও এখানে আকাশচুম্বী নয়, অথচ চারপাশের অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে খুব নিয়মনিষ্ঠভাবে বিন্যস্ত। রাস্তার দুপাশে ফুলের সারি যেন হাওয়ার মাথা ঝুঁকিয়ে পথিককে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত। গাছের সারি গুলি পরস্পরের থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করছে। অভিজাত চেহারার গাড়ির দল অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, গাড়ির থেকে কোনোরকম কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এসে আকাশ বাতাসকে কালিমালিপ্ত করে পরিবেশ দূষন ঘটাচ্ছে না।

মানুষের জামাকাপড়ও খুব সহজ সরল। পুরুষদের প্রায় সবাইকেই গ্রীক দেবতাদের মতো সুন্দর দেখতে, মহিলাদের চেহারার নিখুঁত গড়ন আর তাদের প্রগলভ ভাবভঙ্গি বেশ চোখে পড়ার মতো। পরিবেশের উষ্ণতা মনে হয় এখন পুরোটাই মনুষ্য নিয়ন্ত্রিত। ওই ওপরে যে সূর্যটা সোনালি আলো বিচ্ছুরণ করছে, দেখে মনে হলো সেটাও কৃত্রিম। যন্ত্রাদি যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সবকিছুর মধ্যে একটা অসাধারন অভিজাত্য, নৈপুণ্য এবং সামঞ্জস্যের ভাব স্পষ্ট। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এই শহর এখন চূড়ান্ত উন্নতির পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বিরাট বড় কোনো স্টেডিয়ামে কোনো ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। সুইমিং পুলে সাঁতার প্রতিযোগিতা চলছে। অন্যদিকে এক বিরাট মঞ্চে গান বেজে চলেছে, বিভিন্ন জনসমাবেশে কবিতা পড়া, আবৃত্তি চলছে। যে কেউ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গিয়ে সেখানে অংশগ্রহন করতে পারে। ওদিকে আকাশের ঘন নীলিমায় ভেসে আছে একটি বিমানপোত, তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন দীঘির জলে ভাসমান সরসীর মতো।

"সনাতনী সৌন্দর্যময় সম্প্রীতি" নিজের মনেই বলল সে, "খুব সাহসী কিছু কৃত্রিম পরিবর্তন করেছে এরা যাহোক।"

"আমরা কি পরেরটা দেখতে পারি?" লোকটি জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চই।" সে উত্তর দিল।

তিন নম্বর দরজার প্যানেলের আলো কিন্তু তখনই উজ্জ্বল হয়ে উঠল না। একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে আলোর তীব্রতা বাড়তে থাকল। কিন্তু যেন মনে হলো, ঐ হাল্কা আলোর পিছনে কিছু একটা জিনিস বেশ জোরে জোরে নাড়াচাড়া করছে। পরের মুহূর্তেই একটি বিরাট শহর দৃশ্যমান হলো, যার অধিবাসীরা কেমন যেন হতভম্ব ভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। দেখে মনে হল, এই শহরটির সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর শহরগুলির যথেষ্ট মিল আছে। ধুলো, ধোঁয়া, রাস্তার যানজট, চেঁচামেচি, শ্যাওলাধরা বড় বড় অট্টালিকা, ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চল, সব মিলিয়ে একান্তভাবেই আজকের দুনিয়ার যে কোন একটি শহরের ছবিই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কিন্তু শহরের উপরিভাগে এমন কিছু ঘটছে, যাতে শহরের মধ্যে কিরকম যেন একটা থমথমে ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। চোখেমুখে একটা গভীর উৎকণ্ঠা এবং ভীতি নিয়ে, শহরের মানুষ অধীরভাবে এদিকওদিক ছোটাছুটি করছে। রাস্তার একটা কোন থেকে, হঠাৎ একজন আকাশের দিকে দেখিয়ে চিৎকার করে কি বলে উঠল। অন্যান্য উৎকণ্ঠিত মুখগুলি নিমেষে সেদিকে ঘুরে গেল।

পরমুহূর্তেই পর্দাজুড়ে একটা সুতীব্র আলোর ঝলকানিতে তার চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে গেল। এত তীক্ষ্ণ এবং ভয়ানক সেই আলোর বিচ্ছুরণ, যে চোখ ফিরিয়ে নেবার কিছুক্ষণ পরও সে চারপাশে সব কিছুতেই আবছা লাল এবং সবুজের বর্ণাভা দেখতে থাকল।

"শুধু এইটুকুই?" সে জিজ্ঞেস করল।

"আরও কিছুটা আছে" বেঁটে লোকটির গলা অন্ধকারের মধ্যে থেকে শোনা গেল, "বাকিটা ঐ দেখুন।"

প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না। এক ঝলক দেখে যেন মনে হয় একটা গভীর কালো দাগের মতো কিছু একটা। ভালো করে নজর করার পর সে বুঝতে পারল, দাগ নয় – সারা শহর জুড়ে একটা প্রকান্ড কালো গর্ত তৈরী হয়েছে। পোড়া শহরের সেই বীভৎস ধ্বংসস্তুপের আশে পাশে ছিড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গলে যাওয়া কাঁচের দাগ – যা প্রায় মাইলখানেক বিস্তৃত। এমনকি দূরের পাহাড়গুলো অবধি প্রচন্ড তাপে গলে কালো পাথরের স্তুপে পরিনত হয়েছে। ঐ বিরাট গর্তের শ'খানেক মাইলের মধ্যে, গাছপালা পশু পাখি তো দুরের কথা, মনে হয় কোনো ব্যাকটিরিয়া অব্ধি বেঁচে নেই। দূর আকাশে লালচে-খয়েরী রঙের তেজস্ক্রিয় ধূলোর মেঘ ভেসে চলেছে বাতাসের তাড়নায়।

উত্তাল ঢেউ এবং মত্ত টাইফুন উপকূলে আছড়ে পড়েছে। কোনোদিকে মানুষের কোনো চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই – দেখে মনেই হচ্ছে না মনুষ্যপ্রজাতির কোনো অস্তিত্বএই অঞ্চলে কোনকালে ছিলবলে।কিছুক্ষন আগে অবধি থিকথিকে ভিড় জমিয়ে রাখা মানুষগুলির নশ্বর দেহ হয় এখন রাস্তার ওপর জমে থাকা সাদা ছাই এর স্তুপে পরিনত হয়েছে, নাহলে বাতাসে ভাসমান তেজস্ক্রিয় কনায় রূপান্তরিত হয়ে স্থানান্তরে উড়ে বেড়াচ্ছে।

ঘরের আলো জ্বলে ওঠায়, পর্দার আলোগুলো ম্লান হয়ে এল।

"বেশ", সেই একঘেয়ে গলায় বলে উঠল লোকটি, "এই হলো সেই তিনটি ভবিষ্যত, যা আমাদের টাইম-স্পেস চ্যানেল সিলেক্টর এখনও অবধি সংবদ্ধ করতে পেরেছে। দেখুন, এদের মধ্যে যেটা পছন্দ হয়, সেটি বেছে নিন।"

খসখসে গলায় বলে উঠল সে, "একটা প্রশ্ন ছিল। জানতে চাইছিলাম যে, সময়ের নিরীখে এই তিনটি ভবিষ্যত আমাদের বর্তমানকাল থেকে ঠিক কতটা দূরে?"

"খুব একটা বেশি দূরে নয়। আমাদের টাইমস্কোপ যে ভবিষ্যত তিনটি দেখালো, সেগুলি মোটামুটি একই দূরত্বে বলা যেতে পারে, যদিও সবসময় টাইমস্কোপ যে সমদূরত্বের ভবিষ্যত দেখাবে এমনটা নয়, তবে খুব একটা এদিক ওদিক হয় না। ধরে নিন, তবুও মোটামুটি এক যুগের থেকে কিছু বছর এগিয়ে – মানে ঐ বছর কুড়ি পরের ঘটনা।"

"আর একটা প্রশ্ন। একবার ভবিষ্যতে যাবার পর, আমি কি আর এখানে, এই সময়ে ফিরে আসতে পারব?"

"সেটা সম্ভব না। একই সময়ে ফিরতে গেলে এরকমই একটা সময় ভ্রমন পদ্ধতির দরকার পড়বে।" বেঁটে লোকটি একটা হাই তুললো – "নিন, এবার তাড়াতাড়ি আপনার পছন্দটা বলে ফেলুন –"

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করার পর সে বলল, "দ্বিতীয় বিকল্পটি মনে হচ্ছে সব দিক দিয়ে ভালো।"

"বেশ – তাহলে মূল্য ওটাই পড়বে। খরচটা বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু মনে করুন না এটা আপনার একটা দান – ভবিষ্যতের দুনিয়ার কিছু বিপ্লবীদের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য।"

সে পকেট থেকে পেটমোটা মানিব্যাগটা বের করে, বেঁটে লোকটির হাতে উপযুক্ত অর্থ তুলে দিল।

"আচ্ছা, এবার আমি চ্যানেল দুই এর দরজা খুলতে যাচ্ছি....." লোকটি টাকাগুলো ড্রয়ারে রেখে উঠে দাঁড়ালো, "আপনার পছন্দের

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ভবিষ্যত দুনিয়ার পা রাখার আগে, কিছু জিনিস আপনাকে জানানো দরকার।"

সে বুঝতে পারল, তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। হাতের পেছনটা দিয়ে সেটা মুছে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনটি দরজার দিকে তাকিয়ে রইল – মনে মনে সে যেন তুলনা করছে তার দেখা ভবিষ্যত ত্রয়ীর।

"আপনাকে আগেও বলেছি, এসবই আপনাকে আপনার পছন্দের ভবিষ্যতের দিকে একটা নির্দিষ্ট পথ নির্দেশ দেবে। তারমানে এই নয়, যে দরজা অতিক্রম করার পরেই আপনার দেখা ভবিষ্যতে গিয়ে পড়বেন আপনি। এই ব্যাপারটা ভালো করে খেয়াল করুন। এই বিশেষ কারনের জন্যই, দরজার ওপাশে যখন যাবেন, তখন দেখবেন দুনিয়াটা বর্তমানকালের দুনিয়ারই মতো – আপনার পারিপার্শ্ব, মানুষ, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সবাই একই রকম থাকবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সবেতেই পরিবর্তন আসবে। যত সময় এগোবে, আপনার ভবিষ্যত অন্যরকম হতে থাকবে, এবং ধীরে ধীরে আপনার পছন্দের ভবিষ্যতের দিকে এগোতে থাকবে। এবং....."

"ক্ষমা করবেন....." একটু ইতস্তত করে সে বলে উঠল।

"আপনি কিন্তু একটা শপথ নেবেন – এখনই এই মুহূর্তে। অন্য দুনিয়ায় পদার্পন করে কিন্তু আপনি এই ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না – মানে আপনি যে এক পূর্ববর্তী দুনিয়া থেকে এসেছেন, এ ব্যপারে সম্পূর্ন মন্ত্রগুপ্তি রাখবেন। এতে আপনার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই যদিও, কিন্তু এসব গল্প বলে কোনো লাভও নেই আপনার। কিন্তু আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আমরা যেখান থেকে এসেছি, সেখানকার সময়-ভ্রমন আধিকারিকেরা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দুনিয়ায় টহল দেয়। যদি সেরকম কেউ আপনার কথা শুনে ফেলে, তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ। আপনি ওদের হয়ত চিনতে পারবেন না, কারন সাধারন মানুষের ভিড়েই মিশে থাকে ওরা, কিন্তু ওরা আপনাকে ঠিক চিনে নেবে। দয়া করে প্রতিজ্ঞা করুন যে এসব কথা কাউকে বলবেন না, শপথ নিন....."

"একটু দাঁড়ান....." সে বলে উঠল, "আমি কি আমার পছন্দ বদলাতে পারি?"

"হ্যাঁ ...মানে তা পারেন.....কিন্তু....."

"আমাকে ভবিষ্যত গুলো আর একবার দেখাবেন কি?"

বেঁটে লোকটি ঘর অন্ধকার করে দিলে, পুনরায় তিনটি দরজার পর্দায় আলো ফুটে উঠল। ছায়াছবির মতো ভবিষ্যত ঘটনাবলী ফুটে উঠতে লাগল একের পর এক।

সে একটা ঢোঁক গিলল।

"ঠিক আছে – আমি প্রস্তুত। আমি তিন নম্বর ভবিষ্যতে যেতে চাই।"

"তিন নম্বর? ঠিক শুনছি তো?" লোকটি অবাক ভাবে বলে উঠল। "আশ্চর্য লোক তো আপনি!! শেষে কিনা আপনি তিন নম্বর পছন্দ করলেন?"

"আমি জানি" – মুখে জমে থাকা ঘামের বিন্দুকে মুছে নিতে নিতে সে বলল, "অন্য দুটো ভবিষ্যত খুব চেনা ছকের। আজ না হয় কাল, সেগুলো হবেই – সেখানে পৌঁছানোর জন্য এত টাকা খরচ করার দরকার নেই।"

"তিন নম্বরটাও তো কতকটা তাই – একদিন তো আসবেই শেষের সে দিন, নয় কি?"

"না....." যন্ত্রনাভরা কণ্ঠস্বরে সে বলে চলল, "আমরা এখন এমন একটা দুনিয়াতে বাস করছি বা হয়ত ভবিষ্যতেও করব, যেখানে আমি হয়ত শেষের সে দিনের কথা জানি – কিন্তু কবে কিভাবে সে আসবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই। সম্ভাবনাময় সেই উপলব্ধির মধ্যে চিরন্তন উৎকণ্ঠায় বেঁচে থাকার চেয়ে, এমন দুনিয়ায় যাওয়া ভালো নয় কি, যেখানে অন্তিমকাল বড় নিশ্চিত। আমার মনে হয়, এই ভবিষ্যতটা এত সহজে পাওয়া সম্ভব নয় অন্য কোথাও। এ এমন এক ভবিষ্যত যেখানে আমি নিশ্চিন্ত এই ভেবে, যে সেটা একদিন সম্পূর্ন ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমি তার সাক্ষী থাকব – এমন একটা দুনিয়া....."

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

"যা ভালো বোঝেন....." লোকটি কাঁধ ঝাকালো। "এখানকার কিছু খদ্দেরও কিন্তু আপনারই মত চিন্তাধারা পোষন করেন। যা হোক, এবার তিননম্বর দরজার দিকে এগিয়ে চলুন।"

দরজার দিকে এগোতে এগোতেই সে বুঝতে পারল, তার মুখের ভেতরটা কেমন শুকিয়ে আসছে।

প্রতি পদক্ষেপে আর মনে হতে লাগল, সে কিছু ভুল করছে। একবার ঢুকে গেলে তার আর ফেরার রাস্তা নেই – "ফিরে যা, ফিরে যা - পাগলামি করিস না", তার অন্তরাত্মা বলে উঠল, "এখনও বেশি দেরী হয়নি, ফিরে যা।" তার সমস্ত শরীর, দেহের প্রতিটি জীবন্ত কোষ, প্রত্যেকটা পেশি তাকে বাধা দিতে লাগল, যেন সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে স্ব-ইচ্ছায় না এগিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কিছুক্ষন পর সে নিজেকে আবিষ্কার করল, তিন নম্বর দরজার সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে উত্তেজনায় কিছুক্ষন হাত ঘষে নিল – তার সমস্ত শরীর এখন ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

"দয়া করে আসুন" – বেঁটে লোকটি আগের মতোই অনুত্তেজক ভাবে বলে উঠল, "এই দরজার পিছনে একটা প্যাসেজ আছে। আপনি যখন সেটা দিয়ে অতিক্রম করবেন, অর্থাৎ টাইম-স্পেস চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে যাবেন, তখন কিছু শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করবেন। কিন্তু সেটা অসহ্যকর কিছু না, সে ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি। সোজা এগিয়ে যাবেন। প্যাসেজ যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে আরো একটা দরজা আছে, সেটা পেরোলেই ঠিক এরকমই একটা ঘর পাবেন। কিন্তু সেটা এই ঘর নয় – ততক্ষনে আপনি অন্য জগতে পৌঁছে গেছেন। চিন্তা করবেন না, সেখানেও আপনি যেভাবে আছেন, সেরকমই থাকবেন – এখানেও যতদিন বাঁচতেন সেখানেও.....অবশ্য হ্যাঁ, আপাতত কিছুদিন তো বেঁচে থাকবেনই। যান, শুভযাত্রা।"

হাল্কা একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। যেন জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে সে দরজার পেছনে অপেক্ষমান অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল – কি এক অদৃশ্য বাঁধন তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল অমোঘ নিয়তির দিকে।

"ফিরে যা।" সেই শব্দগুলো আবার ঘুরেফিরে তার মাথায় অনুরণিত হতে লাগল বারংবার। কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে সে হেঁটে যেতে লাগল একভাবে। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে থেকে সে খেয়ালই করেনি যে কখন দরজা পেরিয়ে ঢুকে সে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে প্যাসেজে। পেছনের দরজা বন্ধ হওয়ার গম্ভীর ধাতব শব্দে সে সম্বিৎ ফিরে পেল, আর নিজেকে আবিষ্কার করল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে। পাগলের মতো সে সেই নিবিড় আঁধার হাতড়ে এগিয়ে চলতে লাগল, আর অন্ধকারের মধ্যে বৃথাই ফিরে তাকাতে লাগল তার পেছনে ফেলে আসা দরজার দিকে।

পিচকালো আঁধার পরিবেষ্টিত থাকার জন্য সে জায়গাটা সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারছিল না। খুব ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে সে অগ্রসর হতে থাকল। প্যাসেজটা একটু ঢালু হয়ে সামনের দিকে নেমে গেছে। যতই সে এগোতে থাকল, মেঝেটা কিরকম যেন শক্ত থেকে হঠাৎ করে জেলির মতো নরম হয়ে গেল। পরিবর্তনটা এতটাই আকস্মিক যে সে ভারসাম্য হারিয়ে দেওয়ালে একটা জোর ধাক্কা খেল। বুঝতে পারল, তার চারপাশে সবকিছু কিরকম যেন কাঁপছে, আর তার শরীরের মধ্যেও কিরকম একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে – তীব্র মাথা যন্ত্রনা করছে, ঘুম ঘুম লাগছে।

তার মনে হলো, চারপাশের অন্ধকার যেন কিরকম ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে – সোজা ভাবে হেঁটে চলা দায় হয়ে পড়ছে। তবুও সে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে যেতে লাগল শরীরের তুমুল অস্বস্তি এবং এদিক ওদিক দেওয়ালের ঠোক্কর অগ্রাহ্য করে।

পথের শেষ হলো একসময়। ঠান্ডা কিছু একটা জিনিসের সংস্পর্শে এসে সে হাত বুলিয়ে অনুভব করল যে সেটা একটা লোহার দরজা। তার মানে সে অন্যদিকে পৌঁছে গেছে। তাকে যতবার বলা হয়েছিল, দরজার ওপর সে ততবার আঘাত করল। কোনো শব্দ না করে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে প্রবেশ করার পর কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভেতর তীব্র আলোর সুবাদে সে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল। ক্রমে আলোয় চোখে সয়ে গেলে সে দেখতে পেল, দরজার পিছনে ঠিক আগের মতোই দেখতে একটা বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমনটা তাকে বলা হয়েছিল।

প্রথমে তার মনে হলো, যে ঘর দিয়ে সে প্যাসেজে ঢুকেছিল, আবার সেই ঘরেই ফিরে এসেছে। কিন্তু পরক্ষনেই সে দেখল, এই ঘরে কেবলমাত্র একটাই দরজা, আগের ঘরের মতো তিনটে দরজা নেই। নিশ্চিন্ত হলো সে। এর অর্থ, সে এখন অন্য দুনিয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

"ভবিষ্যত পৃথিবীতে আপনাকে স্বাগত।" এই বেঁটে লোকটি বলে উঠল, আগের লোকটারই মতো একঘেয়ে সুরে। যদিও নিশ্চিতভাবেই এটা

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আগের লোকটা নয়, এই লোকটি ভবিষ্যত পৃথিবীর বাসিন্দা।

"এদিক দিয়ে বেরিয়ে আসুন"।

"যাবার আগে একটা প্রশ্ন ছিল" কিছুটা কষ্ট করেই যেন সে কথাগুলো বলল, "আমি এইমাত্র অন্য এক জগতের থেকে সময়ের সীমারেখা অতিক্রম করে এদিকে এলাম। কিন্তু আমার যে সত্তাটা, মানে যে "আমি" টা এই জগতে আছে, তার কি হবে? যদি আমাদের কোনোদিন দেখা হয়ে যায়?"

"ওহ – না না সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন", সেই লোকটি ক্লান্তস্বরে বলল, "এটা একটা অনেক জটিল ব্যাখ্যা, শুধু জেনে রাখুন, আপনাকে যেমন ও জগত থেকে এখানে পাঠালাম, ঠিক সেরকম ভাবেই আপনার এই জগতের সত্তাটিকেও আমরা আপনার ফেলে আসা দুনিয়ায় পাঠানোর ব্যাবস্থা করেছি, সুতরাং কোনো সমস্যা নেই।"

"কিন্তু আপনারা কিভাবে....."

"দয়া করে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যান – বিদায়।"

সে বুঝতে পারল, এর বেশি ব্যাখ্যা পাওয়ার আর কোনো আশা নেই। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সেই এক করিডোর পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একই ধরনের দোকানের মধ্যে দিয়ে ঢুকে সে রাস্তায় এসে নামল। একদম সেরকমই ঘিঞ্জি রাস্তা, যেটা ফেলে সে ঢুকে এসেছিল দোকানের ভেতরে।

জায়গাটার কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটেনি নতুন দুনিয়ায় এসে। সব কিছু যেমন দেখে এসেছিল, ঠিক তেমনটাই রয়েছে। কাঠের বেড়ার উপর আচঁড়ের দাগ থেকে শুরু করে, আকাশে মেঘের আকার পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে।

কিন্তু সে জানে যে এই জগত এক অন্তিম সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে এক বিপুল বিধ্বংসী ক্রিয়ায় এ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা এখন কেবল সে জানে, আর জানে কিছু মুষ্টিমেয় সময় ভ্রমনকারী, যারা তারই মতো তিন নম্বর দরজার বিকল্পটি বেছে নিয়েছিল। এই দুনিয়ার বাকি অধিবাসীদের কাছে এ রহস্য স্বপ্নেরও অতীত।

আমিই একমাত্র জানি, কালো ধোঁয়ায় পূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে নিজের মনেই বলে চলল, *আমি ছাড়া এই দুনিয়ার ভবিতব্য কেউ জানে না। বেশ কিছু বছর পরে, হতে পারে এক যুগ পরে– আমি ঐ আকাশের প্রান্তে এক তীব্র আলোর ঝলকানি দেখতে পাবো, এবং তারপর - তারপর সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। আহ্, কি নিবিড় নিশ্চয়তা।*

বাকি দুই দুনিয়ার মতো, এই দুনিয়ার কোনো ভবিষ্যত নেই। বছরের পর বছর ধরে কষ্টকর, প্রলম্বিত, ক্ষয়িষ্ণু এবং একঘেয়ে জীবন চিরটাকাল এখানে টেনে নিয়ে যেতে হবে না। সে চারপাশটা ভালো করে দেখল – অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র, বেয়াড়া ছেলের দল, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ঘেয়ো কুকুর এমনকি ঝলমলে সাইনবোর্ডগুলোও যেন এক করুন পরিলেখায় বিধৃত হয়ে আছে। তার মনে হতে লাগল, পারিপার্শ্বের সবকিছুই যেন চলমান আঁকা ছবির দল, মৃত্যু এবং ধ্বংসের চড়া এবং উজ্জ্বল বর্নে রঞ্জিত। গত দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম তার মন এত স্বচ্ছ, প্রানবন্ত, এবং এক বিষাদময় প্রাপ্তিতে পূর্ন হয়ে উঠল।

শিরদাঁড়া সোজা করে সে এগিয়ে গেল শহরের মধ্যে – যে শহর জানে না, জানতেও পারবে না যে কি নিশ্চিত নিয়তির দিকে সে এগিয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে – এক সর্বব্যাপী ধ্বংসের ভবিতব্য মাথায় নিয়ে।

*****

"কি কপাল মাইরি আমাদের – টাকায় যে সিন্দুক উপচে পড়ছে ভায়া।" সেই বেঁটে লোকটি ড্রয়ার খুলে কিছু নোট বের করে শূন্যে তুলে নাড়াতে লাগল। "প্রায় কোটি খানেক কামিয়ে ফেললাম। আর এসব করার দরকার আছে কি?"

"নিশ্চই" অন্য লোকটি, অর্থাৎ "বন্ধু" বলে উঠল, "আমাদের বস খুব খুশী। টাকা কামানোর এর থেকে ভালো ফিকির কি হতে পারে? টাইম

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

মেশিন, টাইম চ্যানেল – বুদ্ধিটা ভাবো একবার! এরকম একটা গপ্প ফেঁদে টাকা কামানোর কথা কে কবে মাথায় আনতে পেরেছে বলো দিকি? একটা বড় নিকাশী পাইপকে ব্যাবহার করে কাজ চলে যাচ্ছে। কেউ কিছু টের পেলে, নিমেষে গায়েব, কেউ টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা চলুক আরো কিছুদিনের জন্য।"

"ঠিক কথা" বেঁটে লোকটি অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল। "খদ্দের আরো বাড়বে অদূর ভবিষ্যতে, আর এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে কেউ ধরতেও পারবে না। কারন, সবাই বিশ্বাস করে নিচ্ছে যে সে অন্য এক জগতে পৌঁছে গেছে, তাই কেউ আর মুখ খুলবে না। আসল কথাটা হলো, এসব গল্প অন্যের কাছে বললে যে তাকে নিয়ে চরম খিল্লি হবে, সেই বোধটুকু তো আছে।"

"টাইম-স্পেস চ্যানেল" – হাসতে হাসতে সেই "বন্ধু" বলে উঠল। পাতি চ্যালাকাঠের দরজা, সায়েন্স ফিকশন সিনেমার কিছু ক্লিপিং – তোমার কি মনে হয়না, এটা একটা দুর্দান্ত আইডিয়া? দরজার সামনে গুরুত্ব সহকারে দাঁড় করানো – অজ্ঞান করার একটা গ্যাস আর একটা কম্পমান যন্ত্র ব্যাবহার করে প্যাসেজের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করা, আর যখন তারা অন্য দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন ভেবে নেয় অন্য দুনিয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছে। কি সব লোক মাইরি। সেই ঘুরে ফিরে একই ঘরে ঢুকছে আর এদিকে কিস্যু বুঝতে পারছে না। আরে বুঝবেটাই বা কি করে, তিনটে দরজার দুটো তো ততক্ষনে পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলেছি আমরা। আর শুধু এইটুকুই চাই তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে যে তারা অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। না কেউ সন্দেহ করে, না কেউ নজর করে।"

"কিন্তু বন্ধু", চাপা স্বরে সেই বেঁটে লোকটি অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল, "একটা জিনিস আমাকে একটু ভাবাচ্ছে....."

"আরে, বস বলেছে এরকম আরও শাখা সে পৃথিবী জুড়ে খুলতে চায়।" "বন্ধু" বেশ ভারিক্কি চালে বলে উঠল, "যতদিন খদ্দের আসছে, ততদিন ডলার। এখন সারা দুনিয়া জুড়ে চারশ' এর ওপর শাখা আছে, এবং আরো আসবে। কিসের অ্যাতো চিন্তা তোমার?"

"সেদিন হেড অফিসে গিয়ে একটু সংখ্যাতত্ত্বে চোখ বোলাচ্ছিলাম", সেই বেঁটে লোকটি ভুরু কুঁচকে বলল, "একটার পর একটা খদ্দের কেবল তিন নম্বর দরজাটাই পছন্দ করেছে। কিন্তু কেন? এখানেও সেই এক গল্প – সবাই একটু ইতস্তত করে তিন নম্বরেই যেতে চায়।"

বন্ধু হেসে বলল, "তাতে এটাই প্রমান হয়, যে, লোকে যাই বলুক, ধ্বংসের দিকে মানুষের একটা স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁক আছে। যতই তারা মুখে বিশ্বশান্তি, মনুষ্যত্বের বুকনি দিক না কেন, মনে মনে সবাই এই পৃথিবীর ধ্বংসই দেখতে চায়, সাক্ষী থাকতে চায় সেই নাটকীয় অন্তিম মুহূর্তের। সেই একভাবে জীবনের জোয়াল টানার থেকে, সবার সঙ্গে যন্ত্রনাহীন ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতে চায়। মানুষ শালা ভেতর ভেতর হেবী লুচ্চা – উঁকি মারার স্বভাবটা ছাড়তে পারে না। নিজের এই কামুক ইচ্ছে চরিতার্থ করতে, অন্যের জীবনে উঁকি সে মারবেই, তাতে দুনিয়া রসাতলে যাক। তা - সে যা ইচ্ছে করুক, আমাদের কি? ব্যাটারা বহুদিন পর, মানে বছর দশ বারো পর বুঝবে যে এসব ফাঁকি – তাই না?"

"কিন্তু বন্ধু", শূন্য দৃষ্টিতে বেঁটে লোকটি বলে চলল, "শুধু আমাদের এই দোকান থেকেই, প্রায় হাজার খানেক লোক বেরিয়েছে, যারা সবাই ঐ তিননম্বর দরজা দিয়েই গেছে। আগামী বছর গুলোতেও এই সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু এই হারে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে দুনিয়ার কি হবে ভেবে দেখেছো? যারা বিশ্বাস করে যে এক যুগের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, এরকম লোকের সংখ্যা যদি এভাবে ক্রমশই বেড়ে চলে? জানো, আমাদের খদ্দেরের মধ্যে, কত অফিসার, সরকারী কর্মচারী, এবং রাজনীতিবিদ আছেন....."

লেখক পরিচিতিঃ সাকিয়ো কোমাৎসু – (১৯৩১ – ২০১১)

জাপানের অন্যতম বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান গল্পকার। ভদ্রলোক জাপানের ওসাকাতে জন্মগ্রহন করেন, এবং কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতালিয়ান সাহিত্যে স্নাতক হন। তাঁর লেখালেখি মূলত শুরু হয় ১৯৬০ এর দশক থেকে কোবো আবে- এর রচনা এবং ইতালিয়ান সাহিত্য পড়াশোনা করে। ক্রমশ কোমাৎসুর ধারণা জন্মায়, যে আধুনিক সাহিত্য এবং কল্পবিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। কোমাৎসু সারা জীবন লিখেছেন প্রচুর, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে জাপানের ওপর পারমাণবিক আক্রমণের অভিশাপ। তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না, ঐ ধ্বংসের পরে লুটিয়ে পড়া জাপান যে একসময় উন্নতির মহাশিখরে উঠবে তাই নিয়ে তিনি লিখে গেছেন তাঁর কল্পবিজ্ঞান। জীবনে বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন, তার মধ্যে ১৯৮৫ সালে Nihon SF Taisho Award তাছাড়া ২০০৭ সালে ইয়োকোহমাতে অনুষ্ঠিত ৬৫ তম বিশ্ব কল্পবিজ্ঞান

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সম্মেলনে তিনি জাপানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১১ সালে, আশি বছর বয়সে, নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

ইংরেজি অনুবাদ - **সিরো তোমুরা ও গ্রানিয়া ডেভিস**

বাংলা অনুবাদ - **সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়**

অলঙ্করণ: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অধিভৌতিক গল্প:

গতকাল জিনিসটা মোটা টাকার বিনিময়ে তুলে দিয়েছি মিঃ রঘুনাথান-এর হাতে। সেটি কি জিনিস তা সমঝদার কেউ শুনলে হয় আমাকে পাগল ভাববে নতুবা শুধুই এক শখের কালেক্টর ভেবে নেবে যে কিনা এরকম একটি দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য জিনিসের কদর করতে শেখেনি। ভালো দাম পেয়েছি কি বেচে দিয়েছি! আসলে এরকম একটি 'অ্যান্টিক আইটেম' নিজের সংগ্রহে রাখার আগে সে সম্বন্ধে যে বেশ খানিকটা পড়াশোনার প্রয়োজন হয় তা কম বেশি সকলেই মানবেন। তারপর অনেক তত্ত্ব-তল্লাশ করে, বিভিন্ন নামীদামী অক্শান হাউসের চক্কর কেটে, প্রয়োজন পড়লে ভিনদেশে পাড়ি জমিয়ে অর্থের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি হাত করা সম্ভব হয়। কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটে। অনেক সময়ই দুর্ঘটনাবশত কিছু মহামূল্য জিনিস কারোর কারোর হাতে চলে আসে। তার জন্য না লাগে পড়াশোনা, না সেটি ব্যবহার করার যোগ্যতা। আবার পুরনো জিনিস পেলে অনেক অর্থবান ব্যক্তিই ঘর সাজাতে অনেক কিছু কিনে রাখেন। আমি স্বভাবত এই ব্যতিক্রমীদের দলে পড়ি না। আবার জ্ঞানগম্ভীর এক দুঁদে কালেক্টরও যে আমি নই একথা সত্য। কিন্তু আজ আমি আমার যথেষ্ট সময় ও অর্থব্যয়ে অর্জিত 'এহল্লাই কে ওয়ান মডেল সিক্সটেন'-কে হাতছাড়া করতে একপ্রকার বাধ্যই হলাম।

ঘটনাটা খুলে বলি। একজন ফিল্ম স্টাডিজ্ মেজর কোর্সের ছাত্র হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক; এমনটা প্রথমেই ভেবে নেবেন না। স্থিরচিত্র এবং চলচ্চিত্র - এই দুইয়ের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ একেবারে ছোট বয়স থেকে। আমার বাবা একজন প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার হয়ে অনেকদিন এডিটরিয়্যাল ফোটোগ্রাফারের চাকরি করেছেন। তাঁর দৌলতে ছোট থাকতেই আমি নানা প্রকারের ক্যামেরা নেড়ে ঘেঁটে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাবা ধৈর্য সহকারে আমাকে সেগুলির 'কনভার্জিং লেন্স টাইপ' কিংবা 'শাটার মেকানিজম্' বুঝিয়ে দিতেন। পুরনো ক্যামেরার প্রদর্শনীতেও আমাকে নিয়ে গিয়েছেন অনেকবার। কাজেই এই 'ক্যামরা অবস্কিউরা'-এর প্রতি আমার একাত্মতা বহুদিনের।

মাস খানেক হল আমি দেশে ফিরেছি। তার আগে অ্যাকাডেমি অব আর্ট ইউনিভার্সিটির ফিল্ম স্কুলের পক্ষ থেকে একটা আট মাস ব্যাপী ওয়ার্কশপের কাজে প্রথমে হ্যানোভার ও তারপর উলভ্স্বুর্গে আমাদের থাকতে হয়েছিল। নিডাজাক্সেন (Niedersachsen) উত্তর জার্মানির বুন্দেসল্যান্ড। ইংরেজরা এই ডিসট্রিক্টকে লোয়ার স্যাক্সনি বলে থাকে। হ্যানোভার আর উলভ্স্বুর্গ এই ডিসট্রিক্টেরই দুটি নামকরা শহর। আমরা হ্যানোভারে বেশিদিন থাকিনি। তিনটে ছোট ডকুমেন্টারি শুট করে সোজা চলে এসেছিলাম উলভ্স্বুর্গে। এখানে এপ্রিল মাসের আবহাওয়া দারুণ মনোরম। ঝকঝকে রোদের সঙ্গে নিরন্তর মৃদুমন্দ বাতাসের আনাগোনা, খুব বেশি হলেও তাপমাত্রা বারো তেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের অধিক নয়। এই শহরে জার্মানির সব থেকে বড় অটোমোবাইল হাব অবস্থিত। সেই আওতোস্টাটের এঞ্জিনিয়ার আর মেকানিকদের কর্মজীবন নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি শুট করা হবে, এমন স্থির হয়েছিল।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

চারটি আলাদা দল তৈরি করে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। রেচেল, ব্যাল্‌ড্রিক, ভন আর আমি - এই অন্তরঙ্গ চার বন্ধু মিলে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং গল্পের ন্যারেশান লেখার কাজ জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। বিকেলটা ঘুরতে বেরোই এদিক ওদিক, সন্ধ্যায় বিয়ার পাব থেকে বিয়ার পান করে হোটেলে ফিরি। ফ্যাকাল্টি বিদ্বজনেরা ক্যালিফোর্ণিয়ান এবং ভীষণ ভালো মনের মানুষ, ইংরেজদের মতো ছোটখাটো ব্যাপারে ডিসিপ্লিন নিয়ে বজ্র আঁটুনির ফাঁস লাগিয়ে দেননি। তাছাড়া ব্যাল্‌ড্রিক জার্মান ছেলে, ও থাকলে স্থানীয় লোকজন, দোকানদার বা পাবের বারটেন্ডারদের সঙ্গে কথোপকথনের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি সুবিধে পাওয়া যাচ্ছিলো। যদিও ইংরেজিটা এখানে অনেকেই ভালো বোঝে কারণ প্রায় সারাবছরই টুরিস্টদের ভিড় লেগে থাকে উল্‌ভ্‌স্‌বুর্গে। একদিন ঠিক হল কুন্‌ষ্টমুজিয়মে যাওয়া হবে। এখানকার নামকরা আর্ট গ্যালারী। ফোক্সভাগেনের তরফ থেকে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে টেক্সটাইল আর্টের ওপর।

বিকেল সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা চার বন্ধু বেরিয়ে পড়লাম কুন্‌ষ্টমুজিয়মের উদ্দেশ্যে। এখানে বছরের এই সময়টায় প্রায় আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত সূর্য থাকে। কাজেই আমরা দিব্যি আলোতে হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনশো তিরাশি নম্বর বাসে চড়ে বসলাম। তারপর মসৃণ ব্যের্লিনার রিং ধরে এগিয়ে আমরা মিনিট পনেরোর মধ্যে লিওনার্দো হোটেলের সামনে এসে নামলাম। সেখান থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই আর্ট গ্যালারী। ভন আমাদের মধ্যে সবথেকে বেশি লম্বা। হাঁটতে হাঁটতে ও কিঞ্চিত এগিয়ে গিয়েছিল আমাদের থেকে। আমি রেচেলের সঙ্গে আমার নতুন কেনা 'নাইকন ডিএইটটেন এফএক্স'-এর কিছু ফিচার নিয়ে আলোচনা করতে করতে এগোচ্ছিলাম। ব্যাল্‌ড্রিক ধূমপায়ী, সিগারেট জ্বেলে আমাদের পাশে পাশে চলেছে। আর্ট গ্যালারীর সামনে এসে পড়তে দেখলাম ভন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কাছে এসে বলল –

-"ইটস্‌ গনা বি কুল। আই গট দ্য টিকেটস্‌, হিয়ার..."

তারপর সময় মতো ঢুকে পড়লাম প্রদর্শনীর হলঘরে। নানারকম রংবাহারি কাপড় ও কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানানো জিনিসের সম্ভার রীতিমত চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ফোটোগ্রাফির শখেই ছবি তুলতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ ভন আমায় ডেকে ফিসফিস করে বলল –

-"লুক দেয়ার জ্যামি বয়, হি গট অ্যা রিয়্যাল বিউটি, ডাসেন্ট হি...!!"

আমি ভ্রু কুঁচকে সামনে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য কিছু খুঁজে পেলাম না। কিন্তু তারপরই জিনিসটাতে চোখ পড়তে একেবারে থ হয়ে গেলাম। এক বৃদ্ধ আর্টপ্রেমীর গলায় ঝুলে থাকা ব্রাউন ক্যাম্বিসের কভারের মধ্যে থেকে যে যন্ত্রটির কেবলমাত্র সামনের অংশটুকু উঁকি দিচ্ছে, সেটি কি আসল না আসলের মতো দেখতে এই ধন্দে মনটা তোলপাড় করে উঠলো। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে এগিয়ে যেতে লাগলাম বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে। দু'পা এগোতেই স্পষ্ট চোখে পড়ল যন্ত্রটির গায়ে রোমান হরফে লেখা রয়েছে 'Rolleiflex'। একপ্রকার ধেয়ে এসে ওনাকে পাকড়াও করলাম।

-"এক্সকিউস মি স্যর, ইস ইট দ্য অরিজিনাল এহল্লাই?"

আমার সটান প্রশ্নটি শুনে বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে তাকালেন আমার দিকে। আর তাঁর সেই তাকানোর ভঙ্গি দেখে আমার মনেও সন্দেহের উদ্রেক হল যে ইনি আদৌ ইংরেজি বোঝেন তো? আমি দেরী না করে ইশারায় ব্যাল্‌ড্রিককে কাছে আসতে বললাম। ওদিকে রেচেল আর ভনও সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল আমার ওপর। ব্যাল্‌ড্রিকের সঙ্গে ওরাও এগিয়ে এলো। আমি ব্যাল্‌ড্রিককে বললাম –

-"আস্ক হিম্‌ অ্যাবাউট হিস্‌ ক্যামরা। ইস ইট দ্য অরিজিনাল ওয়ান?"

ব্যাল্‌ড্রিক ক্যামেরাটা ভালো করে দেখে বেশ উৎসাহিত হয়ে বৃদ্ধকে জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলে –

-"ইষ্ট এস উশপুয়ম্লিএখ্‌ এহল্লাই?"

বৃদ্ধের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠলো। গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটিকে একবার হাতের দোলায় নাচিয়ে আমাকে ও বোধকরি বাকিদেরকেও অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন –

-"অ্যাম্‌ অ্যাফ্রেইড ইটস্‌ নট মাই ডিয়ার।"

হতাশ হলাম শুনে। আসল এহল্লাই নয় তবে এটা! কিন্তু দেখতে হুবহু একরকম। যদিও এজিনিস স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমার আগে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কখনোই হয়নি। তবুও ছবিতে যতটুকু খুঁটিয়ে দেখেছিলাম অবিকল সেরকম দেখতে। বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম –

-"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড স্যর, উড ইউ প্লিজ শো ইট টু আস? অ্যাকচুয়্যালি উই আর ভেরি ফন্ড অফ ভিন্টেজ ক্যামরাস্ অ্যান্ড উই আর দ্য স্টুডেন্টস অফ এ.এ.ইউ.।"

বলেই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ইউনিভার্সিটির আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখালাম। এরপর বৃদ্ধ চকিতে আমাদের চারজনের ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাসিমুখে আমায় বললেন –

-"শিওর আই উইল সান্। বাট নট টুডে। টুমরো ফাইভ পিএম অ্যাট মাই প্লেস্। হিয়ার, টেক মাই কার্ড।"

কার্ডটা হাতে নিতেই বৃদ্ধ 'সো লং' বলে অন্য ঘরে চলে গেলেন। দেখলাম কার্ডে নাম লেখা ব্যেয়ানহাড ক্রিমা (Bernhard Krämer)। পেশায় আর্টিস্ট। কিন্তু ঠিকানাটা উলভ্স্বুর্গের কোন জায়গার নয়। ফালাস্লিবা স্তাশা, বহ্নশোয়াইগ। মনটা দমে গেলো।

হোটেলে ফেরার পথে আজ আর মদ্যপান করলাম না। মাথায় নানারকম চিন্তার স্রোত বইছে। একবার মনে হচ্ছে কাজ ফেলে বহ্নশোয়াইগ যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আবার পরক্ষণেই ওরকম একটা ক্লাসিক ক্যামেরা স্বচক্ষে দেখার লোভ আমাকে গ্রাস করে ফেলছে। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে রেচেল আমার মানসিক অবস্থাটা আন্দাজ করে কাছে এসে বলল যে এটা নিয়ে এখনই এতকিছু ভাবার দরকার নেই, ঠিকানা যখন রয়েছে তখন পরেও খোঁজ করে দেখা যেতে পারে। আর এই ক্যামেরাটি নিয়ে তার আগ্রহও কিছু কম নয়। কিন্তু এতেও আমার মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হল বলে অনুভব করতে পারলাম না।

রাতে বেশিক্ষণ লেখালিখি করলাম না। ল্যাপটপে ইন্টারনেট ঘেঁটে অরিজিনাল এহল্লাই সম্বন্ধে নানা তথ্য খুঁজে পড়লাম। এর ছবি আমি আগেও দেখেছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেগুলিও অরিজিনাল এহল্লাই নয়। কারণ এই ক্যামেরা প্রস্তুতকারক সংস্থা 'ফাঙ্কে উন্ট হাইডেকা' ১৯২৮ সালে অল্প কিছু প্রোটোটাইপ তৈরি করার পর মাত্র চারবছর অরিজিনাল এহল্লাই তৈরি করে, ১৯২৯-১৯৩২ পর্যন্ত। 'ওয়ার ফোটোগ্রাফি' বা যুদ্ধের ছবি তোলার আলাদা দিক খুলে দিয়েছিল এই ক্যামেরা। আর এখন এজিনিস যে কতটা দুর্লভ সেটা আলাদা করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। মনের গভীরে যে দ্বন্দ্বের ঝড় উঠেছিল সেটা মনে হল যেন শান্ত হয়েছে। নৈশভোজ সেরে শোয়ার আগে ওয়ালেট থেকে কার্ডটা বের করে নাইটল্যাম্পের নীচে ধরে ফিসফিস করে বললাম "সি ইউ টুমরো মিঃ ক্রিমা।"

পরের দিন সকাল থেকে দৈনিক রুটিন মেনেই সব চলছে। আওতোস্টাটে যাওয়ার কথা উঠলে আউটডোর শ্যুটের কাজ ভনের ওপর চাপিয়ে আমি ন্যারেশান লেখা শেষ করার ভার নিয়ে নিলাম। শ্যুটে গেলে আর দেখতে হবে না, বিকেল গড়িয়ে যাবে। আজ বিকেল পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কোনক্রমে সেটা বিঘ্নিত হয় সে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। রেচেলকেই প্রথম জানালাম যে আজ বহ্নশোয়াইগ যাওয়া হচ্ছে। অনুরোধ করে বললাম সে যেন ভনকে একটু বুঝিয়ে বলে। কারণ আজ অন্তত ওর পক্ষে আমাদের সঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রেচেল আমায় অবাক করে হাসিমুখে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে জানালো তার পক্ষেও আজ কাজ ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলাম। সঙ্গী না পেলে তো মুশকিল! একা অতোদূরের অজানা-অপরিচিত একজনের বাড়ি ধাওয়া করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে!

সকাল দশটা নাগাদ কিছু দরকারি জিনিস গুছিয়ে ব্যাকপ্যাকে ভরে নিচ্ছিলাম। মনকে পুরোপুরি তৈরি করেছি, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। এমন সময়ে দেখলাম ব্যাল্ড্রিক হাতে একটা ট্রিপড্ নিয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় বেরচ্ছে। ওকে আটকালাম। তারপর খুব কম সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা ওকে বললাম। সব শুনে ও এককথায় আমার সঙ্গে যেতে রাজি হল। আমার এই আকস্মিক পাগলপনায় দোসর হিসেবে ব্যাল্ড্রিকের মতো একজনকে পাওয়াই স্বাভাবিক। খাঁটি জার্মান রক্ত কিনা! ইতিহাস সাক্ষী এই রক্তের নির্ভীকতা ও কাঠিন্যের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তবে ওকে আপাতত ভনের সঙ্গে যেতে হবে। কাজ সেরে ঠিক সময়মত সে ফিরে আসবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাজে মন দিলাম।

সময় যত এগিয়ে আসছে আমার উত্তেজনাও ক্রমে বেড়ে চলেছে। খোঁজ করে জানলাম গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সোয়া ঘণ্টা মতো সময় লাগবে। লাঞ্চ সেরে ভনকে ফোন করলাম। ওই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিল ক্যামেরাটির দিকে। এভাবে ওকে না বলে যাওয়াটা খুবই অন্যায় হবে মনে হল। তাই ফোন করে ওকে সব বললাম আর এও বুঝলাম ব্যাল্ড্রিকের কাছে ও কিছুটা শুনেছে। খুব আনন্দের সঙ্গেই আমাকে উৎসাহিত করলো ভন। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না বলে যে আমার কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই সে আশ্বাস দিয়ে ও জোর গলায় বলল – "ওহ কাম অন বাডি,

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

গো অ্যান্ড বাই দ্যাট্ ব্লাডি ক্যামরা, উইল ইয়া... ইট্স আ হেল অফ অ্যান্ আইটেম টু কালেক্ট।" ঈষৎ হেসে আমি মনে মনে বললাম অরিজিনাল মডেলটা পেলে কেনার চেষ্টা করতাম বইকি! কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মডেল কিনতে যাওয়ার এখনই কোন ইচ্ছে আমার নেই। তবে হ্যাঁ, অনুমতি পেলে ভালো করে নেড়ে ঘেঁটে দেখে আসবো আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু ছবিও তুলে আনবো। খুব রেয়ার না হলেও এই মডেলও যে যার-তার গলায় ঝোলে না তা বলাই বাহুল্য।

দুপুর তিনটে বেজে দশ মিনিটে ব্যাল্ড্রিক ফোন করে জানালো সে হোটেলের বাইরে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ব্যাকপ্যাকটা পিঠে চড়িয়ে বেরতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি যে ভাবলাম পরিষ্কার করে আমি নিজেও বুঝে উঠলাম না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কারচুপি বোধহয় একেই বলে। ধাঁ করে আবার ঘরে ঢুকে আমার লকার থেকে এক তাড়া ইউরো বের করে সযত্নে সেটা ব্যাগে পুরলাম। কত নিলাম গোনার প্রয়োজন বা সময় কোনটাই ছিল না। ভনের দেখানো সেই প্রলোভন যে এড়িয়ে যেতে পারিনি তা স্পষ্ট হল। যথেষ্ট পাথেয় থাকা সত্ত্বেও বাড়তি অর্থ সঙ্গে নেওয়া তারই প্রমাণ বটে। যদিও মস্তিষ্ক বলছে বৃদ্ধ সেজিনিস হয়তো বিক্রি করবেন না, তবু অফার করে দেখা যেতেই পারে। ক্যামেরাটি কমপক্ষে সত্তর পঁচাত্তর বছরের পুরনো তো হবেই।

(২)

আজ আর পাব্লিক ট্রান্সপোর্ট ধরার ইচ্ছে ছিল না। তাই দুই বন্ধু মিলে একটা ভাড়ার গাড়িতে চেপে বসলাম। ব্যাল্ড্রিক আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। কৌতূহলবশত কি ব্যাপার জানতে চাইতে অবশ্য হোঁচট খেয়ে কোনরকমে বলল যে সে এই আকস্মিক অ্যাডভেঞ্চারের জন্য আমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই সাফাই আমার ঠিক হজম হল না। এক হুজুগে ভারতীয়র কাণ্ডকারখানায় যে সে বেশ কৌতুকান্বিত হয়েছে তা ওর মুখাভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। তবু দমে না গিয়ে এটাকে নিজের অসামান্য প্রগলভতা গণ্য করে মনে মনে উচ্ছ্বসিত হয়েই রইলাম। ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়ানো যে মোটেই পাগলামি নয় সেটা ব্যাল্ড্রিক নিজেও জানে বলে আমার বিশ্বাস।

হেমস্টেটা হাইওয়ে ধরে বহ্ন্শোয়াইগে ঢুকে বেলা ঠিক সাড়ে চারটের সময় ফালাস্লিবা সড়কে এসে নামলাম। বেশ জনবসতিপূর্ণ স্থান এটি। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যাও অনেক বেশি। ব্যাল্ড্রিক আমাকে নিয়ে চলল নির্দিষ্ট ঠিকানার উদ্দেশ্যে। কিছুটা হেঁটে একটা হেয়ার ড্রেসিং পার্লারকে টপকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। সুন্দর কাঠের গেটের ওপারে ছোট্ট একটা বাগান। আর তারপরেই দোতলা টালি বসানো ছাই রঙের বাড়ি। বাড়ির দেওয়াল, জানালা-দরজা এসব দেখে তার বয়স আন্দাজ করার মতো অভিজ্ঞ আমি মোটেই নই, তাই সে ব্যাপারে দুজনে আর আলোচনায় গেলাম না। গেটের পাশে আটকানো রয়েছে একটি ডাকবাক্স এবং এই বস্তুটি যে খুব একটা নতুন নয় সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। দেখলাম তাতে লেখা W. Krämer। তখনও পাঁচটা বাজতে মিনিট কুড়ি বাকি। দুজনেই এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। এই লেনটা বেশ ফাঁকা। তবে কোথাও বসবার মতো ব্যবস্থা নেই। রাস্তার দুপাশে পরপর বাড়িগুলির কয়েকটির সামনে গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। আমরা মিঃ ক্রিমারের বাড়ির সামনে দাঁড়ানো গাড়িটা বেশ পুরনো দেখে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। আশানুরূপভাবে সে গাড়িতে টাচ সেন্সিং অ্যালার্ম না থাকায় বিকট কোন শব্দ বেজে উঠলো না।

তারপর যখন পাঁচটা বাজতে মিনিট তিনেক বাকি সেইসময় গেট খুলে ভিতরে ঢুকে সবুজ লন পেরিয়ে সদর দরজার সামনে এসে 'ডোর নকার' ঠুকে দিলাম বার দুয়েক। মুহূর্তকাল পরে নীলবর্ণ ডিয়েন্ডে (Dirndl) পরিহিতা এক বৃদ্ধা দরজা খুলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি ও ব্যাল্ড্রিক সহাস্যে একবার মাথা নেড়ে অভিবাদন করে একেবারে দেশীয় কায়দায় একটি চিরকুট ধরিয়ে দিলাম বৃদ্ধার হাতে। কাগজটিতে একবার চোখ বুলিয়ে স্মিত হাসিমুখে তিনি আমাদের ভিতরে আসতে বললেন। আমরা একসঙ্গে প্রবেশ করলাম। তারপর বড় হলঘরটির এদিক-সেদিক চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম, ঠিক যেমনটা আশা করেছিলাম তেমনই। বৃদ্ধ নিজেও যেমন আর্টিস্ট, তাঁর আর্ট কালেকশানও প্রচুর। নানারকম ছবি, ছোট-বড় মূর্তি, ঘড়ি, ফুলদানি এবং আরোও কত কি রয়েছে এই একটি ঘরে! তবে সেগুলির দাম বা তাদের প্রাচীনত্বের খুব একটা সঠিক ধারণা যে আমার নেই একথা স্বীকার করে নিতে আমি লজ্জাবোধ করি না। বাড়ির একতলায় দেখলাম কোন ঘর নেই। পুরোটাই বৈঠকখানা যা বেশ কিছু দামি আসবাবপত্রে সজ্জিত। বৃদ্ধা আমাদের দুজনকে বসতে বলে দোতলায় উঠে গেলেন। আমরা ঘরটির মাঝামাঝি রাখা একটি ডিম্বাকৃতি সোফাসেটে বসে রইলাম মিনিট পাঁচেক।

তারপর দোতলার একটা ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেয়ে আমরা দুজনই উঠে দাঁড়ালাম আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ক্রিমা বেরিয়ে এসে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হাসিমুখে দুহাত ছড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন ও সেই সঙ্গে আমাদের ওপরে চলে আসতে বললেন। আমরা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতেই তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন বাঁদিকের একটি ঘরে। এটিকে স্টাডি বা লাইব্রেরীও বলা চলে। চারপাশে দেওয়াল জুড়ে বইপত্র বোঝাই আলমারির সারি। মাঝে চতুষ্কোণ একটি টেবিল ও গোটা চারেক গদি লাগানো আর্মচেয়ার। আমাদের সেখানে বসতে বললেন মিঃ ক্রিমা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে বললেন "ইউ আর ইন্ডিয়ান, রাইট?"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করতে করতে নিজের নাম বললাম। ব্যাল্‌ড্রিক ওদের মাতৃভাষায় বেশ কিছু কথা বলল বৃদ্ধের সঙ্গে। আমার একটু অধৈর্য লাগছিলো। যে উদ্দেশ্যে আসা সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি বললাম –

-"ওয়েল স্যর, উই আর হিয়ার টু টেক আ গুড লুক অ্যাট্ দ্যাট্ প্রেশাস ওয়ান উই সও ইয়েস্টারডে।"

বৃদ্ধ হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন –

-"অফ কোর্স মাই ফাইন ফেলোও... বাট বিফোর দ্যাট্, উড ইউ লাইক টু হ্যাভ সামথিং?"

আমরা দুজনই মানা করলাম। খানাপিনা কি জিনিস তখন ভুলে গিয়েছি আমি। বৃদ্ধ আর সময় নষ্ট না করে আমাদের নিয়ে গেলেন আরেকটি ঘরে। এই ঘরটি এবাড়ির বাকি যে দু-তিনটি ঘর আমরা দেখলাম তার থেকে একদম আলাদা। ঘরের এক কোণে একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে একটি কাঠের চৌপায়া রাখা এবং সেটি একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। সারাটা ঘর ধুলোর আস্তরণে আবৃত আর ঘরের চারদিকের দেওয়ালে দেখলাম একরকম কালচে অমসৃণ কাগজ সাঁটানো। এরকম অদ্ভুত ওয়ালপেপার আমি আগে কোথাও দেখিনি। বৃদ্ধ আমাদের সেখানে দাঁড়াতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা ঘরটির ওই এক জায়গায় দাঁড়িয়েই এদিক ওদিক দেখছিলাম। একটা স্কাইলাইট রয়েছে ঘরের উত্তর দিকের ছাদে, সেখান থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। ভদ্রলোক বড্ড দেরী করিয়ে দিচ্ছেন ভেবে মনে মনে একটু বিরক্তই হচ্ছিলাম। আসল জিনিসের দেখা নেই, এঘর সেঘর ঘোরাচ্ছেন কেবল। দেখলাম ব্যাল্‌ড্রিকেরও মুখ ব্যাজার হয়ে আছে, ধুলোবালিতে কার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে রাগ না হয়! এমন সময় বৃদ্ধ আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াতেই আমরা ফিরে তাকালাম। আরিব্বাস! এই তো বৃদ্ধের গলায় ঝুলছে সেই এক ঝলক দেখা বাদামি রঙের ক্যাম্বিসের কভারে ঢাকা আমার সাধের ও স্বপ্নের ভিন্টেজ এহল্লাই। এটি বাইরে থেকেই যদি নিয়ে এলেন তবে এমন অপরিষ্কার ধুলোয় আচ্ছন্ন ঘরে ডেকে এনে সেটা দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল সেসব ভাবনা তখনও আমার মাথায় আসে নি। কতক্ষণে জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখবো সে চিন্তায় তখন আমার মন ব্যাকুল।

এরপর বৃদ্ধ ক্যাম্বিসের কভার থেকে সন্তর্পণে ক্যামেরাটি বের করে এনে আমার দিকে তুলে ধরলেন। ব্যাল্‌ড্রিকের মুখ থেকে বিস্ময়জনক একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। সত্যিই ভনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার তারিফ করতে হয়। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চি, ডুয়াল জাইস টেসার লেন্স ও কম্পুর র‍্যাপিড শাটার বসানো আক্ষরিকভাবেই 'আ রিয়্যাল বিউটি'। বৃদ্ধ দেখিয়ে দিলেন যে এই ক্যামেরার ডান দিকে একটা 'উইন্ডিং ক্র্যাঙ্ক' লাগানো রয়েছে যা কিনা দ্রুত শাটার কক করে ছবির 'ডাব্‌ল এক্সপোজার' হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। ঠিক তাই, এটাই বৈশিষ্ট্য এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলটির। অরিজিনাল মডেলে এই উইন্ডিং লিভার নেই। পরবর্তীকালে মডিফাই করা হয়েছে। উন্নত আরো বেশ কিছু ফিচার আছে এতে। ক্যামেরাটির ফোকাস টেকনোলজিও বৃদ্ধ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। এরপর ক্যামেরাটি হাতে নিলাম। ব্যাল্‌ড্রিক আমার কানে ফিসফিস করে বলল 'স্টলজ্ এর ডয়েটসেন' যার অর্থ জার্মানদের গর্ব। আলবাত!

ক্যামেরাটি হাতে পাওয়ার পর মনে হল এবার একটু কোথাও বসতে পারলে হয়। কারণ ভালো করে নাড়াচাড়া করার জন্যে একটা নিরাপদ জায়গা প্রয়োজন। হাতে করে দেখতে গিয়ে ক্যামেরাটি থেকে কিছু খুলে মেঝেতে পড়ুক তা আমি চাই না। ব্যাল্‌ড্রিকের হাতে ক্যামেরাটি দিয়ে আমি আমার নিজের ক্যামেরা বের করলাম। কিছুক্ষণের জন্য বৃদ্ধকে যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। ব্যাল্‌ড্রিকের হাতে ধরা অবস্থায় ছবি তুলে নিতে হবে। হঠাৎ মাথায় এলো ছবি তোলার অনুমতিটা নিয়ে নেওয়া দরকার। এটি যার ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁর মতামতই আসল। কিন্তু আমার কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ ঘরের যে কোণে কাঠের চৌপায়াটি রাখা সেখান থেকে বলে উঠলেন –

-"দিস ওয়ান ইস মোর প্রেশাস।"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

তাকিয়ে দেখি বৃদ্ধ কালো কাপড়ের ঢাকনাটি সরিয়েছেন। সেই চৌপায়াটি একটি পুরনো পিয়ানো। এটি যে ব্যবহার হয় না সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তা না হলে কি আর এমন অভাগার মতো তালাবন্ধ ঘরের এক কোণে পড়ে থাকে! কিন্তু চমক এই পুরনো পিয়ানোটি নয়। আসলটি হল পিয়ানোর ওপরে একটি কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা আরেকটি ভিন্টেজ এহল্লাই। এর কোন কভার বা বেল্ট কিছুই নেই। শুধু ক্যামেরাটি কাচের বাক্সের মধ্যে বসানো রয়েছে।

আমি দ্রুতপায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, এটিতে কোন উইন্ডিং লিভার নেই। অ্যাপেচার নবটার একদিক খানিকটা চেপ্টে গেছে আর এটি দেখতে আগের ক্যামেরাটি থেকেও বেশ পুরনো। আনন্দের আতিশয্যে প্রায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তবু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম –

-"ইস ইট দ্য অরিজিনাল ওয়ান?"

-"ইয়েস ইট ইস।"

আমার মনে এক অনাবিল প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল। ওঃ! বহ্‌নশোয়াইগ আসা এরকম অকল্পনীয়ভাবে স্বার্থক হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। এর জন্যে আমি এই ধুলোময়লার মধ্যে সারারাত কাটাতেও রাজি আছি। আমি আমার ক্যামেরাটা পুনরায় ব্যাগে পুরে অনুরোধ করে বৃদ্ধকে বললাম যেন একটিবার এই ক্যামেরাটি কাচের বাক্সের বাইরে বের করে এনে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আমার কথায় আমল দিলেন বলে মনে হল না। উল্টে আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন –

-"হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট অরিজিনাল এহল্লাই?"

আমি মোটামুটি যা জানি বললাম। ১৯২৮ সালের প্রোটোটাইপ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত তৈরি এহল্লাই অরিজিনাল মডেল যা এখন বেশ দুর্লভ ক্লাসিক ক্যামেরা বলেই গণ্য হয়। কিন্তু সব শুনেও বৃদ্ধ খুব একটা সন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমার মনে হল না। আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না উনি আর কি তথ্য জানতে চাইছেন। যাহোক, বার দুয়েক মাথা নেড়ে মিঃ ক্রিমা আরেকটি উদ্ভট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন –

-"হ্যাভ ইউ এভার হার্ড অ্যাবাউট বহ্‌নশোয়াইগা অ্যাল্গট্‌হম?"

আমার মুখ তির্যকভাবে বেঁকে গেলো। এটা আবার কি? ঘাড় নেড়ে জানালাম শুনিনি। তৎক্ষণাৎ ব্যাল্‌ড্রিক পাশ থেকে বলল যে এটি জার্মান কথা যার অর্থ বহ্‌নশোয়াইগের দুঃস্বপ্ন। নাঃ, তাও শুনিনি। বৃদ্ধ একবার ক্ষমার চোখে আমার দিকে তাকালেন আর তারপরই আমাদের অদ্ভুত একটা গল্প শোনালেন।

মিঃ ক্রিমার পিতা ওয়াইল্টা ক্রিমা (Walter Krämer) ছিলেন একজন জার্মান নাৎজি চিত্রসাংবাদিক। ১৯২৬ সালের ২৬শে অক্টোবর অ্যাডল্‌ফ হিটলার নাৎজি পার্টির বের্লিন শাখার 'গাউলাইটা' হওয়ার পরই ডাক পড়ে সিনিয়র ক্রিমার। হের হুগো ইয়েগা ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের কাছে ক্রিমার প্রশংসা করেছিলেন আর সেই জন্যেই তাঁকে একটি বড়মাপের দায়িত্ব সঁপা হয় পার্টির তরফ থেকে। তা ছিল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জার্মান প্রযুক্তিসম্পন্ন কিছু নতুন ধরনের ক্যামেরার খোঁজ করা। হিটলার তখন থেকেই প্রযুক্তিকে নিজের সবথেকে বড় হাতিয়ার করে ফেলেছিল। তাছাড়া একজন চিত্রসাংবাদিক হিসেবে কাজটি বেশ পছন্দও হয়েছিল সিনিয়র ক্রিমার। এরপর নানা জায়গা ঘুরে বেশ কিছু আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ক্যামেরা জোগাড় করে তিনি হিটলারের প্রিয়পাত্র হলেন। তবে খোঁজ করা তিনি সেখানেই বন্ধ করেননি, চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন তাঁর এক বন্ধুর মারফত খবর পেলেন, এই বহ্‌নশোয়াইগে পাউল ফাঙ্কে ও হাইনহোল্ট হাইডেকা নামের দুই ব্যক্তি এক বিশেষ প্রকার ক্যামেরা বাজারে আনতে চলেছে যার ফোকাসিং মেকানিজম্ বেশ আলাদারকম ডিসাইনে করা হয়েছে। তারপর ১৯২৮ সালের অগাস্ট মাসে হিটলারের ব্যক্তিগত সুপারিশে ক্রিমা এসে দেখা করেন হাইডেকার সঙ্গে। তাদের মধ্যে একটি বিশেষ চুক্তি হয় সেই মোলাকাতে। যার ফলস্বরূপ ওই বছরেরই নভেম্বর মাসের শুরুর দিকে হাইনহোল্ট হাইডেকা তাদের প্রথম 'ফাংশানাল প্রোটোটাইপ' মডেলটি দুশো হাইসমাকের (Reichsmark) বিনিময়ে বিক্রি করে ক্রিমার কাছে।

আমরা দুজনে বোকার মতো একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। বৃদ্ধ ক্রিমা যা শোনালেন তা কি বিশ্বাসযোগ্য নাকি অনভিজ্ঞ অল্পবয়সী দুজনকে পেয়ে স্রেফ গল্প ফেঁদে শুনিয়ে দিলেন তা নিয়ে রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। এই কাহিনী যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই ক্যামেরার

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ঐতিহাসিক মূল্য অনেক হওয়ার কথা। এভাবে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকার কারণ কি? ব্যাল্‌ড্রিক বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলো এটিই সেই প্রথম প্রোটোটাইপ মডেলটি কিনা। তাতে সহাস্যে উত্তর এলো –

-"ইয়েস, দ্য ফার্স্ট কে ওয়ান মডেল সিক্সটেন।"

হঠাৎ করেই যেন বৃদ্ধের সব কথা অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগলো। আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম যে আমার মনকে এসব বিশ্বাস করাতে পারলে আমার থেকে বেশি খুশী আর কেউ হবে না। তবুও কেন জানি না বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। কটাক্ষ করে এরকম একটি ঐতিহাসিক জিনিসকে এভাবে অনাদরে ফেলে রাখার কারণ জানতে চাইলাম। তার উত্তরে বৃদ্ধ ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন –

-"বিকওস ইট ইস হন্টেড অ্যান্ড ইট্‌স নেম ইস বহ্‌নশোয়াইগা অ্যাল্লট্‌হম।"

হন্টেড! অর্থাৎ ভূতুড়ে ব্যাপার! বেশ লাগলো কথাটা শুনে। ভূতেরা এখন মানুষজন ছেড়ে পুরনো ক্যামেরার ওপর ভর করছে এটা বেশ মজাদার ঘটনা। তা কিরকম সে ব্যাপার একটু খুলে জানতে চাইলাম। কিন্তু কিছু বলার আগে বৃদ্ধ কালো কাপড়ে আবার ক্যামেরাসহ পিয়ানোটা ঢেকে দিয়ে আমাদের সেই আগের ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে লাইব্রেরীতে চলে এলাম। ঘড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলাম বিকেল পৌনে ছ'টা। এঘরে এসে বসার মিনিট দুয়েকের মধ্যে সেই বৃদ্ধা আমাদের জন্যে কেক আর চা নিয়ে এলো ট্রে-তে করে। মিঃ ক্রিমাও এসে বসলেন একটি আর্মচেয়ারে। তারপর নিজে থেকেই বললেন ক্যামেরাটির গোপন রহস্যের কথা।

বৃদ্ধের পিতা মারা যান ১৯৭২ সালে। তার আগে পর্যন্ত ওই ক্যামেরাটিতে তিনি নাকি আর কাউকে হাত দিতে দেননি। এমনকি নিজের একমাত্র ছেলেকে পর্যন্ত নয়। তিনিই এর নামকরণ করেছিলেন বহ্‌নশোয়াইগা অ্যাল্লট্‌হম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক বছর পর কাগজে একটা প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিল এই নাম দিয়ে। দিন কয়েকের জন্য ক্যামেরাটি নিয়ে শোরগোল হলেও তারপর একেবারে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শেষ বয়সে যখন নিদ্রাহীনতার কারণে ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তিনি ছেলেকে অর্থাৎ বৃদ্ধকে ডেকে বলে যান এই ক্যামেরাটি যেন আর কোনভাবেই ছবি তোলার কাজে কখনো ব্যবহার না করা হয়। ওই কাচের বাক্সটিও পঞ্চাশের দশকে বানিয়ে এনেছিলেন সিনিয়র ক্রিমা। সেই থেকে ক্যামেরাটি বন্দী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে তাঁর ঘরে রাখা একটি স্বস্তিক চিহ্ন সম্বলিত ট্রাঙ্ক থেকে বেশ কয়েকটি ডায়েরী পাওয়া যায় যাতে তাঁর সারা জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুচারু বর্ণনা লেখা আছে। সেগুলি বৃদ্ধ বেশ ভালোভাবেই পড়েছেন এবং তিনিও তাঁর পিতার আদেশ মতো ক্যামেরাটি কখনো ব্যবহার করেননি।

মোটের ওপর দাঁড়ালো এই যে ক্যামেরাটির সঙ্গে বৃদ্ধের নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতাই নেই। সবটাই তাঁর পিতার গল্পের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অন্ধ বিশ্বাস। আশ্চর্য! এরকম মূল্যবান ও একই সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য একটি জিনিস ধুলোয় পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে কেবলমাত্র এক উদ্ভট পারিবারিক ফ্যান্টাসির জন্য। আমি তবু শান্তভাবে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম এই ক্যামেরাটির ভবিষ্যতের কথা। আগামী দিনে কি হবে, কোথায় যাবে, কে নেবে এর দায়িত্ব! উত্তরে তিনি ক্ষুণ্ণচিত্তে বললেন –

-"আই উইল বারি ইট বিফোর আই ডাই।"

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম –

-"হোয়াই? ইয়োর সান্ অর ডটার..."

আমার প্রশ্ন শেষ করতে না দিয়ে বৃদ্ধ বেশ ধমকের সুরে বলে উঠলেন –

-"ডোন্ট হ্যাভ এনি। হ্যাড আ সান্। হি ডায়েড ইন দ্য ক্যানাডিয়ান রকিস্।"

আন্তরিকভাবে দুঃখ জ্ঞাপন করলাম। বৃদ্ধ সুন্দর এক ভঙ্গিমায় হাত নাড়িয়ে দিলেন। এরপর আমার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করতে আর দেরী করলাম না। তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বললাম এই অমূল্য সম্পদটির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে আমি কতটা আগ্রহী এবং এর জন্য আমি আটশো ইউরো পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছি।

বৃদ্ধ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন যে তাঁর মূল্যের প্রয়োজন নেই। আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। ব্যাল্‌ড্রিকের দিকে তাকিয়ে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

দেখি সেও বেশ অবাক চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধ বললেন তাঁর বয়স তিয়াত্তর বছর, তাই খুব বেশি আয়ু অবশিষ্ট নেই। এর মধ্যে যদি তিনি তাঁর এই ক্যামেরাটির দায়িত্ব সঠিক কাউকে অর্পণ করে যেতে পারেন তবে এর থেকে বেশি কিছু চাহিদা তাঁর নেই। নতুবা তিনি যেমন ঠিক করেছিলেন তেমনটিই করবেন। বছর পনেরো আগে একজন এবাড়িতে এসে ক্যামেরাটি দেখে কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর রহস্যের ইতিহাস জানতে পেরে শেষমেশ আর কেনেন নি। ইতিহাসের পাতায় ও গল্পে লেখা জার্মানদের বীরত্বের কাহিনী বাস্তবের সঙ্গে ঠিক মিলছে না দেখে বেশ অবাক হচ্ছিলাম। হিটলার যুগের পর থেকে জার্মানদের সহজাত সাহসী মনোভাবে কোন ত্রুটি এসে পড়েছে কিনা সে ভাবনাও একবার মাথায় এলো।

যাইহোক, আমাকে আর বেশি জোরাজুরি করতে হল না। বৃদ্ধ রাজি হয়ে গেলেন। আচমকা ব্যাল্‌ড্রিক আমার কানের কাছে মুখ এনে নিচুস্বরে বলল, বৃদ্ধ না নিতে চাইলেও একটা কিছু দাম অন্তত সন্মানের খাতিরে যেন তাঁকে দিয়ে যাই আমি। সর্বান্তকরণে সহমত হলাম ব্যাল্‌ড্রিকের সঙ্গে। বৃদ্ধ অন্য ঘরে গিয়েছিলেন, কিছুক্ষণ পর এলেন। এসেই আমার পাশে বসে কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন –

-"প্রমিস্ মি ওয়ান থিং ডিয়ার, ইউ উয়োন্ট ইয়ুস ইট!"

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমি কিভাবে ওনাকে বোঝাবো যে তাঁর পিতার বলে যাওয়া গল্পে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস জন্মায়নি, বরং এর জন্য ক্যামেরাটির দুর্দশা দেখে বিরক্তই হয়েছি! আমার মাথায় এলো না। ভেবে দেখলাম এখানে আমাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতেই হবে। নচেৎ বৃদ্ধ একবার বেঁকে বসলেই সর্বনাশ।

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম যে ক্যামেরাটি ঠিক যে অবস্থায় আছে ঠিক সেভাবেই আমি রাখবো, কেবল মাঝে মধ্যে ধুলো ঝারার জন্যে বাক্স থেকে বের করতে হতে পারে। বৃদ্ধ সম্মতিসূচক মাথা ঝাকালেন। উঠে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানালাম। বৃদ্ধ আমাকে ফ্রেমবন্দী একটা পুরনো জার্মান কাগজের কাটিং এনে দেখালেন যার হেডলাইন মোটা হরফে লেখা 'Braunschweiger Alptraum', বাকিটা পড়তে পারলাম না। ব্যাল্‌ড্রিক হাত বাড়িয়ে চেয়ে নিল পড়ার জন্য। আমি ব্যাগ থেকে পাঁচশো ইউরো বের করে বৃদ্ধকে অনুরোধ করে বললাম তিনি যেন লিখিতভাবে ক্যামেরাটির মালিকানা আমার নামে করে দেন। বৃদ্ধ তাঁর নিজস্ব লেটারহেডে ইংরেজিতে লিখে দিলেন, যদিও এর আইনি গুরুত্ব তেমন কিছু নেই তবুও একটা প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখা ভালো। এরপর আমি তাঁকে জোর করে সামান্য কিছু মূল্য নিতে রাজি করালাম যা আক্ষরিক অর্থেই 'ফ্লক্সিনসিনিহিলিপিলিফিকেশান্' (floccinaucinihilipilification)।

তারপরের ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বিদায় জানিয়ে আমরা দুজনে একটা পিচবোর্ডের বাক্সে ক্যামেরাটিকে কাচের বাক্সসমেত ভরে সাড়ে ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম উলভ্‌স্‌বুর্গের উদ্দেশ্যে। গাড়িতে বসে ব্যাল্‌ড্রিকের কাছে জানতে চাইলাম জার্মান কাগজের লেখাটির ব্যাপারে। মোটামুটি ভূতুড়ে ক্যামেরা বলেই যে এর উল্লেখ রয়েছে সেটা জানালো ব্যাল্‌ড্রিক। কেন ভূতুড়ে বা কিভাবে হল এটি হন্টেড তার কোন উল্লেখ নেই। তবে এতে ছবি তুললে ভূতের ছবি ওঠে, এমনটা লেখা রয়েছে। দুজনে একচোট হাসাহাসি করে নিলাম। এরপর ভনকে ফোন করে জানানো হল সুসংবাদ। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা হোটেলে এসে পড়লাম।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই এ.এ.ইউ. এর সকলে এসে ভিড় করে ক্যামেরাটি দেখে গেলো। আমি অবশ্য এর ইতিহাস কাউকে বললাম না, ফ্যান্টাসি গল্পটি তো না-ই। সাফল্যের গৌরবে রাতের দিকে আমরা চার বন্ধু মিলে ছোটখাটো একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করে ফেললাম। খানাপিনা করতে করতে আমাদের চার জনের মধ্যে আলোচনা হল। সবটা শুনে ভন হাস্যকরভাবে বেশ কিছু ইংরেজি গালাগালি ছুঁড়ে দিল, তবে সেগুলি সিনিয়র না জুনিয়রের উদ্দেশ্যে ছিল তা ঠিক বোঝা গেলো না। রেচেল খুব বেশি কিছু বলল না। ও আগাগোড়া শান্ত স্বভাবের মেয়ে।

(৩)

এরপর দিন দশেক ব্যস্তভাবে কেটে গেলো। প্রতিদিনই ক্যামেরাটা ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখি। এখনো এর কার্যকারিতা বজায় আছে কিনা তা নিয়ে অবশ্য একটা আশঙ্কা রয়ে গেছে মনে। তবু এটিই আমার কাছে পরম প্রাপ্তি যে পৃথিবীর প্রথম এহল্লাই এখন শুধুই আমার সম্পত্তি। এর ঐতিহাসিক গৌরব চির অমলিন। মগ্নতার মধ্যেই ধীরে ধীরে ইচ্ছে জাগতে লাগলো ফিল্ম কিনে ক্যামেরাটি পরীক্ষা করার। ক্যামেরার পেছন দিকের কালোরঙ করা প্লেটটির জায়গায় জায়গায় রঙ চটে গিয়েছে। কিন্তু এর গঠন রীতিমত সম্ভ্রম জাগায়। যে কাচের বাক্সতে ক্যামেরাটি

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

রয়েছে সেটিও বেশ দামী মনে হল। নীচের অংশটা মোটা কাঠের তৈরি। কাঠের বেসের ওপর কাচ আঁটা। একেবারে ওপরের কাচটি দুটি ছোট হিঞ্জ বা কব্জা দিয়ে আটকানো। প্রয়োজন মতো খোলা-বন্ধ করা যায়। এই সপ্তাহে কাজের চাপ বেশি থাকায় দরকারি জিনিসগুলি কিনে আনা হয়নি। ১১৭ রোল ফিল্ম এখন আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, যা সেসময় এহল্লাইতে ব্যবহার করা হতো। আমি ১১০ বা ১২০ রোল ফিল্ম দিয়ে কাজ চালাবো ঠিক করলাম।

তারপর এক ছুটির দিনে আমি আর রেচেল বেরিয়ে পড়লাম কেনাকাটা করতে। সঙ্গে ক্যামেরাটিও নিয়ে নিলাম। শিলার প্যাসেজের ফোটো-আটেলিয়ে হাকলেন্ডা এখানকার নামকরা স্টুডিও। সেখানে ক্যামেরাটি দেখিয়ে ফুজি ১২০ রোল ফিল্ম লাগানোর পরামর্শ পাওয়া গেলো। তিনটি ফিল্ম রোল কিনে নিলাম। পুরনো ক্যামেরা যারা ঘেঁটে দেখেছেন তাঁরা জানবেন পুরনো ক্যামেরাতে অনেক সময় ময়লা জমে ফিল্ম রোটেটিং কগ্‌হুইল জ্যাম হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত ক্যামেরাটির সেরকম কোন সমস্যা নেই, দিব্বি সবকটি ঘুরছে। এরপর লাঞ্চ বাইরে সেরে আমরা ফিরে এলাম।

হোটেলে ফিরেই ক্যামেরাটি নিয়ে বসে পড়লাম। আজ এর শাপমুক্তি ঘটতে চলেছে, এতো বছরের উপেক্ষা ও অবহেলার অবসান হতে চলেছে আমার জন্যে। ভাবতে ভাবতে বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ চোখে পড়ল ক্যামেরার লেন্সের ওপর যেখানে রোমান হরফে 'Rolleiflex' লেখা তার ঠিক নীচেই ছোট করে লেখা 'K1 610' এবং তারও নীচে লেখা প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম। বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হল যে বৃদ্ধের বলা ইতিহাস যদি বানানো গল্পও হয়ে থাকে তবুও এই ক্যামেরা মাত্র চোদ্দটি প্রোটোটাইপের মধ্যে একটি। অর্থাৎ এর গৌরব মোটেও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্তত আমার কাছে তো নয়ই। তারপর খুব সাবধানে একে একে ফিল্ম লাগালাম, ফোকাস মিরর্ ঠিক মতো সাজিয়ে শেষে লেন্সক্যাপ খুলে পরীক্ষা করে দেখলাম যে সব ঠিকঠাক আছে।

মিনিট পনেরো পরে আমরা চারজন হোটেলের বাগানে এসে জড়ো হলাম। ব্যাল্‌ড্রিক বলল ক্যামেরাটিতে প্রথম তোলা ছবি আমারই হওয়া উচিৎ, কারণ একটিবার স্বচক্ষে দেখার জন্যে যেভাবে আমি অচেনা একজনের পেছনে ছুটেছি তাতে ভাগ্যদেবতাও আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি আগাগোড়া ভনকেই সমস্ত কৃতিত্ব দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে ওদের জবরদস্তির সামনে আমাকে হার মানতে হল। রাজি হলাম ব্যাল্‌ড্রিকের প্রস্তাবে। এরপর আমাকে একটি পাতাবাহার গাছের পাশে দাঁড়াতে বলে হাত দশেক দূর থেকে প্রথম ছবিটি তুলে নিল ব্যাল্‌ড্রিক। আমরা সকলে উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠলাম। চারপাশে খুব বেশি লোকজন না থাকলেও যে কজন ছিল তারা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আবার যে যার মতো চলে গেলো। এরপর আমরা তিনজন করে দাঁড়িয়ে গোটা দশেক ছবি তুললাম।

হোটেলে ডার্করুম নেই, থাকার কথাও নয়। তাছাড়া আমাদের কাছেও এনলার্জার, ফোটোগ্রাফিক পেপার কিছুই না থাকায় ফিল্ম নেগেটিভ থেকে ছবি করতে সেগুলি স্টুডিওতে দিয়ে আসা হল। সেদিন রাত পর্যন্ত ক্যামেরাটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। যতই দেখছি ততই যেন আসক্ত হয়ে পড়ছি। রাতে নৈশভোজ সেরে আর কাজে বসতে ইচ্ছে করলো না। সারাদিন অনেক হইচই করে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার ওপর আজ মদ্যপানের মাত্রাও কিঞ্চিত বেশি হয়ে গিয়েছে। তাই আর দেরী না করে ঘরে এসে ক্যামেরাটি কাচের বাক্সে ঢুকিয়ে রেখে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সারা ঘরে ঝকঝকে এল.ই.ডি. আলো জ্বলছে। ক্লান্ত নেশাতুর চোখের ওপর উজ্জ্বল আলো বড্ড বিরক্তিকর হয়। আমি ঘরের সব আলো নিভিয়ে ব্ল্যাঙ্কেট চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

খুব বেশিক্ষণ জেগে ছিলাম বলে মনে হয় না। শরীর এতটা অবসন্ন হয়েছিল তা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন আটটা বেজে দশ মিনিট। বিছানায় উঠে বসতেই বুঝতে পারলাম, গতকালের মদ্যপানের ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি। মাথা ভার হয়ে আছে, সারা গায়ে ব্যাথা। এমনটা সচরাচর হয় না আমার সঙ্গে। যদিও অতিরিক্ত পরিমাণে হুইস্কি পান করাও আমার স্বভাববিরুদ্ধ, তবু গতকাল সেরকমই কিছু হয়ে গিয়েছে। অনুতাপের আঁচে ছ্যাকা খেয়ে মুখ ব্যাজার করে বিছানা ছাড়লাম। 'রুম সার্ভিস বয়' যে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসে ফিরে গেছে সেব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। তাই আরেকটিবার কল দিয়ে দিলাম। এমন সময় চোখ পড়ল ঘরের দেওয়ালের দিকে। ঘরের মাঝামাঝি একটি সিঙ্গেল খাটে বিছানা পাতা, তার বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটি ওয়ার্ডরোব রয়েছে আর একটি লকারওয়ালা টেবিল। দেওয়ালের এই বাঁদিকের অংশটি ও ছাদের অর্ধেক অংশ জুড়ে সর্বত্র কালো একপ্রকার পদার্থ লেপে রয়েছে। রঙ জাতীয় কিছু নয় বলেই মনে হচ্ছে, কতকটা কয়লার গুঁড়োর মতো জিনিস এলোপাথাড়ি লেপে দেওয়া হয়েছে যেন।

ব্যাপারটায় বেশ ভড়কে গেলাম। গতকাল শোবার আগেও এরকম কিছু চোখে পড়েনি। অথচ একরাতের মধ্যে এরকম অনিষ্ঠ কিভাবে হল,

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

তার কোন সদুত্তর মাথায় এলো না। ব্রাশ করতে করতে দেওয়ালের অবস্থা দেখছিলাম, এমন সময় ব্রেকফাস্ট এলো। আমি প্রথমে ছেলেটিকে দেখালাম সব। তারপর গতকাল রাতে মাস্টার চাবির সাহায্যে দরজা খুলে কেউ ঘরে ঢুকেছিল কিনা জানতে চাইলাম। প্রশ্নটি শুনে ছেলেটি একেবারে হা হয়ে গেলো। তারপর আশ্বাস দিয়ে বলল এই হোটেলে গ্রাহকের অনুমতি বিনা মাস্টার চাবি ব্যবহার করা হয় না। আমি ছেলেটির আত্মবিশ্বাস দেখে মনে মনে কথাটা বিশ্বাস করে নিলাম। তারপর দেওয়ালটি পরিষ্কার করে দেওয়ার কথা জানিয়ে দিলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট খেয়ে অন্য দুজন বন্ধুর সঙ্গে দরকারি কাজে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। আমার অনুমতিতে আমার অবর্তমানে রুম সার্ভিসের কেউ ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে পুনরায় দরজা লক করে দিয়ে যাবে, সেরকম কথা হয়ে গেলো। টাকাকড়ি যা আছে সব লকারে রাখা আর ওয়ার্ডরোবের ভিতরের একটি তাকে রাখা আছে আমার এহল্লাই। দুটোরই চাবি আমার পকেটে, কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। তাছাড়া প্রথম বিশ্বের দেশে ছিঁচকে চুরির সম্ভাবনা যথেষ্ট কম।

যখন ফিরলাম তখন বেলা দেড়টা। ঘরের দেওয়াল ও ছাদ যথাসম্ভব পরিষ্কৃত হয়েছে। লাঞ্চ সেরে ক্যামেরাটা বের করতে গিয়ে দেখি কাচের বাক্সটা ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে। মারাত্মক রাগ হল! একি কান্ড! খুব সাবধানে আলতো করে এনে বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখলাম। প্রত্যেকটা কাচে অজস্র ফাটল, তবু যেরকম থাকার সেরকমই দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ যেন সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে গেলো! রাগে উন্মাদ হয়ে গিয়ে হোটেলের আধিকারিকের সঙ্গে তুমুল বচসা বাঁধিয়ে বসলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলো না হোটেলের কর্মচারীদের দিক থেকে। ওটি বন্ধ ওয়ার্ডরোব থেকে বের করে কে আছড়ে ভাঙলো তার কোন হদিশ পাওয়া গেলো না।

মাথা ঠাণ্ডা হতে ভেবে দেখালাম এভাবে চৌচির হয়েও ঠিক যেরকম থাকার সেভাবে রয়ে যাওয়াটা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! আছাড় মারলে বা হাত থেকে পড়ে গেলেও তো কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ার কথা। যাইহোক, রেচেল আর ভন দুজনেই সান্ত্বনা দিয়ে জানালো যে তারা আমাকে আরেকটি বাক্স এনে দেবে। আমি বাক্সটি থেকে ক্যামেরাটা বের করে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। সৌভাগ্যবশত ক্যামেরাটির কোন ক্ষতি হয়নি। সেদিন রাতে ক্যামেরাটি বেডসাইড টেবিলের ওপরই রেখে দিলাম। তারপর রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলেই শুয়ে পড়লাম। আজ স্নায়ু বড়ই সজাগ, সহসা ঘুম এলো না।

পরের দিন সকালের ঘটনা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। গতকালের মত আজও দেওয়াল জুড়ে কালির আঁকিবুঁকি। পার্থক্য এই যে গতকাল সেটি ঘরের বাঁদিকের অংশে ছিল, আর আজ গোটা ঘর জুড়ে করা হয়েছে। বন্ধুরা সকলেই ঘর বদলের উপদেশ দিল। আমিও কয়েকবার ভেবে দেখলাম কথাটা, কিন্তু কেন জানি না মন সায় দিল না। ব্রেকফাস্ট করতে করতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রেচেলকে ফোন করলাম। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়াও আর ঠিক কি সম্পর্ক আছে তা আমরা নিজেরাই ভালোভাবে জানি না। তবে বন্ধুত্বের চেয়েও যে বেশি কিছু আছে তা অনুভব করি মাঝে মাঝে। মনের সব কথা ওকে জানিয়ে একটা আলাদা স্বস্তি পাই। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হল না। ব্রেকফাস্ট করতে করতে সেই রাতেই দেখা একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়েছিল। রেচেলকে সেটা জানাতেই আগ্রহের সঙ্গে সে গোটা বিষয়টা জানতে চাইলো।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা এক সকালে একটি লম্বা কাঠের তৈরি বাড়ির মধ্যে একদল মহিলা সেলাইয়ের কাজ করছে। সমস্ত ঘর জুড়ে সেলাই মেশিনের আওয়াজে যেন ছন্দ উঠেছে। হঠাৎই এক লহমায় সবাই উধাও হয়ে গেলো। প্রতিটা ডেস্ক মানবশূন্য, কেউ কোথাও নেই। আমি হেঁটে বেড়ালাম ঘরটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা প্রশস্ত অঞ্চলটিও একেবারে জনমানবশূন্য। হঠাৎ চোখে পড়ল খোলা মাঠের ওপর কাতারে কাতারে নবজাত শিশুর ঢল। এরকম কনকনে ঠাণ্ডায় তারা উলঙ্গ অবস্থায় মাঠের ওপর পড়ে রয়েছে। আমি ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। একদম কাছে আসতে দেখি প্রতিটা শিশুর গলা থেকে নাভি পর্যন্ত চেরা, যেন কেউ ফালি করে কেটে রেখেছে। চমকে উঠে হাঁটু মুড়ে বসে দেখতে লাগলাম। যতদূর দৃষ্টি গেলো প্রতিটা মৃতদেহেরই একরকম অবস্থা। হাতের সামনে পড়ে থাকা একটি শিশুর মুখের দিকে তাকালাম। ভারী মিষ্টি মুখটা, যেন এরকম নিষ্ঠুরভাবে মরেও মুখ থেকে হাসিটা যায়নি। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। তারপর চোখ ফেরাতেই দেখি মাঠের ওপর বাকি সব মৃতদেহগুলি উঠে বসেছে আর বীভৎস ঠিকরে বেরনো চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

সব শুনে রেচেল গম্ভীর হয়ে বলল কয়েকদিন 'ভায়োলেন্ট' কিছু চিন্তা ভাবনা না করতে। মানুষ মাঝে সাঝে এরকম দুঃস্বপ্ন দেখে থাকে, আপাতত চিন্তা করার মতো কিছু নেই। আমিও এরপর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সারাদিন আউটডোর শ্যুটের কাজ করে সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

একটা বিয়ার পাবে গেলাম। ব্যাল্‌ড্রিকের আজ জন্মদিন, সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। তারিখ জিনিসটা বড্ড এঁড়ে, মোটেও কব্জা করতে পারি না। যাহোক, ওর অনারেই আজ ডিনার অর্ডার করা হল। কেক খেতে খেতে সকলেই বিয়ারে চুমুক লাগাচ্ছে। কিন্তু আমার একদম ইচ্ছে করলো না। গত পরশু মাত্রাতিরিক্ত নেশা করে শরীরটা বেশ বিগড়ে ছিল, বিয়ারের গন্ধটা নাকে যেতেই গা গুলিয়ে উঠলো। তাই আর ঝুঁকি নিলাম না।

সেদিন রাতেও অদ্ভুত আরেকটি স্বপ্ন দেখলাম। সেই সুন্দর মুখওয়ালা শিশুটি বসে রয়েছে ঘন কুয়াশার মধ্যে। চারপাশ ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। কেউ ধারেকাছে নেই। একা আমি একটা চতুষ্কোণ কাঠের ফ্রেমে বাঁধা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছি। চারিদিক অস্বাভাবিকরকম নিস্তব্ধ, কেবল একটিমাত্র রক্ত জল করা আওয়াজ ভেসে আসছে। সেটি মোটা ফাঁসির দড়িতে দেহ এদিক-ওদিক দুললে যেরকম শব্দ হয় সেই ভয়ঙ্কর মড়মড় শব্দ। আমি ঝুলতে ঝুলতেই দেখছি, শিশুটি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ধীরে ধীরে একসময়ে আমার দম আটকে চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

সকালে উঠে আজ আর স্বপ্নের কথা কাউকে জানালাম না। মনে চিন্তার কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন মানুষ দেখে, দুঃস্বপ্নও দেখে। কিন্তু পরপর দু'রাত একইরকম বিষয়ে এক অজানা চরিত্রকে নিয়ে স্বপ্ন আসে কি? আমি মনস্তাত্ত্বিক নই, তাই এর সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। হয়তো এর মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব নেই, তবু মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। কাজের ফাঁকে ব্যাল্‌ড্রিককে জিজ্ঞেস করলাম, রাতে সেও কোন স্বপ্ন দেখেছে কিনা। কিন্তু গুরুত্ব দেওয়ার মতো কোন স্বপ্নের কথা ও মনে করতে পারলো না। ভালো কথা, এরকমটা কেবল আমার সঙ্গেই ঘটেছে। ঘরের চার দেওয়াল ও ছাদ কালো ধুলোয় আবৃত। আজ ইচ্ছে করেই সেটি পরিষ্কার করালাম না। রাতে শোবার আগে নিজেই একটি ডাস্টার নিয়ে ঘরের একদিকের দেওয়ালের খানিকটা মুছে পরিষ্কার করলাম। কারণ আজ একটি ব্যাপার নিশ্চিত করতেই হবে আর সেজন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

সারারাত জেগে বসে থাকার ব্যবস্থা করেছি। ঘরের সব আলো জ্বেলে বিছানার ওপর ক্যামেরাটা আর ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। ফ্লাস্কে করে কড়া কফি আনিয়ে নিয়েছি। ঘুম পেলে কফিটা কাজে আসবে আশা করি। এরপর আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসে ল্যাপটপে সিনেমা দেখতে শুরু করলাম। ঠিক রাত দুটোয় সিনেমার আওয়াজের মধ্যেই মচমচ করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে এলো। দেওয়ালের যে অংশটুকু পরিষ্কার করেছিলাম, দেখলাম সেই জায়গাটা আবার বাকি দেওয়ালের মতো কালো হয়ে যাচ্ছে। হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলাম। এরকম অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবো, কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। আর আজ বাস্তবটাই যেন কেমন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে!

মিনিট দশেক পর একসঙ্গে ঘরের সবকটি আলো নিভে গেলো। এমনকি ব্যাটারিতে চলা ল্যাপটপটিও। যেন কোন গুপ্ত শত্রু অকস্মাৎ ই.এম.পি. অ্যাটাক করে বসেছে। একবার চিৎকার করে উঠে ভয়ে আমি চোখ বুজে বালিশে মুখ গুঁজে দিলাম। যদিও বেশিক্ষণ সেভাবে দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে পারলাম না। একটা চাপা কোলাহলের শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি ঘরের সমস্ত দেওয়াল ও ছাদে পুরনো দিনের সাদাকালো সিনেমার মতো ছবি কেঁপে কেঁপে নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে। আর আমার সাধের ক্যামেরাটির লেন্স থেকে ক্যাপটি খসে পড়েছে। সেই লেন্স থেকেই ছবিগুলির প্রজেকশান হয়ে চলেছে।

ছবিগুলির প্রত্যেকটি, অন্তত আমি যে ক'টি সাহস করে তাকিয়ে দেখতে পারলাম, নাৎজি পাশবিকতার চূড়ান্ত নমুনা বলা চলে। কোন ছবিতে অস্থিচর্মসার লাশের পাহাড়, কোনোটায় গ্যাসচেম্বারের ভিতরে বমি-পায়খানায় মাখামাখি হয়ে থাকা হরিৎবর্ণ উলঙ্গ নারী শরীর, কোনোটায় ফার্নেসের ভিতরে স্তূপীকৃত মানুষের হাড়। হলোকাস্টের এরকম দৃশ্য যে আগে দেখিনি তা নয়, তবু ঘৃণা ও ভয়ে আমার শরীর ক্রমে অচেতন হয়ে আসছিলো। একভাবে বসে থেকেই একবার হাত বাড়িয়ে ক্যামেরাটা কাছে আনার চেষ্টা করলাম। তারপর লেন্স ক্যাপটা তুলে নিয়ে লেন্সের ওপর চেপে বসিয়ে দিতেই চারদিকের ছবিগুলি গায়েব হয়ে গেলো।

মনে মনে তীব্র অনুশোচনা হতে লাগলো। বৃদ্ধ আমাকে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও আমি ওঁর কথা গ্রাহ্য করিনি। তার ফলাফল হল বড়ই ভয়ানক। পরের দিন সকালে ভন, রেচেল আর ব্যাল্‌ড্রিককে ডেকে সব ঘটনা বললাম। ওরা চুপ করে সব শুনল। আমি জানি, ওরা কেউই আমাকে চট করে অবিশ্বাস করার মানুষ নয়। সেদিন বিকেলে স্টুডিও থেকে ছবিগুলি আনা হল। সেখানেও এক অদ্ভুত ব্যাপার! আমাদের সকলেরই ছবি উঠেছে, সেই হোটেলের বাগান, সেই আমাদের পোশাক-পরিধান, কিন্তু আমাদের কারোর মুখ আমাদের মতো আসেনি। বিশ্রী টাকমাথা ফ্যাকাশে কোঁচকানো তিনটে মুখ ওদের তিনজনের মুখের ওপর বসানো। অবশ্য আমার ঘাড়ে যে মুখটি বসানো সেটি আমার পরিচিত।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

গত দু'রাতে যে শিশুটিকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, অবিকল সেই মুখটি আমার মুখের জায়গায় বসানো। কারোর মুখে কোন কথা ফুটল না। যে যার মতো চলে গেলাম। ব্যাল্‌ড্রিক সন্ধ্যায় এসে জানালো যে সবকটি ছবিই সে পুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাতে কোন সমস্যার সমাধান হবে কি? মনে মনে বললাম "ইটস্ গেটিং হরিবল্।"

(৪)

এই ঘটনার পর থেকে মানসিকভাবে রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। রোজ রাতে আমি ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম সেই মরা শিশুটিকে নিয়ে। এভাবে প্রায় দিন দশেক কাটল। তবে আমি ছাড়া আর কাউকেই স্বপ্নের বিভীষিকার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, যেদিন জোর করে রাত জেগে থাকি সেদিন রাত দ্বিপ্রহরের পর ক্যামেরাটি থেকে ভয়ঙ্কর সব শব্দের সঙ্গে নাৎজি এস.এস. অফিসারদের পাশবিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার নানা ছবির প্রজেকশান হয়ে চলে। ভবিতব্যের দোহাই দিয়ে আর নিজের ওপরই সমস্ত দোষ চাপিয়ে আমি ব্যাপারটা নিজের ভিতরেই চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। অভিশপ্ত ক্যামেরাটি থেকে আমার মুক্তি কিভাবে হবে তা নিয়ে রেচেলের সঙ্গে আলোচনা করি মাঝে মধ্যে। স্থানীয় একটি চার্চেও গেলাম বার কয়েক। কিন্তু রাতে ঘুমের মধ্যে সেই বীভৎস দৃশ্যগুলি দেখা কোনভাবেই বন্ধ হল না।

একদিন সকালে জামাকাপড় ধোয়ানোর জন্যে হোটেলের লণ্ড্রীর একটি ছেলেকে ঘরে ডেকেছিলাম। ওয়ার্ডরোব থেকে জামা, স্যুট, প্যান্ট বের করে দিচ্ছি, এমন সময় ছেলেটি বলে উঠলো –

"এক্সকিউস মি স্যর, ইফ ইউ নিড অ্যানাদার গ্লাসবক্স দেন ইউ ক্যান আস্ক মি এনিটাইম।"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম –

-"আস্ক ইউ ফর হোয়াট? ইউ সেল দিস কাইন্ড অফ বক্সেস?"

-"নট মি অ্যাকচুয়্যালি, স্যর, বাট মাই ফাদার মেকস্ দিস কাইন্ড অফ গ্লাসবক্সেস উইথ উডেন সার্ফেস।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটা কাছে এনে দেখালাম। তাতে ছেলেটি ঘাড় নেড়ে জানালো একেবারে এরকম বাক্সই বানায় তার বাবা। আমি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে কথা দিলাম আমি অবশ্যই একটি বাক্স কিনব তার থেকে। আর সেই মতো দিন দুয়েক বাদে ছেলেটির সঙ্গে গেলাম ওর বাবার ক্র্যাফট্ স্টোরে। মিষ্টভাষী ভদ্রলোক আমাকে বেশ কয়েক রকম কাচের বাক্স দেখালেন। তারপর একটি বাক্স এনে দেখিয়ে বললেন এরকম বাক্স পোল্যান্ডে একসময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল যার নীচের ওই কাঠের বেসটি একটি স্লাইডিং পাল্লার সাহায্যে খোলা বন্ধ করা যায়। ভালো করে দেখলাম, সত্যিই অসাধারণ ব্যবস্থা। একটা ছোট কাঠের নবকে ধরে খানিকটা স্লাইড করে নীচে নামিয়ে তারপর পাল্লার মতো ওপরের দিকে টেনে খুললেই কাঠের বেসটির ভিতরে একটা চোরা কুঠুরি বেরিয়ে পড়ে। ইহুদীরা সোনা, রুপো বা অন্য দামী কিছু লুকিয়ে রাখতে এরকম বাক্স ব্যবহার করতো এককালে। আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। বাপ-ছেলেকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বাক্সটি কিনে, সোজা হোটেলে চলে এলাম। উত্তেজনার পারদ যে ক্রমেই চড়ছে তা বুঝতে পারলাম।

এসেই এহল্লাই-এর সঙ্গে থাকা কাচের বাক্সটি বের করে টেবিলে নিয়ে বসলাম। তারপর কাচের পাল্লা খুলে কাঠের বেসটির মধ্যে হাত বোলাতেই ছোট একটা নব আঙুলে ঠেকল। একই কায়দায় নিমেষের মধ্যে টেনে খুলে ফেললাম চোরা কুঠুরির পাল্লা। ভিতরে লালচে কাপড়ে মোড়া কিছু একটা এতকাল চেপে রাখা ছিল। টেনে হিঁচড়ে কোনরকমে বের করে আনলাম। এরপর কাপড়ের মোড়ক খুলতেই দেখি তাতে সোনা-দানা, মণি জহরত কিছুই নেই। রয়েছে কেবলমাত্র একটি চামড়ার মলাট দেওয়া পাঁচ ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সাইজের পুরাতন ডায়েরী।

সন্ধ্যার পর ঘরে এসে অতি সন্তর্পণে ডায়েরীটা নিয়ে পড়তে বসলাম। মলাট ওলটাতেই দেখি প্রায় প্রথম পাতা জুড়ে নাৎজি পার্টির 'পাহ্‌টাইয়াড়লা' (Parteiadler) চিহ্ন আর তার নীচে ছোট করে নীল কালিতে লেখা ওয়াইল্টা এইচ ক্রিমা। ডায়েরীর প্রতি পাতার গাঢ় হলুদ রঙ এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। ফাউন্টেন পেনে সুন্দর হাতের লেখায় প্রায় গোটা ডায়েরী ভর্তি। কিন্তু পুরোটাই জার্মান ভাষায় লেখা বলে আমার বোঝার উপায় নেই। তাহলে ব্যাল্‌ড্রিক ছাড়া কি আর গতি নেই, এমন ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল অনলাইন ট্রান্সলেটর-এর সাহায্য

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

নেওয়া যেতে পারে। এই ব্যাপারটা আপাতত আমার মধ্যেই থাক, এমনটাই মন চাইলো।

সেদিন আর কোথাও বেরলাম না। এমনকি রাতে ভারী কোন খাবারও খেলাম না। গুগল ট্রান্সলেটরের সাহায্যে যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে অনুবাদ করে পড়তে লাগলাম ডায়েরীর লেখা। শুরুর বেশ কয়েকপাতা পড়েই মনে হল এই ডায়েরী সিনিয়র ক্রিমার কর্মজীবনের অনেককাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি দিয়েই শুরু হয়েছে লেখা। হায়েনহিখ হিমলা, হায়েনহাড হায়েডিখ, হ্যারমান গহিং, ইয়োসেফ মাংগিলি এবং আরো নানান কুখ্যাত নাৎজি নেতার সঙ্গে ক্রিমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা লেখা রয়েছে। নিজে কখনো হত্যা করেননি বটে, তবে ইহুদীদের প্রতি ক্রিমার অটুট ঘৃণার কথাও সাফ লেখা রয়েছে ডায়েরীতে প্রথম পর্বে।

একটা জাতি সেই হিব্রু বাইবেলের যুগে মিশরীয়দের দাসত্ব করার সময় থেকে কালের প্রতি পদে নানাভাবে নানাস্থানে চরম নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। আজ যদি তারা উদ্বাস্তু দশা কাটিয়ে নিজেদের ক্ষমতাবলে মাথা তুলে সন্মানের সঙ্গে দাঁড়াতে পেরেছে, পরিবার নিয়ে একত্র হতে পেরেছে, সম্পত্তি অর্জন করতে পেরেছে, তা ভোগ করার অধিকার স্রেফ গায়ের জোরে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল। তবু জার্মানদের চোখে সেটা মোটেই অন্যায় ছিল না। ফ্যাসিবাদী হিংসা ও বিদ্বেষের বিষে গোটা দেশ তখন জর্জরিত। ডায়েরীর প্রতি পাতায় লেখা মানবিকতার চরম পরিহাসের এরকমই নানা কাহিনী পড়ে যেতে লাগলাম।

১৯৩৮ সালের পর থেকে জার্মানির বিভিন্ন স্থানে 'কন্সেনট্রেশান ক্যাম্প' তথা 'এক্সটারমিনেশান ক্যাম্প'-গুলিতে ঘুরে ঘুরে ক্রিমা ছবি তুলে বেড়িয়েছেন। সেই ছবি ও চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনী হতো বিভিন্ন নাৎজি রিক্রিয়েশান ক্লাবে। সেখানে উপস্থিত এস.এস. কমান্ড্যান্ট, সেনার অন্য অফিসাররা ও নাৎজি পার্টির অন্য সদস্যরা সে ছবির বীভৎসতাকে কমেডি সিনেমার মতো উপভোগ করতো। এছাড়াও 'ফিউহা' (Führer) হিটলারের নির্দেশে হিমলা ও হায়েডিখ কিভাবে গননিধন যজ্ঞ চালিয়েছে তার বিশদ বিবরণ পড়তে পড়তে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

যখন ল্যাপটপের চার্জ প্রায় শেষের পথে তখন সম্বিত হল, এবার আজকের মতো এখানেই শেষ করা যেতে পারে। আবার আগামীকাল বসা যাবে। যে পৃষ্ঠাটি খোলা ছিল, ভাবলাম সেটি শেষ করে তুলে রাখবো সব। কিন্তু তা আর হল না। ট্রান্সলেটরে শেষ প্যারা লিখে অনুবাদের দিকে তাকাতেই চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। হ্যাঁ এইতো, এহল্লাই ক্যামেরা নিয়ে প্রথম কোন লেখা চোখে পড়ল। এক লাফে উঠে গিয়ে ল্যাপটপের চার্জার নিয়ে এলাম। এই লেখা এখনই ছাড়া কিভাবে সম্ভব! ক্যামেরার সঙ্গেই যখন ডায়েরীটা গোপনে রাখা তখন এর ভয়াবহতা সম্বন্ধেও কিছু লেখা থাকবে আশা করি। কে বলতে পারে, যদি এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তির কোন পথের হদিশ থেকে থাকে। এরপর ধৈর্য সহকারে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ পাতা একবারে অনুবাদ করে মন দিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

সময়টা ১৯৪৪ সালের প্রথম দিক। নানা জায়গা থেকে জার্মানদের পরাজয়ের খবর আসতে শুরু করেছে। সোভিয়েত রেড আর্মি ও ওয়েস্টার্ন অ্যালাইড ফোর্সের সাঁড়াশি চাপে তখন জার্মানরা পিছু হঠছে। এমত অবস্থায় ফেব্রুয়ারি মাসে নাৎজি পার্টির ও এস.এস. বাহিনীর উচ্চপদস্থ নেতাদের সঙ্গে একটি গোপন বৈঠক হল হিটলারের। এস.এস. বাহিনীর চিফ হায়েনহিখ হিমলা সে বৈঠকে এক সোজাসাপটা বক্তব্য পেশ করলো সকলের সামনে। হিটলারের সবথেকে বিশ্বস্ত ও কাজের লোক ছিল এই হিমলা। তাই জার্মানি, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিটা কন্সেন্ট্রেশান ক্যাম্পের বন্দীদের যত শীঘ্র সম্ভব মেরে ফেলার প্রস্তাবে হিটলার এককথায় তার অনুমতিও দিয়ে দিল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব পোল্যান্ডের কয়েকটি ক্যাম্পে কব্জা করে নিয়েছে ও সেখানকার জীবিত বন্দীদের উদ্ধার করেছে। বিদ্বেষের আগুনে জ্বলতে থাকা নাৎজিদের কাছে এটা যুদ্ধে পরাজয়ের থেকেও খারাপ খবর। তারপর মে মাসের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি জার্মানদের জন্যে আরো সংকীর্ণ হয়ে উঠতেই বন্দীদের হত্যার বেগ অকল্পনীয় হারে বৃদ্ধি পেলো। ক্রিমা তখন আওসউইতজ্ (Auschwitz) 'ডেথ ক্যাম্পে' ছবি তুলছেন। গ্যাস চেম্বারের ভিতরে হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাসের বিষক্রিয়ায় প্রায় হাজার জন নারীপুরুষকে এক একবারে মেরে ফেলা হচ্ছে। তারপর মৃতদেহগুলি টাল করে রেখে তাতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন সময়ে ইয়েগার পত্র পেলেন ক্রিমা। তাকে অবিলম্বে নিডাজাক্সেন চলে আসতে বলা হয়েছে। মনে মনে একপ্রকার খুশীই হলেন তিনি। প্রায় অনেকদিন হল পড়ে রয়েছেন পোল্যান্ডে। পরের দিন জিনিসপত্র গোছগাছ করে তিনি তৈরি হয়ে নিলেন। এহল্লাইয়ের দুটি ক্যামেরা তখন তাঁর সঙ্গী। এর মধ্যে প্রোটোটাইপটি তিনি আর ছবি তোলার কাজে ব্যবহার করেন না। আধুনিক মডেলটি ব্যবহারের সুবিধে অনেক বেশি, তাই সেটিই এখন ব্যবহৃত হয়। সেরাতে একজন নাইটগার্ডের কাছ থেকে ক্রিমা খবর পেলেন, মধ্যরাতে ক্রাকাউ থেকে একটি ট্রেন আসবে যাতে করে ওই অঞ্চলের কিছু জার্মান ব্যক্তি আওসউইতজ্-এ আসবে। তারা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আগামী কিছুদিন এই ক্যাম্পে থাকবে। ক্রিমা ভেবে দেখলেন আগামীকাল ভোরেই হয়তো ট্রেনে চেপে তাঁকে ফিরতে হবে, তাই আজ

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

রাতে সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নেওয়া যেতে পারে। ক্রিমা অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ একটি ট্রেন এসে থামল ক্যাম্পের প্ল্যাটফর্মে। ক্রিমা তাঁর এপার্টমেন্ট থেকেই দেখলেন, প্রথমে তিনজন লোক ট্রেন থেকে একে একে নেমে এল ও তারপর কিছু সেনা বড়সড় কয়েকটি ট্রাঙ্ক নিয়ে নামলো। আর দেরী না করে ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্রিমা। সময়মত আলাপ পরিচয়ও সেরে নেওয়া গেলো। আমন গুট একজন এস.এস. হাউফস্টোমফিউহা (Hauptsturmführer) এবং তার ব্যবসায়ী বন্ধু অস্কার শিন্ডলা একজন হাসিখুশী মানুষ। ক্রিমার পরিচয় পেয়ে তারাও উচ্ছ্বসিত। হওয়ারই কথা, হিটলারের যথেষ্ট কাছের লোক হিসেবে ক্রিমার নাম তখন ঘনিষ্ঠ মহলে বেশ পরিচিত। কথা আলোচনায় রাত আরো বাড়লে ক্যাম্প ঘুরে দেখার ইচ্ছা জানালো মদ্যপ আমন গুট। কেউ তাতে আপত্তি জানালো না, আওসউইতজ্-এর কমান্ড্যান্ট উডল্ফ হাস্ নিজে ঘুরিয়ে সব দেখাতে শুরু করলেন অতিথিদের। সেদিন বিকেলেই কিছু সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীকে তড়িৎস্পৃষ্ট করে মারা হয়েছিল। তাদের মরদেহগুলি তখনও একটা কাঠের ঠেলাগাড়ির ওপর রাখা ছিল। গুট হঠাৎ সেটি সমেত সকলের একটি ছবি তুলে দিতে ক্রিমাকে অনুরোধ করলো। ক্রিমা বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের ছবি তুলে দিলেন। তারপর সকলে মিলে আবার মদ্যপান করতে বসতেই অস্কার শিন্ডলা ক্রিমার কাছে তাঁর ক্যামেরাটি দেখতে চাইলো ও যথোপযোগী বিশেষণে অনেক প্রশংসাও করলো। ফিউহা ও পার্টির প্রতি ক্রিমার আনুগত্য ও তাঁর এই কঠোর পরিশ্রম যে নিঃসন্দেহে তুলনাহীন সেটা শিন্ডলা অনেক নাৎজি অফিসারের কাছেই শুনেছে বলে জানালো। ঘণ্টা খানেক পর ক্রিমা নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে এলেন এবং বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটালেন। পরের দিন ভোরে জার্মানির উদ্দেশ্যে ট্রেনে চাপতে হল তাঁকে। দু'বার ট্রেন বদল করে পৌঁছতে হবে বহ্নশোয়াইগ। তারপর বহ্নশোয়াইগ প্রেসে গিয়ে হুগো ইয়েগার সঙ্গে দেখা করতে হবে। পরবর্তী করনীয় সেখান থেকেই জানা যাবে। কিন্তু যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে ক্রিমা প্রথমেই তাঁর নিজের বাড়িতে এসে পড়লেন। দুটি ক্যামেরার ফিল্ম ও বেশ কিছু ডকুমেন্ট সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে প্রেসে। একটু বিশ্রাম করে ক্যামেরা থেকে ফিল্ম খুলে নিতে গিয়ে চমকে গেলেন তিনি। নতুন মডেলটির ফিল্মের জায়গায় একটা সাদা কাগজের টুকরো গোঁজা, আর ফিল্মটি উধাও হয়েছে। কাগজটি বের করে হাতে নিতেই একটা লেখা চোখে পড়ল ক্রিমার। জার্মান ভাষায় তাতে যা লেখা রয়েছে তার মানে করলে এই দাঁড়ায় যে, অস্কার শিন্ডলা সুন্দরীদের সঙ্গে ছবি তোলে, মৃতদেহের সঙ্গে নয়। কাজেই তিনি একজন খাঁটি পুরুষ। এঘটনায় বেজায় চটে গেলেন ক্রিমার। ইচ্ছে না থাকলে তো সটান মানা করে দিতে পারতেন, গোটা ফিল্ম রোলটাই চুরি করে নেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। বেশ কিছু দরকারি ছবি ছিল রোলটিতে। রাগে গজগজ করলেও সময়মত প্রেসে এসে পৌঁছলেন ক্রিমা। তারপর কিছু দরকারি কাজ সেরে হুগো ইয়েগার কাছে ব্যাপারটা বললেন। ইয়েগা সব শুনে বলল লোকটা জার্মানদের নামে কলঙ্ক, তা না হলে কি কেউ ইহুদী মেয়েকে চুমু খায়! তবু বড় ব্যবসায়ী বলে লোকজন খাতির করে। তাছাড়া পার্টির অর্থনীতিকে সরাসরি সাহায্যও করে। যাইহোক, ক্রিমাকে কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে এখানেই কাজে লেগে পড়তে হবে। বহ্নশোয়াইগ লেবর ক্যাম্পের চেহারা তখন প্রায় কঙ্কালসার। বন্দীদের খাবারের জোগান প্রায় আসে না বললেই চলে। এরই মধ্যে প্রায় দেড় হাজার রোমানি জিপসি ও ইহুদী বন্দীকে নতুন করে আনা হয়েছে ক্যাম্পে। এদের মধ্যে পনেরো জন মহিলা গর্ভবতী। কিছু মহিলাকে বহ্নশোয়াইগের হাসপাতালে সাময়িকভাবে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের মধ্যে প্রায় সত্তর জন মহিলা এমন রয়েছে যাদের কোলে নবজাত শিশু রয়েছে। জার্মানির বিভিন্ন স্থান থেকে এদের একত্র করে বহ্নশোয়াইগ নিয়ে আসা হয়েছে। যুদ্ধে সেনাদের ব্যবহারের ব্যাগ বানানো চলছে লেবর ক্যাম্পে। মহিলারাই মূলত এই কাজ করে। এদের কারোর কর্মক্ষমতা হারিয়ে গেলে বা কর্মদক্ষতা হ্রাস পেলে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলাই একমাত্র নিয়ম। পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটিয়ে সপ্তাহ খানেক পর ক্রিমা ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গী পুরনো সেই প্রোটোটাইপ ক্যামেরাটি। গতকাল রাতে তিনি আবিষ্কার করেছেন নতুন মডেলটির কেবলমাত্র ফিল্মই খোয়া যায়নি, ব্যাক কভারটি এমনভাবে বলপূর্বক খোলা হয়েছে যে এর ফোকাস রিফ্লেক্টিং মিররটিও ভেঙেছে। তাই ওটি আরো কিছুদিন বিশ্রাম নেবে। অগাস্ট মাসের শুরুর দিক। হঠাৎ এক রাতে ক্যাম্পের শান্ত পরিবেশ ভারী বুটের আওয়াজে মুখরিত হয়ে গেলো। হিমলা এই অঞ্চল থেকে খুব বেশি কাজ পাওয়ার প্রত্যাশা করে না। আজ তার নির্দেশে পুনরায় রাতের অন্ধকারে শিশু ও নাবালক নিধন করা হবে বলে খবর পাওয়া গেলো। ক্রিমা তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এরপর কমান্ড্যান্টের আদেশে ক্যাম্পের সকল বন্দীদের সারবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হল খোলা মাঠে। জন পাঁচেক সেনা তাদের মধ্যে থেকে যাদের কোলে বাচ্চা রয়েছে তাদের আলাদা করে দিল। আরো কিছু সেনা তিনটি শ্রমিক ছাউনিতে ঢুকে প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশটি নবজাত শিশুকে চ্যাংদোলা করে বের করে আনল। অমনি মুহূর্তের মধ্যে এক তুমুল কাণ্ড শুরু হল। বন্দীদের মধ্যে থেকে শিশুগুলির মায়েরা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসতে চাইলো তাদের সন্তানদের কাছে। কিন্তু পাগল কুকুরের মতো আর্মির সেনারা তাদের কাউকে মেরে, কাউকে বন্দুকের বাটের গুঁতোয় অজ্ঞান করে ও কাউকে স্রেফ ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে কিছুতেই সেদিকে অগ্রসর হতে দিল না। ক্রিমা ছবি তুলে নিচ্ছেন সুযোগ মতো। যত নাটকীয় দৃশ্য হবে তত তাঁর নাম হবে, যত নারকীয় দৃশ্য হবে ততই তাঁর যশ বাড়বে। এ এক আশ্চর্য জীবিকা!

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এমন সময় কিছু রোমানি মহিলা দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কমান্ড্যান্টকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে শুরু করলো। প্রথম দিকে ক্রিমা কিছু বুঝতে না পারলেও পরে অন্তত এটুকু বুঝলেন যে সেটি নাৎজি বিরোধী কোন কথা বা গালাগালই হবে। কারণ নিমেষের মধ্যে কমান্ড্যান্ট খিঁচিয়ে উঠে আদেশ দিল প্রত্যেকটা শিশুকে উলঙ্গ করে মাঠের ওপর শুইয়ে দিতে। তারপর তিনজন সেনাকে সঙ্গে নিয়ে সে নিজে সেদিকে এগিয়ে গেলো। ক্রিমা এতকাল যাবত নানাবিধ পৈশাচিক অত্যাচার ও হত্যালীলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, তবু এদৃশ্য যেন সকলপ্রকার ভয়াবহতাকে ছাপিয়ে গেলো। মাঠের ওপর পড়ে থাকা বাচ্চাগুলি একসুরে কেঁদে চলেছিল। কমান্ড্যান্ট তার ভারী বুটের চাপে এক এক করে শিশুগুলিকে চেপ্টে পিষে মারতে শুরু করলো। কোন শিশুর খুলি থেঁতলে গেলো, কারোর বুকের পাঁজর চ্যাপ্টা হয়ে গেলো, কোনটির পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এলো। সে এক বীভৎস সাংঘাতিক দৃশ্য যা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে থেকে দেখা সম্ভব নয়। ক্রিমার হাত থেকে ক্যামেরা খসে পড়ল মাটিতে। তাঁর নিজের একটি সন্তান হয়েছে বছর খানেক হল। বারবার তাঁর মনে পড়ে যেতে লাগলো ছেলের মুখটা। জীবনে প্রথমবার বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে ক্রিমা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে গুনে গুনে চৌষট্টিটি শিশুর কান্না থামিয়ে ফিরে এসে কমান্ড্যান্ট ক্রিমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলো এবং তারপরই বলিষ্ঠ হাতে ক্রিমাকে জাপটে ধরে জবরদস্তি একটি ঘরে টেনে নিয়ে গেলো। সেখানে তাঁকে বোঝানো হল যে এরকম ব্যবহার ইহুদীদের ও বন্দীদের প্রতি দেখানোটা ঘোরতর অন্যায়। কোনরকম সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্যই নয় তারা। এরপর তাঁকে মাঠে পড়ে থাকা শিশুদের মৃতদেহের ছবি তুলে আনার কথা বলা হল। ক্রিমা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন চারপাশে কিছু মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। কিছুটা এগিয়ে যেতে মাটিতে পড়ে থাকা ক্যামেরাটা চোখে পড়ল ক্রিমার। তিনি সেটি তুলে নিয়ে শিশুগুলির লাশের সামনে এলেন। এখানে আলো বড্ড কম। ছবি ঠিকঠাক আসবে না মনে হতে লাগলো ক্রিমার। ঝুঁকে দেখতে দেখতে লক্ষ্য করলেন, একটি শিশুর মুখ যেন অবিকল তাঁর ছেলে ব্যেয়ানহাডের মতো। চমকে উঠলেন! এভাবে মানসিক শক পাবেন, ভাবতেই পারেননি তিনি। যাইহোক, কাজটুকু সেরে ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এজায়গা ছেড়ে যাওয়া যাবে ততই ভালো, এমন ভেবে যেই ছবি তুলতে যাবেন ঠিক সেসময়ে পেছনে কার যেন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। চমকে উঠে পিছনে ফিরে দেখলেন হাঁটু মুড়ে এক মাঝবয়সী মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় বসে রয়েছে। ক্রিমা মুহূর্তের জন্যে ভেবে পেলেন না কি করবেন। তারপর সাহস করে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন তার কি চাই। মহিলা জানালো সে নাকি ক্রিমাকে আগে বেশ কয়েকবার দেখেছে, অন্য কোন ক্যাম্পে। তার মন হয়েছে নাৎজি আর্মির থেকেও বেশি নিষ্ঠুর কাজ করে চলেছেন ক্রিমা। এটুকু বলবার পরই সে অন্য কোন ভাষায় কিসব বলতে শুরু করে তা আর ক্রিমার বুঝতে পারেননি। তার কিছু সময় পর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপর ক্রিমা একটিমাত্র ছবি তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন এবং পরের দিনই বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসলেন। ভেবেছিলেন আর একাজ করবেন না, ইয়েগাকে জানিয়ে অবসর নিয়ে নেবেন। কিন্তু রাত্রি ঘনাতেই অদ্ভুত কিছু ব্যাপার টের পেলেন ক্রিমা। সুন্দর করে সাজানো তাঁর ঘরটি দেখতে দেখতে পোড়ো বাড়ির মতো চেহারা নিল, চারপাশ থেকে অপার্থিব নানারকম শব্দ শোনা যেতে লাগলো এবং রাতে ঘুমের মধ্যে সেই জিপসি মহিলা বারবার দেখা দিতে লাগলো। দিন তিনেক এভাবে কাটার পর ক্রিমা দোতলায় আলাদা ঘরে নিজের জায়গা করে নিলেন। পরিবারের বাকিদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে গেলো। দিন কয়েক পর, ১৪ই অগাস্ট মধ্যরাতে গোটা বহ্‌নশোয়াইগ জুড়ে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের (RAF) চল্লিশটি বোমারু বিমান কার্পেট বম্বিং করে শহরের প্রেস, ক্যাম্প, কারখানা ও প্রায় আশি শতাংশ বাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দিল। তবু আশ্চর্যরকমভাবে ক্রিমার বাড়ির কোন বড় রকমের ক্ষতি হল না। এরপর অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করে নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার, কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার বেশ কিছু বছর পরে তিনি খোঁজ করে একটি জিপসি পরিবারের হদিশ পেলেন যারা ভাগ্যগণনা ও ভূতপ্রেত চর্চা করে থাকে। পোল্যান্ডের সেই পরিবারের কাছে এসে সব বলে ও ক্যামেরাটি দেখিয়ে ক্রিমা জানতে পারলেন ক্যাম্পের সেই জিপসি মহিলা ক্যামেরাটিকে ও সেই সঙ্গে তাঁকেও কালান্তক অভিশাপে বেঁধে দিয়েছে। সন্তানের বাসনা এক চরম বাসনা। অতৃপ্ত আবিজু প্রতিনিয়ত ক্যামেরায় তোলা শেষ ছবির ছায়াতে তার সন্তানের খোঁজ করে। এরপর সেই জিপসি স্বামী-স্ত্রী মিলে যথাসম্ভব প্রচেষ্টায় ক্রিমার মানসিক পীড়া কমানোর চেষ্টা করলো। তাঁকে একটি হিব্রু ভাষায় লেখা মন্ত্র দিল যেটা রোজ রাতে একবার করে পড়ে ঘুমলে সকালে উঠে দুঃস্বপ্নের কথা প্রায় মনে থাকবে না। ক্রিমা বাকি জীবনটা সেরকমই করে গেছেন, কিন্তু মুক্তি পাননি।

মনটা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেলো। তবে কি এই অভিশাপের থেকে আমৃত্যু উদ্ধার পাওয়া যাবে না? এতকাল বাদে আমার ছবিই প্রথম তোলা হল বলে কি আমাকে এই দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে? এসব ভাবতে ভাবতে চোখে জল চলে এলো। সব গুছিয়ে রেখে সেরাত্রে প্রচুর হুইস্কি পান করলাম। একেবারে যখন চোখ ঝাপসা হয়ে এলো তখন বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে দেরী করে ঘুম ভাঙল। আবার সেই মাথা ভার। তারপর ফ্রেশ হয়ে, ব্রেকফাস্ট করে স্টুডেন্টস্ মিটিং-এ গেলাম। সেখানে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হঠাৎ মাথায় এলো কাল রাতে কোন স্বপ্ন আমি দেখিনি। বেশ ভালোভাবে মনে করে দেখালাম, নাঃ কোন স্বপ্নই আমি দেখিনি। মিটিং শেষে নিজের ঘরে এসে দেখলাম চারপাশের দেওয়াল থেকে কালো ধুলোর আবরণ যেন কিছুটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তবে কি কোন আশ্চর্য ক্ষমতাবলে জিপসি মহিলার অভিশাপ আমার ওপর থেকে কেটে যাচ্ছে!

লাঞ্চের সময়ে রেচেলের সঙ্গে দেখা হল। সে নিজে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো রাতের স্বপ্নের কথা। আমি আজকের ঘটনাটা ওকে বললাম। শুনে রেচেল আমাকে জানালো আজ সন্ধ্যায় সে আমাকে একজন পণ্ডিতের কাছে নিয়ে যাবে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে কি ব্যাপার জানতে চাইলাম। কিন্তু রেচেল খুলে কিছু বলল না আমাকে। আমি তবু কথামতো তৈরি হয়ে নিলাম সন্ধ্যের আগে। তারপর চারবন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়লাম। সবাই চুপচাপ, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছি না। জায়গামত আসতে দেখলাম এটি একটি সুন্দর সাজানো বাগানবাড়ি। রেচেল গৃহকর্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। গত পরশুদিন রেচেলের সঙ্গে এনার আলাপ হয় উল্ভস্‌বুর্গের একটি প্যারানর্ম্যাল সোসাইটির ক্লাবে।

(৫)

ভদ্রলোকের নাম ইভান মুলার। তাঁকে আমি প্রথম থেকে সব ঘটনা খুলে বললাম। তিনি সব শুনে ক্যামেরাটি দেখতে চাইলেন। আমি তাঁকে কাচের বাক্সটি সমেত ক্যামেরাটি দেখালাম। সব দেখে শুনে বললেন আগামী পূর্ণিমায় তিনি আমার সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। সেইদিন আমাকে ক্যামেরা, গ্লাসবক্স, ডায়েরী সব নিয়ে এখানে আসতে হবে ও একরাত এবাড়িতে কাটাতে হবে। রাজি হলাম, আর কোন উপায়ও নেই। যতটা শীঘ্র সম্ভব এই জঘন্য অবস্থা থেকে রেহাই পেতে চাই। অনেকদিন হল কাজেও বিশেষ মন দিতে পারছি না।

ফেরার পথে আমি রেচেলের কাছে সব ঘটনা জানতে চাইলাম। রেচেল জানালো সে আর ব্যাল্‌ড্রিক স্থানীয় লোকদের সাহায্য নিয়ে ওই প্যারানর্ম্যাল সোসাইটির খোঁজ পায়। সেখানকার প্রেসিডেন্ট ইভান মুলার। একসময়ে হাইডেলব্যাগ ইউনিভার্সিটির ইন্দোলজি ডিপার্টমেন্টের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। তারপর ভূততাত্ত্বিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। রেচেল সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে তাঁকে ঘটনাগুলি জানায়। মিঃ মুলার আজ সবাইকে তাঁর বাড়িতে আসতে বলেছিলেন। এই বাড়িই এখন তাঁর গবেষণাগার। মনে মনে খুব খুশী হলাম রেচেলের এই পদক্ষেপে। আমি ডায়েরীর ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিলাম সবার কাছে। তার জন্যে ক্ষমা চাইলাম।

মন থেকে ক্যামেরাটির প্রতি প্রেম প্রায় ঘুচে গিয়েছিল, বরং নাৎজি বর্বরতার প্রতীক হিসেবে এটির ওপর যথেষ্ট ঘৃণা জন্মাল। শুধুই জন্মের ইতিহাস জেনে আনন্দ পেয়ে আসছিলাম এতদিন, কর্মের ইতিহাস জানার পর সেই ভক্তিভাব চিরতরে বিলুপ্ত হল। এদিকে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। খুব ভালো করে ভেবে দেখলাম, যে ক'দিন আমি মাত্রাতিরিক্ত নেশা করেছি, সেরাতে স্বপ্ন দেখিনি আমি। অথবা দেখলেও পরের দিন সকালে কিছু মনে পড়েনি। যাক, সংস্কৃত পণ্ডিতের আশ্বাসবানীতে আত্মবিশ্বাস উছলে পড়তে দেখেছি সেদিন। হয়তো কোন একটা উপায় তিনি ঠিকই বের করবেন।

তারপর পূর্ণিমার রাতে ডাক পড়ল আমাদের। চারজন মিলে সেখানে যাওয়া হল। ভন, রেচেল আর ব্যাল্‌ড্রিক ফিরে আসবে হোটেলে আর আমি থেকে যাবো। মিঃ মুলার আমাদের স্বাগত জানিয়ে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। চারিদিকে লম্বা কাচের পাত্রে প্যারাফিন জ্বলছে আর তার সুগন্ধে সারা ঘর ভরে আছে। আমরা সবাই একটি টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসলাম। ভদ্রলোক প্রথমেই আমাদের প্রত্যেকের সামনে একটি করে পাত্রে পানীয় রাখলেন। তারপর বাইবেল থেকে কিছু পড়তে পড়তে হাতের ইশারায় আমাদের সেটি পান করে ফেলতে বললেন। আমরা তাই করলাম। এরপর তিনি বাকিদের চলে যেতে অনুমতি দিলেন। ওরা সবাই থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও একপ্রকার জোর করেই ভদ্রলোক ওদের চলে যেতে বললেন। অগত্যা সকলে চলে গেলো। আমি কিছুক্ষণ একাকী ঘরটিতে বসে রইলাম।

কিছু সময় পর ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। তার গায়ে প্রাচীন রোমান পুরোহিতদের মতো পোশাক। খানিকটা আলখাল্লার মতো, মাথার ওপর একফালি কাপড় চাদরের মতো জড়ানো। তারপর তিনি আমার সোজাসুজি টেবিলের অপর প্রান্তে বসে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কিছু একটা উচ্চারণ করে গেলেন। সেটি শেষ হলে আমার কাছ থেকে ক্যামেরাটি চাইলেন। আমি ক্যামেরাটি বের করলাম, ভাঙা গ্লাসবক্সটিও টেবিলের ওপর রাখলাম। তিনি ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরলেন। ঘরের জানালা থেকে সরু আলোর রেখা এসে পড়েছিল টেবিলের

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ওপর। সেই ক্ষীণ আলোতে ক্যামেরাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যে দেখলেন আমার বোধগম্য হল না। এরপর তিনি ক্যামেরাটিকে ভাঙা গ্লাসবক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে ছড়ানো একটি পাত্রের ওপর তুলে নিলেন। এরপর আমাকে কাগজে ইংরেজি অক্ষরে উদ্ভট উচ্চারণের কিছু শ্লোক জাতীয় মন্ত্র লিখে দিলেন এবং বললেন, যখন আমাকে বলা হবে ঠিক তখনই যেন আমি এই মন্ত্রগুলি পড়তে শুরু করি।

এরপর ভদ্রলোক আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। আমি যেমন বসেছিলাম তেমনই রইলাম। সামনে টেবিলের ওপর বাক্স সমেত ক্যামেরাটি রাখা। উনি দুহাতে আমার দুই কান চেপে ধরলেন, আর বললেন পড়া শুরু করতে। আমি সাবধানে পড়তে শুরু করলাম। অজানা ভাষার উচ্চারণ চেনা অক্ষরেও পড়ে যাওয়া যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার। তবু একটা ব্যাপার ভালো, শ্লোকগুলির কোন শব্দই অত্যাধিক বড় নয়। জার্মান ভাষায় যেমন এক একটি শব্দ আছে বিরাট লম্বা, এটি সেরকম নয়। দেখেশুনে পড়ে যেতে লাগলাম।

পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার গালে ও নাকে হাল্কা সুড়সুড়ির মতো অনুভূতি হল। দেখতে দেখতেই আমার হাতে ধরা পৃষ্ঠার ওপর মাঝারি সাইজের কালো কালো চুল পড়তে শুরু করলো। ভয় পেয়ে বোধহয় মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিলাম, মিঃ মুলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সতর্ক করে দিলেন। আমি পুনরায় পড়ে যেতে লাগলাম। শেষ করে যখন থামলাম, তখন আমার সামনে টেবিলের ওপর গোছা গোছা চুলের রাশি পড়ে রয়েছে। ভদ্রলোক আরেকটি জিনিসের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। ক্যামেরাটির গ্লাসবক্সের দিকে চেয়ে দেখালাম সেটি সম্পূর্ণভাবে আগের মতো হয়ে গিয়েছে। একটিও ফাটল বা চির ধরার দাগ নেই তাতে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পার হল। বুকের ভিতরে ধুকপুকানি চলছেই। ভদ্রলোক বললেন যে আজ রাতে যদি অস্বাভাবিক কোন ঘটনা না ঘটে তবে বোঝা যাবে আমি এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। একইভাবে আরো আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হল। কোন অলৌকিক কিছু ঘটল না। এরপর ভদ্রলোক আমাকে আরেকটি পানীয় এনে দিলেন। সেটি পান করে ভীষণ ঘুম পেলো। সেই ঘরেই একটি সোফার ওপর তিনি আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই তিনি আমার সামনে এক পেয়ালা কফি এনে রাখলেন। সুপ্রভাত জানিয়ে আমি রাতের বাকি ঘটনা জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে আগে হাতমুখ ধুয়ে নিতে বললেন। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। আমার মাথায় একটিও চুল নেই, মাথাজোড়া টাক চকচক করছে। বেরিয়ে এসে দেখি মিঃ মুলার হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি চুপ করে সোফার ওপর বসে কফিতে চুমুক লাগালাম।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন এই ক্যামেরাটি যেন আর কখনো ছবি তোলার কাজে ব্যবহার না করা হয়। ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়েই সেই রোমানি জিপসি মহিলার অভিশাপ আমাকে গ্রাস করে। আমি জানতে চাইলাম যদি কোনোভাবে প্রথমবারই একাধিক মানুষের ছবি তোলা হতো তবে কি সকলেই 'পসেস্‌ড্‌' হতো? তিনি বললেন এই মহিলার আত্মা যার ওপর ভর করছে তার শারীরিক কোন ক্ষতি করে না। এই আত্মাটি কেবল মানুষের অবচেতন মনকে বশ করে। এককথায় বোঝাতে গেলে একে ভূত বা প্রেত না বলে স্রেফ দুঃস্বপ্ন বলাই ভালো। 'ফন অ্যাল্পট্‌হম ব্যসেসেন' বা ইংরেজিতে বললে 'Possessed by Nightmare'। সেক্ষেত্রে হয়তো সকলেই দুঃস্বপ্নের কবলে পড়তো।

আমার চুল পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বললেন সেটি সাময়িক প্রভাব। ধীরে ধীরে আবার চুল উঠবে। বুঝলাম সব। কিন্তু ক্যামেরাটি নিয়ে এখন আর কি করতে হবে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন এটি নির্দ্বিধায় ঘরে রাখা চলতে পারে, কেবল ব্যবহার না করলেই হল। তাও ভালো! কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম রেচেল আর ভন এসে হাজির। সব শুনে ওরাও হাফ ছেড়ে বাঁচল। আমি ক্যামেরাটি সঙ্গে নিয়ে ফেরার আগে ভদ্রলোককে অনেক কৃতজ্ঞতা জানালাম। রেচেল খুব সম্ভবত ওনাকে কিছু ইউরো দিল গবেষণার ডোনেশান হিসেবে।

এরপর থেকে আর রাত্রিকালীন ভয়াবহতার পুনরাবৃত্তি হয়নি। দিন কয়েক বাদে অনলাইন সেলিং ওয়েবসাইটে ক্যামেরাটি বিক্রির বিজ্ঞাপন ছেড়ে দিলাম। ডিসেম্বরে ওয়ার্কশপের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা সান ফ্রান্সিস্কো ফেরার তোড়জোড় শুরু করলাম। এমন সময় আমার বাড়ি থেকে খবর এলো আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই দেশে ফেরা জরুরী। সেইমতো ব্যবস্থাও করে ফেললাম। ক্যামেরাটি সঙ্গে নিয়ে ক্রিস্টমাসের আগেই ইন্ডিয়াতে চলে এলাম, একেবারে আমার শহর কলকাতায়। এখানে এসে পুরনো কিছু বন্ধুর মারফৎ রাসেল স্ট্রীটের এক অকশান এজেন্টের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি আমাকে খরিদ্দার জোগাড় করে দেবেন কথা দিলেন। সেই সূত্রে ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে একজন তামিল কালেক্টরের সঙ্গে আমার আলাপ হল। সে লিখিতভাবে আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল যে এই ক্যামেরা সে ছবি তোলার কাজে কখনোই

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ব্যবহার করবে না, এবং এর ব্যতিক্রম ঘটলে কোনভাবেই আমি দায়ী থাকব না। সে আরো জানালো যে জিনিসপত্র ব্যবহার করার থেকে সেগুলি সাজিয়ে রাখতেই সে বেশি পছন্দ করে। তারপর পেপারওয়ার্ক শেষে ক্যামেরাটি গ্লাসবক্স সমেত তুলে দিলাম তার হাতে। চিরতরে বিদায় সাধের এহল্লাই!

ক্যামেরাটি বিক্রির পর কিছু সময় বেশ মন খারাপ লাগলো। তবু মনে হল এজিনিস বাড়িতে রাখাও যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। আমার পক্ষে এটিকে কাছে রাখা একদমই ঠিক নয়। ঐতিহাসিক মূল্য তো সেই কবেই অভিশাপের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে, তাই দুঃখ পেয়ে লাভ নেই। খানিক আগে রেচেলকে ফোন করেছিলাম। সে এখন আমেরিকার ওয়েস্ট কোস্টে ছুটি কাটাচ্ছে। বিক্রির খবর শুনে খুশী হয়ে আমার কাছে ডায়েরীটার কথা জানতে চাইলো। আমি যে সেটি বিক্রি না করে আমার কাছেই রেখেছি, তা ওকে জানালাম না। শুধু বললাম –

-"ইউ নো, দ্যাট্ ব্লাডি ক্রিমা পার্সোনালি মেট অস্কার শিন্ডলা। বাট্ দ্য বাস্টার্ড ডিডন্ট্ রেকগ্নাইজ হিম।"

অলঙ্করণ: সৌম্যজিৎ দেবনাথ

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কল্পবিজ্ঞানের গল্পঃ

"চুলে কি রঙ করেছ?"

সাতসকালে গিন্নির প্রশ্নটা শুনে শ্যামলবাবুর মেজাজ গেল সপ্তমে চড়ে। শ্যামলবাবুরা বংশানুক্রমে টাকের ধারক ও বাহক। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই চকচক করছে জটায়ুর মতো মাথাজোড়া টাক। ঘাড় ও কানের ওপর যে ক'গাছা চুল বিশ্বাসঘাতকের মতো টিমটিম করছে সেগুলি নিয়েই সকাল সন্ধ্যে ঝাড়া কুড়ি মিনিট সময় অতিবাহিত করেন। কানের ওপরের চুল দৈর্ঘ্যে ফুটখানেকের মত হয়েছে। সেগুলি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বাকি মরুভূমির অংশটা ঢাকেন।

তবে তাঁর একটাও চুলে পাক ধরেছে একথা কেউ বলতে পারবে না। তাই কলপ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর তিনি একালের ছেলে ছোকরাদের মতো চুলে সোনালি-বেগুনী রঙ করবেন নাকি! সেইজন্যই গিন্নি মণিমালার এই বেমক্কা রসিকতায় বেশ বিরক্ত হলেন শ্যামলবাবু।

তবে দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেলেন দাড়ি কাটার সময় আয়নার সামনে নিজের মুখটা চোখে পড়তে। মণিমালার কথাটা মনের অবচেতনে ছিলই, তাই চুলের দিকে নজর যেতে তাঁর বেশ অবাক লাগল। সত্যিই চুলে বেশ একটা সব্‌জে আভা লক্ষ্য করলেন।

অফিসে মজুমদারবাবু একবার চোখ মটকে বলে গেলেন, "ভায়ার মনে বেশ রঙ ধরেছে দেখছি। সেটা চুলেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

টিফিনের সময় ওয়াশরুমে গিয়ে খেয়াল করলেন সবুজ রঙ-টা যেন আরো স্পষ্ট হয়েছে।

লাঞ্চে ভাত আনেন শ্যামলবাবু। আজ ভাতের সঙ্গে তাঁর প্রিয় ট্যাংরা মাছের ঝাল ছিল, কিন্তু খেতে বসে দেখলেন মাছটা খেতে ইচ্ছে করছে না। অগত্যা সবজি দিয়ে অল্প একটু খেয়েই উঠে পড়লেন।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে মণিমালাকে বললেন "শরীরটা ভাল লাগছে না, ঘুম ঘুম পাচ্ছে। রাত্রে কিছু খাবো না। আমি শুয়ে পড়ছি, আমাকে আর ডেকো না।"

মণিমালা তাঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কপালে হাত দিয়ে বললেন, "নাহ, জ্বরটর তো আসে নি। তবে তোমায় দেখেও ঠিক ভাল লাগছে না, কেমন কালো কালো লাগছে। ঠিক আছে, শুয়ে পড়ো।"

শ্যামলবাবু এমনিতে বেশ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠেন। শরীরটা ভাল নেই বলেই বোধহয়, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রে কিন্তু বেশ গাঢ় ঘুম হয়েছে। তাই আর বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। মণিমালা জোরে জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। শ্যামলবাবু দরজা খুলে বাইরে এলেন।

তাঁদের বাড়িটা কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে। এদিকে এখনো তেমন উঁচু উঁচু কংক্রিটের জঙ্গল গড়ে ওঠে নি। আশেপাশে প্রচুর গাছপালাও আছে। তাঁদের বাড়িটাই তো চার কাঠা জমির ওপর বেশ বাগান টাগান নিয়ে তৈরি। শ্যামলবাবুর বরাবরই গাছপালার শখ। তাই ফাঁকা জমিটুকুতে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু অনেকরকম ফলের গাছ লাগিয়ে রেখেছেন, এছাড়া মরশুমি সবজির চাষও করেন। একটা সিমগাছ লতিয়ে তাঁদের একতলা বাড়ির ছাদে উঠে গেছে। ছাদের ওপর বেঁধে দেওয়া মাচায় অনেক ছোট ছোট সিমও ধরেছে।

বাগানের নৈঋত কোনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ওখানে শ্যামলবাবুর সবথেকে প্রিয় গাছটা ছিল। একটা বকুল গাছ। গাছটা তাঁর মায়ের হাতে লাগানো। দশ বছর হয়ে গেল মা আর নেই। কিন্তু ওই গাছটার গায়ে হাত বুলোলে শ্যামলবাবু যেন মায়ের স্পর্শ পেতেন।

নভেম্বরের সকাল, বাতাসে বেশ হিম হিম ভাব। অনেকদিন পর ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে শরীর আর মন দুটোই বেশ উৎফুল্ল লাগছে। রাত্রে খাওয়া হয় নি, বেশ খিদে খিদেও পাচ্ছে। দিগন্তে উদিত সূর্যের প্রথম আলো শ্যামলবাবুর গায়ে এসে পড়তেই যেন শরীরে শিহরণ খেলে গেল।

বেশ জলতেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু শীতের সকালের রোদ্দুরটা ছেড়ে ঘরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। গাছে জল দেওয়ার জন্য রাখা বাইরের কলটা খুলে আঁজলা করে বেশ কিছুটা জল খেয়ে নিলেন।

"কি হে ভায়া, সাতসকালে ট্যাঙ্কের নোংরা জল খাচ্ছ কেন?"

প্রফেসর বিপিন চাটুজ্জের গলা শুনে শ্যামলবাবু আকাশপানে চেয়ে দেখলেন পাশের বাড়ির ছাদ থেকে প্রফেসরসাহেব গলা বাড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছেন।

"আপনি তো এই সেদিন এ পাড়ায় এলেন। ছোটবেলায় তো আমরা পুকুরের জলও খেতাম। এইসব ওয়াটার পিউরিফায়ার তো সব কালকের গল্প। তার আগে সিমেন্টের ফিল্টার ছিল একটা। তারও আগে এই বাড়ির দু'কিলোমিটারের মধ্যে কোন টিউবওয়েলও ছিল না।" শ্যামলবাবু বেশ লাজুক হেসে এগিয়ে এলেন।

"তা না হয় হল, কিন্তু এখন তো বাপু হোলির সময় নয়। অমন সঙের মত সবুজ রঙ মাখার কী হল সেটা বুঝিয়ে বলবে একটু?"

শ্যামলবাবু চমকে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর বাদামী ত্বকের ওপর শরীরের লোমগুলি সব কচি কলাপাতার রঙ ধারণ করেছে। তাই মনে হচ্ছে লোমশ হাতটাই সবুজ হয়ে গেছে। এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। ছুটে গিয়ে কল চালিয়ে দিয়ে তার নিচে হাতটা রাখলেন। জলের ধারার মধ্যে হাতটা ঘষতে লাগলেন, কিন্তু সবুজ রঙ ফিকে হল না।

"জল দিয়ে ধুলে কী উঠবে? আজকালকার রঙ সহজে উঠতে চায় না। সব জিনিসে ভেজাল। কিন্তু হোলির রঙ দিনে দিনে আরো জবরদস্ত হচ্ছে হে।"

কলের পাশে একটা সাবান রাখা ছিল। সাবানটা নিয়ে হাতে ঘষতে ঘষতে শ্যামলবাবু এবার বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "আহ। খামোকা রঙ মাখতে যাব কেন? কাল দেখছিলাম মাথার চুলগুলো সবুজ, আজ দেখছি গায়ের লোমগুলো সবুজ হয়ে গেছে। এ তো সাবান দিয়ে ঘষেও যাচ্ছে না। কী রোগ এসে বাসা বাঁধল বলুন তো প্রফেসরসাহেব?"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

"বলো কী হে! সবুজ মানুষ! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি আসছি এক্ষুনি।"

২

বছর চারেক হল প্রফেসর বিপিন চাটুজ্জে শ্যামলবাবুদের পাশে বাড়ি করে এসেছেন। সেই সঙ্গে এই পাড়ার শেষ ফাঁকা জমিটারও শূন্যস্থান পূরণ হয়ে গেছে। বিকেলের রোদটা আর বাগানে এসে পড়বে না ভেবে প্রথমটায় শ্যামলবাবুর বেশ মন খারাপ ছিল। কিন্তু প্রফেসরসাহেবের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সেই খেদ আর অবশিষ্ট নেই।

বয়সে বিপিন চাটুজ্জে তাঁর থেকে কুড়ি বাইশ বছরের বড় হলেও আলাপ হওয়ার দিন কয়েকের মধ্যেই একদম বন্ধুর মত মিশে গিয়েছিলেন। অবিবাহিত ভদ্রলোক বিদেশে কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। শেষ জীবনটা নিজের মত করে গবেষণা নিয়ে কাটাবেন বলে দেশে ফিরে এসেছেন। ছ'কাঠা জমিটায় শোয়ার-বসার-রান্নাঘর বাদে দুটি বিশাল বিশাল ল্যাবরেটরি বানিয়েছেন। শ্যামলবাবু বেশ কয়েকবার সেসব দেখেছেন কিন্তু তাঁর স্কুলের ল্যাবরেটরির কথা মনে পড়া ছাড়া আর কোন কিছু বোঝার ক্ষমতা হয় নি।

"কী রোগ, বা আদৌ কোন রোগ কিনা তা বলার মত সময় এখনো আসে নি।"

তাঁর গায়ের লোম ও চুলের রঙ বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে প্রফেসরসাহেব তাঁকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এসেছেন। এখানেও বেশ কিছুক্ষণ আতস কাঁচ ও আরও কিসব দূরবীক্ষণ না অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেন। আদ্যোপান্ত চুপচাপ থেকেছেন শ্যামলবাবু। অবশেষে প্রফেসরসাহেব তাঁর কাজের লোকের আনা দুকাপ চা-এর এককাপ তাঁকে দিয়ে নিজে এককাপে চুমুক দিতে শ্যামলবাবু আবার তাঁর সেই পুরনো প্রশ্নটা করলেন, "কী রোগ বলে মনে হল? ডাক্তার দেখাতে হবে?"

চায়ের কাপে আরেকটা লম্বা চুমুক দিয়ে প্রফেসরসাহেব আবার বললেন, "আর ডাক্তার তো তোমার কথা বিশ্বাসই করবে না। তোমার অন্য কোন শারীরিক সমস্যা নেই, শুধু গায়ের রঙ ইয়ে চুলটুলগুলো সবুজ হয়ে যাওয়া...ভাববে রঙ করে এসে মস্করা করছ।"

"তাহলে উপায়?"

"শোনো হে মেডিক্যালে মাস্টার ডিগ্রি আমারও আছে। আরও যেসব আছে সেগুলো নাহয় নাই বা শুনলে। তবে যেটুকু বুঝেছি, তোমার মত এমন কেস পাওয়ার জন্য গবেষকেরা হাপিত্যেশ করে বসে থাকে। আপাতত তোমার যদি আপত্তি না থাকে কিছু প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করতে হবে। তেমন কিছু নয়, সাধারণ জ্বর-জ্বারিতে যেমন রক্ত স্টুল ইউরিন দিতে হয় আর কি।"

"আপত্তি আর কিসের, রোগটা তো ধরা পড়ুক।"

"আর ইয়ে কিছুটা চুল আর গায়ের লোম কেটে নেব। যদি কিছু মনে না করো।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামলবাবু বললেন, "নিন, চুলটা একটু কম করে কাটবেন। ইয়ে মানে টাকটা ঢাকতে হয় তো।"

প্রফেসরসাহেবের বাড়ি থেকে ফেরার সময় একবার বাজার ঘুরে এলেন শ্যামলবাবু। কালো কলপ কিনে আনতে হল। অফিসে তো আর সবুজ মানুষ হয়ে যাওয়া যায় না।

বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পর টিফিন বাক্সটা খুলে মনিমালার ভুরু কুঁচকে গেল।

"আজ কি বাইরে খেয়েছ?"

"বাইরে খাব? কেন?"

"তাহলে টিফিন যেমন সাজিয়ে দিয়েছিলাম তেমনি আছে যে?"

"ওহ ভুলে গেছিলাম!"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

"আশ্চর্য! লোকে খেতে ভুলে যায়? খুব কি কাজের চাপ নাকি গো? খিদে পায় নি?"

"হুম।" ছোট্ট করে উত্তর দিলেন শ্যামলবাবু।

"রাতে তাহলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও।"

"নাহ, কিছু খাব না। ঘুম পাচ্ছে খুব। এক বোতল নুন চিনির সরবত করে দাও তো।"

শ্যামলবাবুর আজ সারাদিন কিছু খেতে ইচ্ছে করে নি। তবে অফিসের পিওনকে পাঠিয়ে ফুটপাথের সরবতওলার কাছ থেকে বেশ কয়েকবার ঠাণ্ডা নুনের সরবত আনিয়ে খেয়েছেন। খালি নুন আর জল খেতেই ইচ্ছে করছে, ব্লাড প্রেশারটা একবার মেপে নিতে হবে কাল।

রাত একটা বাজে। নানা দুশ্চিন্তায় মণিমালার ঘুম আসছে না। পাশেই শ্যামলবাবু অকাতরে ঘুমচ্ছেন। দক্ষিণের জানালা দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁদের বিছানার ওপর। পর্দাটা টেনে দেওয়ার জন্য বিছানা থেকে নেমে মণিমালা গেলেন জানালার কাছে।

বাগানের দক্ষিন-পশ্চিম কোণের দিকে চোখ যেতেই মণিমালার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ওখানে ছিল সেই বকুল গাছটা। গত সপ্তাহে ঝড়বৃষ্টির সময় গাছটায় বাজ পড়েছিল। বাজপড়া গাছ বাড়িতে রাখতে নেই, তাই কেটে ফেলা হয়েছে। স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে গুঁড়ির অংশটুকু। কাণ্ডটাও পড়ে আছে বাগানের এক পাশে।

কিন্তু বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে মণিমালা দেখলেন, গত পনেরো বছর যেমন দেখে আসছেন ঠিক তেমনই সেখানে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বকুল গাছটা। উত্তরে হাওয়ায় অল্প অল্প পাতাগুলি নড়ছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় অন্য সব বড় গাছের ছায়া পড়লেও বকুল গাছটার কোন ছায়া পড়ে নি মাটিতে। গাছের নিচে জ্যোৎস্না খেলা করছে।

ভয়ে জানালা থেকে পিছিয়ে এলেন মণিমালা। চিৎকার করতে গিয়ে দেখলেন গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না তাঁর। ঘুমন্ত শ্যামলবাবুকে বেশ জোরে জোরে ধাক্কা মারলেন, কিন্তু শ্যামলবাবু নিঃসাড়ে পড়ে রইলেন অচেতনের মতো।

মাথার কাছে টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল খেয়ে কিছু পরে একটু ধাতস্থ হলেন মণিমালা। মনে সাহস সঞ্চয় করে দরজা খুলে বাগানে এলেন। কিন্তু এখন আবার সব স্বাভাবিক। বকুল গাছের কাটা গুঁড়িটাই শুধু পড়ে আছে – যার ওপর সারা সন্ধ্যে শ্যামলবাবু বসে থাকছেন এই ক'দিন।

হঠাৎ মণিমালার মাথায় চমক খেলে গেল। শ্যামলবাবুর চুল আর গায়ের লোমের রঙ সবুজ হয়ে যাওয়া, ওই গাছটার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষন – সব কিছু একটা দিকেই নির্দেশ দিচ্ছে। তাহলে কি বাজ পড়ে মরে যাওয়া বকুল গাছটার আত্মা এসে ভর করল শ্যামলবাবুর ওপর?

বাকি রাতটা আর দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না মণিমালা। পরের দিন শ্যামলবাবু অফিসে চলে যাওয়ার পর টিভি চালিয়ে আনমনে বসে ছিলেন। জানালা দিয়ে চোখ বারবার চলে যাচ্ছে বাগানের দিকে। একটা অজানা ভয় ক্রমশ তাঁকে গ্রাস করছে। টিভিতে কী চলছে সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা নাম শুনে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

"আমাদের সঙ্গে এখন রয়েছেন তান্ত্রিক গুরু ত্রিকালভৈরব। যে কোন সমস্যায় ফোন করুন নিচের নম্বরে। জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান।"

৩

রবিবার সকালবেলা প্রফেসরসাহেবের ছোট ল্যাবরেটরিতে বসে আছেন শ্যামলবাবু। এই ল্যাবরেটরিটা ওনার বাড়ির ছাদে এবং এখানে এই প্রথম ঢুকলেন তিনি। আর ঢুকেই চমকে উঠেছিলেন। কারণটা আর কিছুই না। ল্যাবরেটরিতে সবুজ রঙের আধিক্য।

কাঁচের বয়াম, বিকার, টেস্টটিউবে রাখা রসায়নিক থেকে শুরু করে, ঘরের আলো, এমনকি যে চেয়ারে এখন বসে আছেন শ্যামলবাবু তার

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

গদির রঙটাও সবুজ। হ্যাঁ, আর আছে একটা দাঁড়ে ঝোলা টিয়াপাখি।

"হ্যাঁ, ওই টিয়াপাখিটার পালক যে কারণে সবুজ তোমার গায়ের লোমও সেই একই কারণে শ্যামল। এতদিনে তুমি সার্থকনামা হলে।" মিটিমিটি হাসছেন প্রফেসরসাহেব।

"দেখুন আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আপনি এখনো ঠাট্টা করছেন? আদৌ কি বুঝতে পারলেন এই সবুজ রঙের কারণ?"

"কিছুটা বুঝেছি তো অবশ্যই। কিন্তু তোমায় যদি বলি পোর্ফিরিন রঞ্জক আর অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক বিক্রিয়ার ফল এই সবুজ রঙ এবং তার সঙ্গে অবশ্যই আছে আলোক প্রতিসরণের খেলা তাহলে কি কিছু বুঝবে?"

শ্যামলবাবুর চোয়াল ঝুলে গেল।

"সেইজন্যই তো সহজ করে বোঝানর চেষ্টা করছি। দেখো, আশেপাশে যে গাছপালা আমরা দেখতে পাই তার পাতা সবুজ হয় কেন মোটামুটি সবাই জানি।"

"ক্লোরোফিল!" শ্যামলবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

"আহা! নেচো না। কিন্তু প্রাণীদেহে তো ক্লোরোফিল থাকে না। তাহলে এই টিয়াপাখির রঙ সবুজ হল কী করে?"

"থাকে না?" শ্যামলবাবু বিড়বিড় করে বললেন।

"ভেবে দেখো, টিয়াপাখির গায়ের রঙ কিন্তু সবুজ নয়। ওর পালকের রঙ সবুজ। যেমন বর্তমানে তোমার চুল।"

"হ্যাঁ। তাই তো, তাহলে গাছ না হয়ে পাখি হয়ে যাচ্ছি বলছেন? টিয়াপাখি?"

"আবার তোমার চুলে যে আরও কিছু পাচ্ছি, ক্লোরোফিলের সঙ্গে মিল আছে কিন্তু ক্লোরোফিল নয়। এমন এক মৌল যা আমার একদম অচেনা।"

"আর ব্লাড রিপোর্ট?"

"সেসব একদম নরমাল। আচ্ছা, তোমার শরীরে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ? কোন অসুবিধা, অস্বাভাবিকতা?"

"তেমন কিছু না, তবে খিদেটা একদমই পাচ্ছে না, আর সন্ধ্যে হলেই খুব ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ভোর হলেই একদম ফ্রেশ।"

"হুম। গাছের মতই, বলো? তাহলে কি নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছ না কি? এই ক'দিনে তো চেহারায় আরও জেল্লা দিচ্ছে দেখছি।"

"প্রফেসরসাহেব, আপনি এখনো মজা করছেন?"

"মজা নয় হে, আমি যে কাজের জন্য সব ছেড়েছুড়ে এখানে চলে এসেছি, মনে হয় তার ফল পেতে চলেছি।"

"তার মানে?"

"এই যে গ্রিন রুমটা দেখছ এটা কিন্তু থিয়েটারের নয়, আমার গবেষণার বিষয় এমন এক ধাতু যার কল্পনা মেণ্ডেলিফও করতে পারে নি। মানে সেই ধাতু আবিষ্কার করতে পারলে পিরিয়ডিক টেবিলে তাকে আলাদা জায়গা দিতে হবে। এবং আমার এ পর্যন্ত গবেষণার ফল বলছে সেই ধাতুর রঙও তোমার চুলের মত সবুজ।"

"বলেন কী?"

"কিন্তু আমি এটাও নিশ্চিত যে পৃথিবীতে সেই ধাতুর অস্তিত্ব নেই।"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

"তাহলে?"

"সেটাই তো প্রশ্ন, তাহলে তোমার চুলে এমন এক মৌল এল কীভাবে যার ধর্মের সঙ্গে আমার কল্পিত ধাতুর প্রায় নব্বই ভাগ মিল পাচ্ছি।"

রবিবারের খাওয়াটা বরাবরই বেশ আয়েস করে সারেন শ্যামলবাবু। আজ কিন্তু এ ক'দিনের মতই খিদে অনুভব না করায়, একটুখানি খেয়ে উঠে পড়লেন। রবিবার দুপুরের ঘুমটাও তার বড় প্রিয় ছিল। আজ ঘুমও পাচ্ছে না, তাই খাওয়ার পর তিনি বাগানে এলেন শীতের রোদ্দুরে একটু দাঁড়াবেন বলে।

"শোন না, তুমি বাগানে বেশীক্ষণ থেকো না।" শ্যামলবাবুর পেছন পেছন তাঁর স্ত্রীও বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর কথায় শ্যামলবাবু বেশ অবাক হলেন।

"কেন? কী হয়েছে?"

"আমার কেমন ভয় করছে, ওই বকুল গাছটা, ওটার বেশী কাছে যেও না।"

শ্যামলবাবু বেশ অবাক হলেন। মণিমালা সেটা বুঝতে পেরে বললেন, "বাজ পড়া গাছ খুব অমঙ্গলের। সেদিন ভৈরববাবাও বললেন, তোমার এই চুলটুল সবুজ হয়ে যাওয়ার জন্য নাকি এই গাছটাই দায়ী। আমাদের ক্ষতি করতে চায় এমন কেউ ওই গাছের মাধ্যমে তোমার কিছু করেছে।"

"এসব তুমি কী বলছ? তুমি কবে থেকে এসব বাবাজী টাবাজীর কাছে যেতে শুরু করলে?"

"যাই নি, আজ যাব। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। অনেক কষ্টে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট যোগার করেছি।"

"মণিমালা, তুমি জানো আমি এসব বিশ্বাস করি না।"

"জানি, কিন্তু তুমি বল, এই যে গায়ের রঙ সবুজ হয়ে যাওয়া এটাও কি কোন স্বাভাবিক জিনিস? কোনদিন দেখেছ এরকম? আর তাছাড়া..."

"তাছাড়া কী?"

"তাছাড়া সেদিন রাতে আমি যা দেখলাম তা শুনলে তুমি হয়তো আমাকে পাগল ভাববে, কিন্তু সত্যি বলছি আমি একদম পরিষ্কার দেখেছি।"

স্ত্রীর কাছে সেদিন রাত্রে বকুলগাছটার জীবন্ত হয়ে যাওয়ার কথা শুনে শ্যামলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "হয়তো তোমার কথা আমি সত্যিই উড়িয়ে দিতাম, যদি না আমার নিজের এই অবস্থা হত। কিন্তু তোমার ওই তান্ত্রিক বাবাজীর কাছে যাওয়ার আগে একবার ঘটনাটা প্রফেসরসাহেবকে জানানো উচিত বলে মনে হয়।"

প্রফেসর বিপিন চাটুজ্জে সব শুনে বললেন, "এই তো! এইবারে একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। গত সপ্তাহে তোমাদের বাগানে বাজ পড়ার ঘটনাটা তো আমি জানতাম। কিন্তু শ্যামলের সবুজ মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে এর যে কোন সম্পর্ক আছে তা আগে বুঝতে পারি নি। চলো তো একবার গাছটার কাছে।"

গাছের গুঁড়ি ও কাটা কাণ্ডটা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন প্রফেসর। তারপর গাছের গোড়া থেকে কিছুটা মাটি সংগ্রহ করে নিলেন। একটা ছুরি চেয়ে গাছের কাণ্ডটার থেকে কিছুটা ছাল ছাড়িয়ে নিলেন। একবার নিজের বাড়িতে গিয়ে সেসব রেখে নিয়ে এলেন একটা বিকারে বেশ খানিকটা সবুজ তরল, ও একটা স্টেথোস্কোপ। স্টেথোস্কোপ বসিয়ে বসিয়ে গাছের কাণ্ডটার ওপর যেন হৃদস্পন্দন শুনতে লাগলেন। শ্যামলবাবু আর মণিমালা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাঁর কাণ্ডকারখানা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সবার শেষে প্রফেসরসাহেব সবুজ তরলটা গাছের কাণ্ডের মধ্যে এক জায়গায় ঢেলে দিলেন। একটু পরে একটা চিমটি দিয়ে কিছু একটা তুলে খালি বিকারটাতে রাখলেন। শ্যামলবাবু উঁকি মেরে দেখলেন দুটো মরা ডেঁয়ো পিঁপড়ে, সবুজ তরল লেগে সবুজ হয়ে আছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রফেসরসাহেব যাওয়ার আগে মণিমালাকে বললেন, "বৌঠান, আমি কারো বিশ্বাসে আঘাত হানতে চাই না। আপনার যদি মনে হয় তান্ত্রিক এসে শ্যামলের এই রোগ সারাতে পারবে, তবে আপনি তান্ত্রিক ডেকে ঝাড়ফুঁক করাতেই পারেন। এমন অনেক জিনিস আছে যা বিজ্ঞানের অজানা, কিন্তু তাই বলে সবকিছু নস্যাৎ করে দেওয়াটাও কাজের কথা নয়।"

৪

এ বছর ঠান্ডাটা বেশ জমিয়ে পড়েছে। সাধারণত ডিসেম্বরের শুরুতেই এত ঠান্ডা পড়ে না। তার উপর কুয়াশার দাপট। রাত দশটা এগারোটা নাগাদই চার পাঁচ ফুট দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না।

বাগানের অনেকটা পরিষ্কার করা হয়েছে। নৈঋত কোনে বড় করে জ্বালানো আগুনের তাপে এই ঠান্ডায় বেশ আরামই লাগছে। তবে সেই আগুন ঘিরে বসে থাকা মানুষগুলিকে মনে হচ্ছে অপার্থিব জগতের কায়া। বকুল গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর চোখ বন্ধ করে বসে আছেন শ্যামলবাবু। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে অল্প অল্প দুলছেন। অগ্নিকুন্ডের একপাশে মণিমালা, অন্য পাশে প্রফেসরসাহেব এবং তাঁদের সঙ্গে সমকোণে বসে আছেন লাল কাপড় পরিহিত জটাজূটধারী তান্ত্রিকগুরু ত্রিকালভৈরব ও তাঁর এক সহকারী।

সেদিন প্রফেসরসাহেব চলে যাওয়ার পর মণিমালা এবং শ্যামলবাবু গিয়েছিলেন ত্রিকালভৈরবের চেম্বারে। সামনাসামনি সমস্ত কথা শুনে তান্ত্রিকগুরু নিদান দিয়েছিলেন এক যজ্ঞ করার। তাঁর নির্দেশেই আজ শুক্লা একাদশীর রাতে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। তান্ত্রিকগুরু এসেছেন সূর্যাস্তের পর, কিন্তু তাঁর চ্যালা আগে থেকে এসে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছে।

শ্যামলবাবুর অনুরোধে প্রফেসরসাহেবও সম্মত হয়েছেন এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকার। তিনি অবশ্য বিকেলবেলাতেই চলে এসেছেন। এসেই বললেন, "বৌঠান, আপনার তান্ত্রিক তাঁর যোগবলে কতটা কার্যসিদ্ধি করতে পারবে জানি না, তবে আমি মনে হয় শ্যামলের রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছি।"

এ কথা শুনেই শ্যামলবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উনি বললেন, "তাহলে আর যজ্ঞ টজ্ঞের কী দরকার! ওষুধটা দিন, খেয়ে ফেলি।"

"এ কী ম্যাজিক নাকি? ওষুধ খাবে আর সবুজ রঙ কালো হয়ে যাবে? জ্বর হলে কি একদিনে সেরে যায়? এও তেমন সময় লাগবে। তাই দেখাই যাক না বাবাজীবন কিছু ভেলকি দেখাতে পারে কি না। আর বৌঠানের সেদিন রাতের অভিজ্ঞতারও তো একটা হিল্লে হওয়া দরকার। সে ব্যাপারে তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না এখনো পর্যন্ত।"

"তাহলে রোগটা কী সেটা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন?"

"তা না ধরতে পারলে ওষুধ বের করলাম কী করে হে?" প্রফেসরসাহেব থেমে থেমে বললেন, "শোনো, ঘাবড়ে যেও না, তোমার রোগ পৃথিবীতে এই প্রথম। আসলে রোগটা পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে।"

"মানে!"

"মানেটা খুব জটিল হে। খুব সহজ করে বললে সেদিন তোমাদের বাগানে বাজ পড়ে নি। একটি অন্য গ্রহের মহাকাশযান ভেঙে পড়েছিল ওই বকুলগাছের ওপর। পৃথিবীর বায়ুস্তরের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে সেই মহাকাশযানটা ধুলো ধুলো হয়ে যায়। কিন্তু কোন এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই মহাকাশযানে থাকা অন্য গ্রহের প্রাণীরা রক্ষা পেয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওই গাছের কাণ্ডে। সেই প্রাণীদের সঙ্গে তাদের গ্রহের জীবাণুরাও এসেছে। মায়ের হাতে বসানো গাছটা কেটে ফেলায় ওই গাছের গুঁড়ি আর ডালপালাগুলির সঙ্গে শ্যামলের অতিরিক্ত মেলামেশার ফল ওই জীবাণুর সংক্রমণ ও সবুজ মানুষে রূপান্তর।"

শ্যামলবাবু ও মণিমালা নির্বাক হয়ে সব কথা শুনছিলেন। এবার শ্যামলবাবু বললেন, "তাহলে এবার তো এই রোগ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।"

"আপাতত সেটা আটকানোই আমার মূল লক্ষ্য। অবশ্য ইতিমধ্যেই আমি তার প্রতিষেধক বের করে ফেলেছি। বিষে বিষক্ষয় বলে একটা

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কথা আছে। আমার গবেষণায় যে ধাতু আবিষ্কার করার কথা সেদিন বলছিলাম সেটা আমি অতি সামান্য পরিমানে পেয়েছি ওই অন্য গ্রহের প্রাণীদের থেকেই। সেই ধাতুই এই ওষুধের মূল উপাদান।"

"সেই প্রাণীদের কোথায় পেলেন?"

"কেন? সেদিন বকুলগাছটা থেকে বের করে নিলাম দেখলে না? ওহ, তুমি কি ওদের সবুজ পিঁপড়ে ভেবেছ?"

"ওই পিঁপড়ের মত প্রাণীদের মাথায় এতো বুদ্ধি?"

"শরীরের আয়তন দিয়ে কি কারো বুদ্ধির বিচার হয়? তাহলে তো আমার থেকে তোমার বুদ্ধি বেশী হত শ্যামল।" প্রফেসরসাহেব মিটিমিটি হাসছেন, "কিন্তু দু'টি নয় আরও সবুজ পিঁপড়ে বাসা বেঁধে আছে তোমাদের সাধের বকুল গাছে। দেখা যাক আজ ত্রিকালদর্শী ভৈরব বাবাজীবন কতদূর তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারেন।"

যজ্ঞের আগুনের একপাশে রাখা আছে বাজ পড়ে পুড়ে যাওয়া বকুল গাছের কাণ্ডটা। ত্রিকালভৈরব প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলেন কাণ্ডটা আছে না বেচে দেওয়া হয়েছে। আছে শুনে বলেছিলেন, "তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল।"

তবে যজ্ঞের আগুনের জন্য আলাদা করে বেলকাঠ আনা হয়েছে। এখন তিনি বিড়বিড় করে কিসব মন্ত্র পড়ছেন আর মাঝে মাঝে হাতের কাপড়ের থলে থেকে ধুলো ধুলো কী সব মুঠো করে বের করে আগুনে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সেই সময় আগুন দপ করে আরো বেশী শিখা ছড়াচ্ছে।

মণিমালা ভীত-সন্দিগ্ধ চোখে ত্রিকালভৈরবের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। টিভি বা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে তান্ত্রিক গুরুজিকে যেমন দেখা যায় এখনকার চেহারার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। কপালে ইয়াব্বড় এক রক্ততিলক, চোখে মনে হয় কাজল বা সুরমা জাতীয় কিছু পরেছেন, কারণ দুই চোখের চারপাশ কুচকুচ করছে কালো। গলায় ও হাতে বিভিন্ন মাপের রুদ্রাক্ষের মালা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল জটার মতো চূড়ো করে বেঁধেছেন। সামনে একটি করোটিতে মণিমালার করে আনা ধূমায়িত লাল চা। প্রফেসরসাহেব অবশ্য একবার ফিসফিস করে বলেছিলেন ওই করোটি নাকি চিনেমাটির। যাই হোক না কেন, সব মিলিয়ে ত্রিকালভৈরবের সঙ্গে কোন ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রে দেখানো ভয়ংকর দর্শন তান্ত্রিকদের এখন অমিল নেই।

মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেও বেশ নাটকীয়তা আছে। বিড়বিড় করে বলতে বলতে একেক সময় পিলে চমকে দেওয়ার মত চিৎকার করে উঠছেন। কী ভাগ্যিস মণিমালা আগে থেকেই পাড়ায় জানিয়ে রেখেছিলেন আজ তিনি বাগানে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তাঁর মন্ত্রগুরুর নির্দেশে। বাইরের লোক কারো সে যজ্ঞে যোগদান করার অনুমতি দেন নি গুরুজি। নাহলে এই মাঝরাতেও এতক্ষণে লোক জমা হয়ে যেত।

একসময় যখন অগ্নিশিখা লেলিহান রূপ ধারণ করল তখন ত্রিকালভৈরব তাঁর চ্যালাকে নির্দেশ দিলেন বকুলগাছের কাণ্ডটা এনে ওই আগুনের মধ্যে বিসর্জন দিতে।

গাছটার আয়তন খুব বড় ছিল না, তার ওপর বাজ পড়ে অধিকাংশ পুড়ে গিয়ে আরও হাল্কা হয়ে ছিল। তাই ওই সিরিঙ্গে চেহারার চ্যালা একাই মাটিতে ঘষে ঘষে টেনে আনতে পারল সেটা।

"এইবার আসল কাজ।" ত্রিকালভৈরব উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে, "এই গাছের ওপর বান মেরে তোর স্বামীর যে ক্ষতি করতে চেয়েছিল তাঁর সমস্ত মন্ত্রবিদ্যা বিফল হয়ে যাবে। আমার যজ্ঞের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এই গাছটা এবার তোরা দুজন মিলে ধরে ওই যজ্ঞের আগুনে আহুতি দে।"

মণিমালা সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়ালেন। শ্যামলবাবু একবার প্রফেসর সাহেবের দিকে তাকালেন। প্রফেসরসাহেব ফিসফিস করে বললেন, "যা বলছে করো। আমিও চাই ওই ভয়ংকর প্রাণী পৃথিবী থেকে মুছে যাক।"

শ্যামলবাবু আর মণিমালা এগিয়ে গেলেন গাছের কাণ্ডটা নিয়ে। তারপর দুজন মিলে ঠেলে সেটাকে আগুনে প্রবেশ করানো হল।

প্রথমে যজ্ঞের আগুন কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল। ত্রিকালভৈরব তখন আবার ঘি ও সমিধ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন, সঙ্গে চলতে লাগল

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

তারসপ্তকে মন্ত্রপাঠ। একসময় যজ্ঞের আগুন আবার লেলিহান হয়ে উঠল। আগুনের তাপ এসে লাগছে সবার গায়ে। এই শীতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। এমন সময় গোঁ গোঁ করে এক যান্ত্রিক আওয়াজ শোনা গেল। যেন বহুদূর থেকে একপাল ভ্রমর গুঞ্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। বকুল গাছের কাণ্ডটা আগুনের ভিতর থরথর করে কাঁপছে। ভ্রমরের গুঞ্জন বাড়তে বাড়তে এক সময় এমন হল মনে হল যেন সামনেই কোন উড়োজাহাজ ল্যান্ড করবে। ত্রিকালভৈরব মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ করে ভয়-বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে যজ্ঞের আগুনের দিকে তাকিয়ে আছেন। এক সময় দেখা গেল বকুল গাছের কাণ্ডটা নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াচ্ছে কেটে ফেলা গুঁড়িটার ওপর।

প্রফেসরসাহেব চিৎকার করে বললেন, "সবাই সরে এসো। যতদূর পারো পিছিয়ে এসো। ওরা নিজেদের স্পেশশিপ তৈরি করে নিয়েছে। ফিরে যাবে নিজেদের গ্রহে।"

সবাই ছুটে চলে এলেন শ্যামলবাবুদের বারান্দায়। সেখান থেকেই দেখতে পেলেন আস্তে আস্তে গাছটির পোড়া কান্ড সতেজ হতে লাগল। ডালপালা বিস্তার করে পাতা দেখা গেল। একসময় বকুলফুলের গন্ধে বাগান ম' ম' করতে লাগল।

"ওই দেখুন বৌঠান, আপনি রাত্রিবেলা কিছু ভুল দেখেন নি। তখন ওরা স্পেশসিপ তৈরি করছিল," প্রফেসর বিপিন চাটুজ্জে বললেন, "আপনি হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে পড়ায় তখনকার মত কাজ মুলতুবি রেখেছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রতিদিন রাতেই ওরা স্বদেশে ফেরার তোড়জোড় করছিল। আজ আপনার ত্রিকালভৈরবের যজ্ঞের আঁচ বা মন্ত্রের জোর ওরা সহ্য করতে পারল না।"

এরপর সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল বকুল গাছের গোড়া থেকে বেরিয়ে আসছে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ের মত প্রাণী। উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের। তাঁরা বকুলগাছের গা বেয়ে উঠে সম্পূর্ণ গাছটা আচ্ছাদিত করে ফেলল। এবার ঘটল সবথেকে আশ্চর্য ঘটনা। সবুজ পিঁপড়ের মতো প্রাণীগুলো কোন ছিদ্র দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গাছের ভিতরে প্রবেশ করে গেল। গাছের গোড়ায় দেখা গেল সবুজ আলো। তারপর একসময় গাছটা রকেটের মত আকাশে উড়ে মিলিয়ে গেল।

রইল শুধু বাগানে ওই গাছটা যে জায়গায় ছিল সেখানে এক বিশাল গহ্বর।

অলঙ্করণ: সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

যেহেতু পায়ের নিচে মেঝেটা সরু একফালি সাদা লিনোলিয়ামের স্ট্রিপ মাত্র, আর ধবধবে সাদা দেওয়ালটাই অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়ে মাথার ওপরে ছাদ হয়ে গেছে, তাই রয়ের মনে হচ্ছিল, ও যেন একটা টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

সামনে পড়ে ছিল নিরাপত্তা রক্ষীটির শরীর। হাতে ব্লাস্টার থাকলেও মৃত্যুকে সে ঠেকাতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখটা দেখে, ক'বছরের ক্রাইম বিটের অভিজ্ঞতা নিয়েও, শিউরে উঠছিল রয়।

বিচিত্র এই বডিস্যুট পরে হাঁটা ভীষণ কঠিন, কিন্তু তাই নিয়েও যথাসম্ভব দ্রুত পা ফেলতে হচ্ছিল ওকে। এর মধ্যেই ওর ঘাড়ের ওপর টাইট করে বসানো হেলমেট-টা ভারী হয়ে উঠেছে। কপালে জমে ওঠা ঘামের সঙ্গে ওর শ্বাসও ঝাপসা করে তুলছে হেলমেটের সামনেটা।

কিন্তু অন্য সব অনুভূতি ছাপিয়ে উঠছে সামনে দেখা দৃশ্যের নিচের দিকে ডান কোণে লাল হরফে জ্বলতে থাকা সংখ্যাগুলো, যা বোঝাচ্ছে, ওর হাতে থাকা অক্সিজেনের পুঁজি নিঃশেষিত হচ্ছে অতি দ্রুত।

দেখতে না পেলেও রয় বোঝে, এর থেকেও দ্রুত শূন্য-র দিকে এগোচ্ছে ল্যাবরেটরির দরজার ওপরের ডিসপ্লে-প্যানেল।

দরজার স্লটে ডক্টর কেইন-এর কার্ডটা সোয়াইপ করতেই সবুজ হয়ে ওঠে ওপরের আলোটা। দরজাটা খুলে যায়।

এগিয়ে যায় রয়। মোড় ঘোরামাত্র ও দেখতে পায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ফুয়াদ-কে।

না, ওর মুখে বিকৃতির চিহ্ন নেই বটে, তবে ব্লাস্টারের তীব্র তাপ ওর বুকে একটা নিখুঁত গর্ত করে দিয়েছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে রয়।

এই করিডরটা সোজা, কিন্তু অনেকটা লম্বা, যার অন্য প্রান্তে দরজার পাশে দুই নিরাপত্তা রক্ষীর দাঁড়িয়ে থাকার কথা।

হেলমেটের মধ্য দিয়ে দেখলে সবকিছু 'টানেল ভিশন'-এর মতো করেই দেখায়, যেখানে কাছের জিনিসগুলো সবচেয়ে বড়ো, আর দূরের জিনিসগুলো ছোটো হতে-হতে প্রায় বিন্দুবৎ। কিন্তু তাতেও রয় স্পষ্ট বুঝতে পারল, দরজার পাশে যার দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল সেই রক্ষীটি এই মুহূর্তে মাটিতে পড়ে আছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

শুধু দরজার ওপর লাল আলোটা দপদপ করছে।

ওই আলোর নিচে ওকে পৌঁছতে হবে, যেভাবে হোক।

গা ঘিনঘিনিয়ে উঠলেও ফুয়াদের শরীরটা টেনেহিঁচড়ে এনে, সেটাকে দরজার সেন্সর প্যানেলের গায়ে ঠেকিয়ে রাখে রয়, তারপর আবার এগোতে থাকে।

পিং করে একটা আওয়াজ ভেসে আসে ওর কানে। ও বোঝে, সিকিউরিটি প্রোটোকল মেনে ওর পেছনে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল দরজাটা, যেটা খুলে ও এই করিডরে ঢুকেছিল। আপাতত সেটা ঠেকানো গেছে।

কিন্তু আসল বিপদ, যার সঙ্গে ওর হেলমেটের ভেতরে ফুরিয়ে আসতে থাকা অক্সিজেনের, এমনকি করিডর দিয়ে এই মুহূর্তে বয়ে চলা বিষ-বাতাসের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং ল্যাবের নিচে রাখা মৃত্যুবাহী বাক্সটাই যার উৎস, তাকে কি ঠেকাতে পারবে ও?

রয়ের মনে পড়ে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই করিডর দিয়েই হনহনিয়ে হেঁটে গেছিল ও, শুধু তখন সঙ্গে ছিলেন প্রফেসর ধৃতিমান।

*****

"আমি জানি এই কাজটা আপনার রেগুলার 'বিট'-এ পড়ে না প্রফেসর", যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলছিল রয়, "কিন্তু তা বলে কপালটা এতখানি, আর এতক্ষণ ধরে, কুঁচকে নাই বা রাখলেন"।

"তোমার ভাষায় যেটা 'বিট', আর আমার ভাষায় যেটা ল্যাবরেটরিতে নিজের কাজে ডুবে থাকা", স্বভাবসিদ্ধ চেবানো ভঙ্গিতে বলেন ধৃতিমান, "সেখান থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে বলে আমার খারাপ লাগছে ঠিকই। কিন্তু আমার বিরক্তির আসল কারণ সেটা নয়"।

চুপ করে যান ধৃতিমান। রয় জানে, না খোঁচালে ওঁর মুখ থেকে কথা বের করা শক্ত। তাই ও একটা টোপ ফেলে, "আপনি কি ডক্টর কেইন-এর ওপর কোনো কারণে..."

প্রত্যাশিত বিস্ফোরণ হয় না, বরং একটু বিষণ্ণ গলায় বলেন ধৃতিমান, "কেইন, এবং ওর মতো আরো অনেকে সেই কাজটা অনেক দিন ধরেই করছে, যেটা আমাকে বহুবার করতে বলা হয়েছিল। আমি যে অফারগুলো পেয়েছিলাম, এবং পাই, সেগুলো ওদের পাওয়া যেকোনো প্রস্তাবের থেকেও লোভনীয়। কিন্তু..."

রয় বুঝতে পারে ব্যাপারটা। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অংশে ওরা যাচ্ছে সেদিকটা বিভিন্ন ধনী ব্যক্তির শখ-আহ্লাদ মেটানো, বা কর্পোরেট সংস্থাগুলোর দেওয়া সুনির্দিষ্ট কিছুর প্রোটোটাইপ সংক্রান্ত গবেষণার জন্যেই বানানো।

এখানে যা কাজ হয় তা থেকে সাধারণ মানুষ কোনো ভাবেই উপকৃত হয়না, কিন্তু বাজেটে কাটছাঁটের ধাক্কায় নাভিশ্বাস তোলা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিরুপায় হয়ে এগুলো করতেই হয়।

এটাও ভারি কাকতালীয় যে এথিক্স কমিটির তরফে ওদের দুজনকেই আজ এখানে আসতে বলা হয়েছে ডক্টর কেইন, এবং তাঁর নিজস্ব 'প্রোডাক্ট'-কে ভালো ভাবে দেখার জন্য।

নিজের অজান্তেই গম্ভীর হয়ে ওঠে রয়।

একটা অসহায় নিরপরাধ প্রাণীকে এক বড়োলোকের খেয়াল মেনে গিনিপিগ বানিয়েছে লোকটা। কে জানে কী ভয়ংকর একটি হাঁসজারু বা বকচ্ছপ গোছের জিনিস দেখতে হবে এখন।

শুধু একবার এটা প্রমাণ হোক যে প্রাণীটিকে কষ্ট দিয়ে কাটাছেঁড়া করে এই কাইমেরা বানানো হয়েছে, তারপর ও দেখবে ডক্টর কেইনের ক'বছর শ্রীঘর-বাস হয়!

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ওদের সঙ্গে ডক্টর আলি-র আসার কথা ছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে খবর আসে যে উনি আসতে পারছেন না। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল অবশ্য আলি-র না থাকাটা। ভদ্রলোকের কিছু-কিছু চিন্তাভাবনা এতটাই রণচণ্ডী গোছের, যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাপারটার গভীরে ঢোকা যেত না।

রয় লক্ষ করেছিল, পাহাড়ের মাথায় বানানো এই বাড়ির স্থাপত্যে চেনাজানা গড়নের বদলে একটা সম্পূর্ণ অন্য রকম গঠনশৈলী অনুসৃত হয়েছে। এখানে উপবৃত্তাকার ঘরগুলো গোলাকার বা টানেলের মতো করিডর দিয়ে যুক্ত।

কৌতূহলী চোখে ও তাকিয়েছিল ধৃতিমানের দিকে।

দ্রুত হাঁটার ফলে হাঁফ ধরেছিল ধৃতিমানের। কিন্তু রয়ের কাছ থেকে সেটা আড়াল করার জন্য শীর্ণ চেহারাটা টানটান করে নেওয়ার ফাঁকে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলে চলেন তিনি, "এখানে প্রায়ই এমন সব জিনিস নিয়ে কাজ করতে হয় যেগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে গেলে সাংঘাতিক বিপদ। তাই ল্যাবগুলো এমনভাবে বানানো, যাতে বিপদ ঘটলে সেগুলোকে দ্রুত মূল বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়, যতক্ষণ না বায়োহ্যাজার্ড সামলাতে পারা বিশেষজ্ঞের দল এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়"।

ততক্ষণে ওরা পৌঁছে গেছিল ওই দরজাটার ওপাশে। আর তখনই একগাল হাসি আর হাতে একটা ট্যাব নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এসেছিল ওই লোকটা।

*****

"রয়", হেলমেটের ভেতরে স্পিকারটা হঠাৎই হিসহিসিয়ে ওঠে, তারপরেই ধৃতিমানের গলাটা স্পষ্ট হয়, "তোমাকে আমরা আর দেখতে পাচ্ছিনা। তুমি ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ প্রফেসর", অমূল্য অক্সিজেন আরো কিছুটা ব্যয় করতে বাধ্য হয় রয়, "আমি মূল করিডরে এসেছি। যা আশংকা করেছিলাম আমরা, সেটাই সত্যি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। রক্ষীটি জীবিত নেই।

আর ফুয়াদও এখানেই পড়ে আছে। তবে ওর অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, ও মারা গেছে ব্লাস্টারের আঘাতেই"।

ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকলেও রয় কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত নিজের কর্মপন্থা বদলানোর কথা ভাবছিল।

প্রতিটি সেকেন্ড যেখানে মূল্যবান সেখানে হেলমেট আর বডিস্যুটের এই কম্বিনেশন ওর চলাফেরা মারাত্মক রকম আড়ষ্ট করে তুলেছে। এভাবে চললে ওর পক্ষে সময় থাকতে-থাকতে কিছু করার সম্ভাবনা ক্রমেই কমছে। তার তুলনায়...

ওর মনের কথাটা সম্ভবত আন্দাজ করেছিলেন ধৃতিমান, তাই স্পিকার সরব হয়ে ওঠে তখনই, "হেলমেট খোলার কথা ভেবো না। তুমি এখনও বেঁচে আছ স্রেফ ওটার জন্যেই। ফুয়াদ, মানে যদি লোকটার নাম আসলে ওটাই হয়, এমন কোনো অস্ত্র নিয়ে এগোয়নি যা দিয়ে রক্ষীটিকে দূর থেকে মেরে ফেলা যাবে, কারণ ওর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। কিন্তু তবুও রক্ষীটি মারা গেছে, এটা থেকে একটাই জিনিস স্পষ্ট হয়।

ব্লাস্টারের আঘাতে মারা যাওয়ার আগেই ফুয়াদ আরো একটা ভায়াল বের করার সুযোগ পেয়েছিল। অথবা, হয়তো ব্লাস্টার থেকে বেরোনো রে যেখানে আঘাত করেছিল, ওর অ্যাপ্রনের সেখানেই ছিল ওটা।

অর্থাৎ, ওখানের বাতাসেও এখন শ্বাস নেওয়ার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে আনা"।

ধৃতিমানের গলার আওয়াজটা আবছা হয়ে আসে রয়ের কানে। কান, এবং নজর স্পষ্ট করার জন্যে মাথাটা ঝাঁকানো মাত্র রয়ের মনে হয়, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। কোনো রকমে পাশের দেওয়ালে ভর দিয়ে নিজেকে সামলায় ও, তারপর নিচের ঠোঁটটা কামড়ে দরজার দিকে এগোতে থাকে একটু-একটু করে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আর মিনিট দুয়েকের মধ্যে ওই দরজাটা না খুললে ওদের কারো নিস্তার নেই।

*****

"ডক্টর ধৃতিমান? মিস্টার রয়?" হাসিমুখে এগিয়ে এসে ওদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল লোকটা।

"আমি ফুয়াদ", ওদের হাত ঝাঁকানোর ফাঁকে বলেছিল লোকটা, "যাঁর ফরমায়েশি 'জিনিস' দেখতে চলেছেন আপনারা, আমি তাঁরই সামান্য খিদমতগার।

আপনারা যাতে কোনো ভাবে তাঁর সম্বন্ধে ভুল না ভাবেন, সেজন্যে তাঁকে, বা এই 'জিনিস' বানানো নিয়ে যেকোনো প্রশ্নর উত্তর দেওয়ার এক্তিয়ার আমার আছে। তাই আজকে আপনাদের এসকর্ট আমি, এমনটাই ভাবতে পারেন"।

ধৃতিমানের মুখচোখের অবস্থা দেখে রয় বুঝেছিল, উপায় থাকলে এমন একটা লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে এখনই নিজের হাত ধুতেন তিনি। রয় নিজেও অবশ্য নিজেকে সামলে রেখেছিল, কারণ যতবার ফুয়াদ 'জিনিস' বা প্রোডাক্ট কথাটা বলছিল, ততবারই ওর প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল, লোকটার মুখে একটা জোরালো ঘুষি মারতে।

ফুয়াদ নামের লোকটা কিন্তু ওদের এই অস্বস্তি রীতিমতো উপভোগ করছিল বলেই মনে হয়। তবে কথা না বাড়িয়ে ও 'বাও' করে ওদের দুজনকে নিয়ে এই করিডরে ঢুকেছিল।

ঢোকার সময়ে ওদের কোনো কার্ড সোয়াইপ, বা কি-প্যাডে পাসওয়ার্ড এন্টার করতে হয়নি। ধৃতিমান সংক্ষেপে রয়-কে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এই দরজাগুলো শুধু ভেতর থেকে খোলে, যাতে অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো মতেই ভেতরে ঢুকতে, বা ভেতর থেকে বেরোতে না পারে। দরজার পাশে ব্লাস্টার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষীই শুধু পারে তার কার্ড দিয়ে এই দরজা খুলতে।

লম্বা করিডরটা সোজা এসে একটা বাঁক নিয়েছিল, যার মুখেই ছিল আর একটা দরজা। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় ওদের আসার ব্যাপারটা দেখে, এবং রক্ষীটির কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে এই দ্বিতীয় দরজাটিও খুলে যায় ভেতর থেকে।

একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো, কিন্তু একই রকম আকারের করিডরে এসে পড়ে ওরা, যার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল আরো এক নিরাপত্তা রক্ষী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ঢিলেঢালা, কিন্তু শুধুমাত্র এই একটি ল্যাব ও তার করিডরেই এই বজ্র আঁটুনি ব্যবস্থা দেখে রয় বুঝেছিল, যাঁর জন্যে কাজ হচ্ছে এখানে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তরফে মোতায়েন আছে এই রক্ষীবাহিনী।

করিডরের শেষ প্রান্তে ল্যাবের দরজাটা খুলে যায় এবার। দরজায় দাঁড়িয়ে সহাস্যে ওদের অভ্যর্থনা জানান ডক্টর কেইন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কেইনের ছোটোখাটো চেহারা আর হাসিভরা মুখটা দেখে তাঁর ওপর রাগটা ঠিক জমিয়ে রাখতে পারেনা রয়।

রাগটা পুরোপুরি উড়ে গিয়ে তার বদলে একটা বিস্ময় জমা হয় ওর মনে, যখন ও বুঝতে পারে, কেইনের গলা জড়িয়ে তাঁর পিঠে লেপটে আছে একটা নীল রঙের লোমশ বল।

না, বল নয়। কেইনের মাথার পেছন থেকে উঁকি দেওয়া বুদ্ধিদীপ্ত অথচ নরম চোখজোড়া, আর কেইনের কোমরে জড়িয়ে থাকা মোটাসোটা লেজটা দেখে রয় বোঝে, ল্যাবে 'তৈরি' এই প্রাণীটিকে নিয়ে ও যা-যা ভেবেছিল, তার সবই ভেঙে পড়ছে প্রশ্নোত্তর শুরু হওয়ার আগেও।

ধৃতিমান নিজেও বিস্মিত হয়েছিলেন, তবে সেটা চাপা দেওয়ার জন্যে তিনি নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেও উঠেছিলেন, "যাক, নীল রঙের বাঁদর-দর্শনও হল আমার। আর কিছু বাকি রইল না তাহলে"।

"প্রফেসর! মিস্টার রয়!", রীতিমতো হইচই করে এগিয়ে এসেছিলেন কেইন, "মিট ব্লু"।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কেইনের মাথার পেছনে লুকিয়ে থেকেও জুলজুলে চোখে ওদের দেখছিল বাঁদরটা। সম্ভবত কেইনের গলার আওয়াজেই ভরসা পেল ও, আর ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে।

রয়ের মনে হল, যেন একটা বাচ্চার হাত ধরছে ও। নরম, শুধু তেলোটা খসখসে। বৈজ্ঞানিক-সুলভ নিঃস্পৃহ ভাব নিয়ে এই প্রাণীটিকে পরীক্ষা করা যে কতটা কঠিন হবে, সেটা ভাবার ফাঁকেই ও খুব সাবধানে বাঁদরটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

ধৃতিমান সবিস্ময়ে বাঁদরটাকে দেখছিলেন। সম্ভবত ওঁর চোখেই প্রশ্নটা আন্দাজ করেছিলেন কেইন, তাই তিনি সোৎসাহে বলেন, "নো জেন্টলমেন, ওর গায়ের এই রঙ কোনো ডাই দিয়ে করা নয়। কীভাবে আমরা এই অসাধ্য সাধন করেছি সেটা ট্রেড সিক্রেট। তবে ব্লু আমাদের কাছে এমন কোনো গিনিপিগ বা ইঁদুর নয় যাকে আমরা পরীক্ষাগারে কাটাছেঁড়া করে তৈরি করেছি। আমি আপনাদের দুজনকেই অনুরোধ করব, আপনারা ব্লু-কে খুঁটিয়ে দেখুন, ওর ওপর কোনো রকম নির্যাতন বা জোর খাটানোর নজির পান কি না।

আমি ততক্ষণে আমার গোপন ভাঁড়ারের সীমিত মালমশলা দিয়েই আপনাদের জন্যে কফি বানাই"।

"কিন্তু ডক্টর", ধৃতিমানের গলার আওয়াজটা মোলায়েম হলেও জোরালো ছিল, "এই 'ব্লু'-কে আপনি যার জন্যেই 'বানিয়ে' থাকুন না কেন, একটা নীল বাঁদর তাঁর কেন দরকার হল, সেটা কি কখনও জানতে চেয়েছেন?"

"নাঃ", একটা শ্বাস ছেড়ে উত্তর দেন কেইন, "আমি অনেক দিন আগেই জেনে গেছিলাম, কাস্টমারকে যত কম প্রশ্ন করা যায় তত ভালো"।

ততক্ষণে, সন্তর্পণে ফুয়াদ-এর হাতে ব্লু-কে তুলে দিয়েছিল রয়। কেইন তাঁর ল্যাবে 'কফি' বানাতে গিয়ে পাছে কোনো বেখাপ্পা রাসায়নিক ব্যবহার করেন, তাই ও খুব খুঁটিয়ে কেইনের কাজকর্মই লক্ষ করছিল তখন। তার মধ্যেও হঠাৎ ওর মনে পড়ে সেই লোকটির কথা যে নাকি আজ তাদের এসকর্ট, "প্রফেসর, এই প্রশ্নটার উত্তর তো ফুয়াদ দিতে পারবে, তাই না?"

ঘুরে দাঁড়িয়েই দুজনে দেখতে পায় এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ল্যাবের প্রায় মাঝখানে দাঁড়ানো কেইন আর ব্লু-র কাছে সেই মুহূর্তে ছিল রয়, আর তার একটু পেছনে ধৃতিমান।

ব্লু-কে নিজের হাতের ভাঁজে শক্ত করে ধরে ফুয়াদ ততক্ষণে দরজার বাইরে চলে গেছে, এবং পায়ে-পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে করিডরের অন্য দিকের দরজাটার দিকে।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন কেইন, "লোকটা কে?"

"লোকটা বলেছিল যে ও নাকি আপনার এমপ্লয়ার-এর প্রতিনিধি", ধৃতিমান বলে ওঠেন, "তবে এখন বুঝতে পারছি, পরিচয়টা মিথ্যে ছিল"।

"ওকে ধরো কেউ!", প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন কেইন, "ও ব্লু-কে নিয়ে পালাচ্ছে!"

রক্ষীটি সম্ভবত এই আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহে হতচকিত হয়ে গেছিল, তাই ব্লাস্টারটা তুলতে তার একটু সময় লেগেছিল।

সেই সময়টুকুর মধ্যেই ফুয়াদের হাতে উঠে এসেছিল একটা পাতলা পাত, যেটা নিঃসন্দেহে ওর গায়ের চামড়ার সঙ্গে আটকে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত। পাতটাকে ব্লু-র গলায় চেপে ধরেছিল ফুয়াদ।

ধৃতিমান যে এই পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছেন সেটা বোঝা গেছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো থেকেই, "চমৎকার প্ল্যান! এমন একটা পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরা হল যাতে আমরা বিরক্ত হয়ে বেশি খুঁটিয়ে প্রশ্ন না করি। আবার ঢোকা হল আমাদের সঙ্গেই, যেহেতু নিরাপত্তা রক্ষীদের বলা হয়েছিল, এথিক্স কমিটির তরফে মোট তিন জন আসবে। সবথেকে বড়ো কথা, মেটাল ডিটেক্টরকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সঙ্গে আনা হল সিরামিকের পাত।

সত্যিই আটঘাট বেঁধে এগোনো হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে"।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ফুয়াদ এসব কথা শুনে খুব একটা ইম্প্রেসড হয়েছে বলে মনে হয়নি, কারণ ও চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "কেউ আমার দিকে এক পা এগোনোর চেষ্টা করলে রাবাত-এর এই খেলনা আমার হাতেই শেষ হয়ে যাবে!"

রাবাত!

নামটা শোনা মাত্র রয় চমকে উঠেছিল। কুইপার বেল্টে মাইনিং কন্ট্রাক্ট পাওয়া এই কোটি-কোটিপতি ব্যবসায়ীর নাম ও শুধু শোনেইনি, সহকর্মীদের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে যা শুনেছে তাতে ওর এটাই মনে হয়েছে যে দামি ধাতুর লোভে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই ব্যবসায়ীটির হাতে শ্রমিকদের কার্যত দাস হয়ে যেতে দেখেও লোককথার তিন বাঁদরের নীতি মেনে চোখ-কান-মুখ সব বন্ধ করে রেখেছে।

তাহলে রাবাত-ই ফরমায়েশ দিয়ে বানিয়েছিল ব্লু-কে।

কিন্তু হঠাৎ একটা নীল বাঁদরের কী প্রয়োজন হতে পারে এমন এক ব্যবসায়ীর?

তারপরেই ওর মনে পড়ে, কনফেডারেশনের সদস্য বেশ কিছু দেশে রাবাত ঘোষিত অপরাধী, কারণ লুপ্তপ্রায় প্রজাতির চামড়া বা অন্যান্য অঙ্গ নিয়ে হওয়া বে-আইনি কারবারের অন্যতম শরিক সে, ক্রেতা হিসেবে, এবং বিভিন্ন নামীদামী লোকেদের জন্যে দুর্লভতম উপহারের যোগানদার হিসেবে।

সম্ভবত ব্লু-র ভবিতব্য ছিল রাবাত-এর, বা অন্য কারো গলার স্কার্ফের জন্যে কাঁচামাল হওয়া।

ইতিমধ্যে ও দেখতে পাচ্ছিল, ব্লাস্টারটা নিচে নামিয়ে রেখে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিল রক্ষীটি। ফুয়াদের চোখের ইশারায় নিজের কার্ডটাও বের করে দিতে বাধ্য হয়েছিল সে।

তার মধ্যেই চিৎকার করে উঠেছিলেন কেইন, "ব্লু-কে নিয়ে কী করতে চাও তুমি?"

ফুয়াদ বলে উঠেছিল, "ডক্টর, অর্থের লোভে আপনারা মূল্যবোধ বিসর্জন দিলেও আমরা দিইনি। ওই শয়তানের জন্যে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে যাতে আরো নিরপরাধ মানুষ মারা না যায়, সেজন্যেই আমাদের এই বাঁদরটাকে দরকার। বিশ্বাস করুন, ওর ক্ষতি করতে আমরাও চাই না"।

কার্ডটা নিয়ে, আর ব্লু-কে শক্ত করে ধরে দরজার কাছে পৌঁছে গেছিল ফুয়াদ। ল্যাবের দিকে মুখ ফেরানো অবস্থাতেই কার্ড সোয়াইপ করে দরজাটা খোলার চেষ্টা করছিল ও।

ঠিক তখনই নিজের লোমশ লেজটা দিয়ে ফুয়াদের চোখে একটা ঝাপটা মেরেছিল ব্লু!

টাল সামলাতে না পেরে পেছনে হেলে গেছিল ফুয়াদ। তৎক্ষণাৎ ওর হাতের ভাঁজ থেকে আশ্চর্য কায়দায় পিছলে বেরিয়ে এসেছিল ব্লু, আর বিদ্যুৎ-গতিতে দুধ-সাদা দেওয়ালের গায়ে মিশে থাকা প্রায় অদৃশ্য হাতলগুলো ধরে ঝুল খেতে-খেতে ও এগিয়ে এসেছিল ল্যাবের দিকে।

রয়, আর রক্ষীটি, একইসঙ্গে ছুটে গেছিল ফুয়াদের দিকে। দরজা খোলার সময়টুকুতে রক্ষীটি পৌঁছেও গেছিল তার ফেলে রাখা ব্লাস্টারের দিকে।

ফুয়াদ নিশ্চই বুঝতে পেরেছিল, তার আর পালাবার পথ নেই। হয়তো সেজন্যেই দর কষার জন্যে শেষ সম্বল হিসেবে, অথবা সব শেষ করে দেওয়ার জন্যে, ও একটা লম্বা ভায়াল বের করেছিল অ্যাপ্রনের ভেতর থেকে।

বিপদটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কেইন, তাই ব্লু-কে কোলে তুলে নিতে গিয়েও রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন তিনি, "ডোন্ট শুট!"

কথাটা রক্ষীটি হয় শুনতে পায়নি, নয় কথাটা সে সচেতনভাবে উপেক্ষা করেছিল।

ফুয়াদ ভায়ালটা ছুঁড়ে দিয়েছিল ল্যাবের দিকে। প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বশেই রক্ষীটি ভায়ালের দিকে ফায়ার করেছিল।

একটা নীল তরল ছড়িয়ে পড়েছিল ফোয়ারার মতো। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই বাতাসে মিশে গেছিল তরলের প্রতিটি ফোঁটা।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

দ্বিতীয় শট নেওয়ার আগেই রক্ষীটি ছটফট করতে-করতে পড়ে গেছিল। ফুয়াদ ততক্ষণে দরজার ওপাশে বাঁক নিয়ে দৌড়তে শুরু করেছিল।

দরজাটাও তখনই বন্ধ হয়েছিল আপনা থেকে।

রয় তখন করিডরে। ফুয়াদ ভায়ালটা ছুঁড়ে দেওয়া-মাত্র ও থেমে গেছিল। কিন্তু ধৃতিমানের গলায় "রয়!" বলে চিৎকারটা ওর মাথায় খেলাধুলোর সময়কার স্মৃতিটা জাগিয়ে তুলেছিল।

একটা মরণপণ লাফ দিয়ে ল্যাবে ঢুকেছিল রয়। ল্যাবের দরজাটা বন্ধ হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

আসল দুঃস্বপ্নটা শুরু হয়েছিল তারপর।

*****

নিজের শরীরটা মূল দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল রয়। হেলমেটের স্পিকার থেকে বেরনো আওয়াজ কিছুটা হলেও ওর আচ্ছন্নতা কাটিয়ে দেয়, এবার ডক্টর কেইনের গলায়, "মিস্টার রয়, আমাদের সবার বাঁচামরা এখন আপনার হাতে। আপনি অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছেন, আরেকবার বলে দিচ্ছি দরজার কাছে পৌঁছনোর পর কী করতে হবে আপনাকে।

আপনি প্রথমে আমার কার্ডটা দরজার স্লটে সোয়াইপ করবেন। নিয়মমতো তারপর স্ক্যানারে আমার রেটিনা স্ক্যান হওয়ার কথা, কিন্তু অবস্থা বুঝতে পেরে মাস্টার কন্ট্রোল ওটাকে ওভাররাইড করেছে।

তারপর দরজার একেবারে ওপর দিকে দপদপ করতে থাকা আলোর নিচের বোতামটা টিপে প্রেসার-লক রিলিজ করবেন, না হলে কিছুতেই এই দরজা খুলবে না।

বা, আরো ঠিকঠাক বলতে গেলে, দরজা যতক্ষণে খুলবে ততক্ষণে আর ল্যাবের নিচে রাখা বিস্ফোরকের অটো-ডেস্ট্রাক্ট সিকোয়েন্স থামানোর উপায় থাকবে না।

তাই, যেভাবে হোক, আপনি এগোন।"

কথাটা যতক্ষণ প্রায় চিৎকার হয়ে কানে বাজছিল, ততক্ষণ রয় দম নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কথাটা থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও বুঝতে পারল, ওর প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস হাপরের মতো আওয়াজ তুলছে ওর কানেই।

আর হেলমেটের ভেতরে লাল রঙে জ্বলা-নেভা অক্ষরগুলো হঠাৎই স্থির হয়ে গেছে "ক্রিটিক্যালি লো" ফুটিয়ে তুলে।

বড়োজোর এক মিনিট শ্বাস নেওয়ার মতো অক্সিজেন আছে ওর হেলমেটে।

*****

ল্যাবের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্তের জন্যে রয় এবং দুই বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন, তাঁরা নিরাপদ।

ঠিক তখনই, ল্যাবের নিজস্ব স্পিকারটা সরব হয়ে উঠেছিল প্রবলভাবে।

"ডক্টর কেইন! ডক্টর কেইন! আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

তখনও অ্যাড্রেনালিনের ধাক্কায় বেসামাল কেইন উত্তরে চিৎকার করে উঠেছিলেন দরজার কাছ থেকেই, "হ্যাঁ, আমরা ঠিক আছি। কিন্তু লোকটাকে কি ধরা গেছে?"

স্পিকার কিছুক্ষণ নীরব থাকাতেই রয় বুঝতে পেরেছিল, ওদের বিপদ কাটেনি। কিন্তু সেটা যে কতটা বেড়েছে সেটা ও বুঝতে পেরেছিল

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

একটু পরেই, যখন স্পিকার দিয়ে ভেসে এসেছিল একটা অন্য, তুলনামূলক ভাবে পালিশ-করা, ঠাণ্ডা গলায় বলা কথাগুলোঃ "ডক্টর কেইন, প্রফেসর ধৃতিমান, মিস্টার রয়, আমাদের তরফে আপনাদের এই মুহূর্তে উদ্ধার করায় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আমাদের স্ক্যানার বলছে, করিডরের বাতাসে এমন কিছু একটা রিএজেন্ট রয়েছে, যেটা বাইরে বেরিয়ে এলে খুব বিপদ। আমরা সেজন্য মূল দরজার ঠিক বাইরের অংশটায় হাওয়ার চাপ বাড়াচ্ছি অনেকটা, যাতে দরজা খুললে ভেতর থেকে কিছু বেরোবার আগেই বাইরে থেকে ভেতরে বাতাস ঢোকে। আমরা সেই বাতাসেই অ্যারোসল হিসেবে বেশ কিছু জিনিস ঢুকিয়ে দেব, যা ওই রিএজেন্টকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে।

কিন্তু একটাই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা।

সম্ভবত ল্যাবের ঠিক সামনে ব্লাস্টার ফায়ার হয়েছে বুঝে দরজার সামনে যে নিরাপত্তা রক্ষীটির থাকার কথা, সে প্রোটোকল মাফিক প্রেসার-লক এনগেজ করে দেয়। এখন সে আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। আর দরজাটা ভেতর থেকে প্রেসার-লক রিলিজ না হওয়া অবধি খোলা যাবেনা।

তাই, দরজাটা আপনাদের মধ্যে কাউকে এসে, প্রেসার-লক ডিসএনগেজ করে, খুলতে হবে"।

ঘোষণাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে গেছিল সবাই। এমনকি ব্লু -ও ডক্টর কেইনের কাঁধে প্রায় লেপটে থেকে নিজের মুখটা লুকিয়ে রাখছিল, হয়তো বাতাসে জমে ওঠা টেনশনটা বুঝতে পেরেই।

তারপর মাউথপিসটার কাছে মুখ নিয়ে যান ধৃতিমান।

"যে ভায়ালটা, বা ভায়ালগুলো ভেঙে গিয়ে এই অবস্থা, তাতে ঠিক কী ছিল সেটা আমি জানিনা। তবে মনে হচ্ছে, এমনকিছু মিশেছে হাওয়ায়, যা বাতাসের নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেনকে সক্রিয় করে তুলছে। আমার ধারণা, ব্লাস্টারের আঘাতে ভায়াল ভাঙায় এই প্রক্রিয়াটা আরো দ্রুত ঘটেছে।

করিডরের সবকিছু, মায় আমাদের সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকা এই বডিস্যুট, এগুলোর প্রত্যেকটাই নিষ্ক্রিয়। তাই ওই অ্যাক্টিভ নাইট্রোজেন শুধু খোলা থাকা মুখ বা মাথার সংস্পর্শে আসামাত্র শ্বাসের সঙ্গে বেরনো কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভেঙে নাকের কাছেই তৈরি করছে সায়ানোজেন গ্যাস। আর তাতেই..."

নিজের অজান্তেই ভয়ে শিউরে ওঠে রয়।

ওই করিডরের বাতাসে এখন এমন কিছু আছে যা ওর শরীর থেকে বেরনো হাওয়াকেই বিষ-বাতাসে পরিণত করতে পারে!

ওর খেয়াল হয় যে অধ্যাপক-সুলভ ভঙ্গিতে ধৃতিমানের কথা তখনও চলছে।

"কিন্তু এমন জিনিসের বিশেষত্ব হল, এটি খুব বেশিক্ষণ সক্রিয় থাকবে না। খুব বেশি হলে মিনিট দশেকের মধ্যেই ওই রিএজেন্ট নিজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তারপর আপনারা দরকার হলে বোমা ফাটিয়ে দরজা খুলুন। আমরা এই ল্যাবেই আছি, নিরাপদ"।

কিছুক্ষণ চুপ ছিল স্পিকারটা। তারপর, মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত কয়েদিকে শেষ খবর দেওয়ার মতো করে ওখান থেকে এবার শোনা গেল, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি প্রফেসর, আপনার কথায় কোনো ভুল না থাকলেও একটা বিশেষ জিনিস আপনি জানেন না। আর সেটাই ল্যাবে আপনারা কতক্ষণ থাকতে পারবেন, সেটা ঠিক করে দিচ্ছে।

ব্লু-কে নিয়ে কাজের আগে ওই ল্যাবে এমন কিছু নিয়ে কাজ হয়েছিল যেটা বিশেষ ভাবে গোপনীয়"।

বক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ধৃতিমান বলে ওঠেন, "মানে কোনো অনামা ধনীর নাম ব্যবহার করে মিলিটারি কিছু একটা বানাতে চাইছিল। বেশ তো, তাতে কী হয়েছে?"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

স্পিকারটা আবার চুপ হয়ে গেছিল। হয়তো বক্তা ভাবার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক কীভাবে উত্তর দিলে ধৃতিমানের কথাটায় "হ্যাঁ" বা "না" বলার হাত থেকে বাঁচা যায়। শেষ অবধি রণে ভঙ্গ দেওয়া গলার আওয়াজটা ভেসে আসে, "সেই গবেষণায় এমন কিছু নিয়ে কাজ হচ্ছিল, যেখানে সিকিউরিটি-ব্রিচ হলে চরম ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চিত করা হয়েছিল।

ল্যাবের নিচে রাখা ছিল একটা বিস্ফোরক। কোনোভাবে করিডরে ব্লাস্টার ফায়ার, এবং মূল দরজা জ্যাম হয়ে গেলে সেই বিস্ফোরক আপনা থেকেই চালু হয়ে যায়, যাতে ল্যাব এবং করিডর পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সেই প্রোজেক্টটা এখন চলছে না, কিন্তু বিস্ফোরকটা, ভুলবশত, সরানো হয়নি।

সেটা আছে, এবং চালু হয়ে গেছে। তাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে মূল দরজাটা আপনারা কেউ খুলে না দিলে..."।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্পিকারের দিকে চেয়ে ছিলেন ধৃতিমান আর কেইন। শুধু রয়ের খুব হাসি পাচ্ছিল, কারণ ওর মনে হচ্ছিল, ও একটা নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নইলে ঘন্টাখানেকের মধ্যে এত কিছু দেখার, শোনার, মায় সম্ভাব্য মৃত্যু নিয়েও রকমফেরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ কারো হয়?

কেইন চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ধৃতিমান তাঁকে থামিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলেন, "ঠিক কী নিয়ে হতভাগারা কাজ করছিল তার কিছুটা আন্দাজ আমার আছে, আর তাই আমি জানি এই বিস্ফোরকের ব্যাপারটা ব্লাফ নয়"।

ঠিক তখনই করিডরে যাওয়ার বন্ধ দরজার ওপরে ঘড়িটার স্বাভাবিক ঘণ্টা-মিনিট-তারিখ মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে ০৫-০০ সংখ্যাটা, আর তারপরেই সেটা নামতে শুরু করে শূন্যের দিকে।

*****

"রয়! রয়! তুমি শুনতে পাচ্ছ?"

ধৃতিমানের গলাটা ওর আচ্ছন্নভাব কিছুটা কাটিয়ে দেয়।

শ্বাস নিতে গিয়ে টের পায় রয়, অ্যাপ্রনের সঙ্গে প্রায় সিল করে লাগিয়ে দেওয়া এই হেলমেটের ভেতরের অক্সিজেন শেষ হয়ে গেছে, আর ওর চোখের সামনেটা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে।

এক ঝলকে ওর মনে পড়ে ল্যাবের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার আগে কেইনের পইপই করে বলা কথাটা, "হেলমেট খুলবেন না। কার্ড সোয়াইপ করে লাল আলোর নিচের বোতামটা টিপে দেবেন। মূল দরজা একবার খুলে গেলে ওপাশে যারা আছে তারা আপনাকে সুস্থ করতে পারবে। আমাদের পায়ের নিচের বিস্ফোরকের সঙ্গে লাগানো টাইমারটাও তারাই থামাবে। আপনি শুধু দরজাটা খুলুন"।

"রয়, তুমি কি দরজাটার কাছে পৌঁছেছ? আমাদের হাতে আর একদম সময় নেই কিন্তু!

রয়!!!!"

চিৎকারটা কানের মধ্য দিয়ে একটা চাবুক হয়ে আছড়ে পড়ে ওর চেতনায়। রয়ের মনে পড়ে, কলেজে এবং তারপরেও এই চিৎকার ওকে কত অসাধ্যসাধনের জন্যে দরকারি রাগ, জেদ, বা সাহস জুগিয়েছে।

এবারের চিৎকারটার মধ্যে একটা অন্য জিনিসও মিশে ছিলঃ অসহায়তা, যেটা প্রফেসর ধৃতিমানের গলায় কখনও শোনার কথা ভাবেনি ও।

অন্ধের মতো নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায় রয়, যতক্ষণ না ও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দরজার কাছে।

নিরাপত্তা রক্ষীর মৃতদেহ কোনো রকমে ডিঙিয়ে কার্ডের স্লটের কাছে পৌঁছয় রয়। ততক্ষণে ও বুঝতে পেরেছে যে ওর মাথা আর কাজ

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

করছে না, কিন্তু যন্ত্রের মতো করে কার্ডটা ও সোয়াইপ করতে পারে সেই অবস্থাতেও।

দরজার পাশে আলোটা সবুজ হয়ে ওঠে।

এবার শুধু লাল আলোর নিচের বোতামটা টেপা...

কিন্তু আর পারছে না ও।

হেলমেটের মধ্যে কেউ কি চিৎকার করছে? করুক, সেই আওয়াজটাও একটু-একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে তো।

ওর সারা শরীর পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে। মাথার ভেতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা দপদপ করছে। জিভ নাড়তে পারছে না ও।

আর না, এবার শুধু চোখ বন্ধ করার অপেক্ষা।

আর কিছু কি করার ছিল ওর? কী করার ছিল যেন?

ও হ্যাঁ, ওই বোতামটা টিপতে হবে। কিন্তু ও তো হাত তুলতেই পারছে না। ও বসে পড়ছে একটু-একটু করে।

বোতামটা কেউ কি টিপে দিতে পারবে না?

ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসতে থাকা পৃথিবীতে হঠাৎ একটা নীল ঝলক দেখে রয়।

এক মুহূর্তের মধ্যে ওর মনে ভেসে উঠতে চায় একটা ভয়ের স্মৃতি। একটু আগেই নীল রঙের কী যেন একটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বাতাসে...

সেটাই কি আবার ছড়ানো হল ওর দিকে?

না তো!

এ তো একটা বাঁদর। কী যেন নাম বাঁদরটার? ও, হ্যাঁ, ওর নাম ব্লু। কিন্তু ব্লু কেন ছুটে আসছে ওর দিকে?

রয়ের মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠে কয়েকটা ভাবনা।

করিডরের বাতাসে বিষ, তার মধ্যে ব্লু খুব বেশি হলে কয়েক সেকেন্ড বাঁচবে।

ও কীভাবে ল্যাব থেকে বেরোল সেটা ও জানেনা, কিন্তু ওর মাথা আবার কাজ করতে শুরু করেছে।

ওই বোতামটা ওকে টিপতেই হবে।

মরিয়া চেষ্টা করে নিজেকে মেঝে থেকে তুলে ধরে রয়। তারপর বোতামটা টিপে দেয়।

দরজাটা খুলে যাওয়া মাত্র উঁচু চাপে হাওয়া, আর অন্য কিছু ঢুকতে থাকে করিডরে।

জ্ঞান হারানোর আগে রয়ের শেষ স্মৃতি ছিল, ওর মাথার পাশে প্রবল ভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে ব্লু, আর কারা যেন দৌড়ে আসছে করিডর দিয়ে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

*****

জ্ঞান ফেরার পর রয়ের প্রথমেই মনে হল, ও নিশ্চই স্বপ্ন দেখছে, কারণ ওর মাথার ঠিক ওপরেই একটা নীল রঙের সূর্য রয়েছে। তারপর ওর খেয়াল হল যে ওটা নীল রঙের সূর্য নয়, এমনকি নীল রঙের বলও নয়।

ওর মাথার কাছে বসে ওর দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে ব্লু।

নিজের চারপাশে তাকিয়ে প্রথমেই রয় দেখতে পায় প্রফেসর ধৃতিমানকে। তারপর ও দেখতে পায় ডক্টর কেইন-কে।

"পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়নি, তাই ঘাবড়িও না", ধৃতিমানের গম্ভীর গলার তলায় বয়ে চলা টেনশনের স্রোতটা রয়ের কানে ধরা পড়ে। "তুমি প্রায় দেড় মিনিট অক্সিজেন ছাড়া ছিলে, সেটাও চরম আশংকা আর অন্যান্য শারীরিক অবস্থার মধ্যে। আমাদের ভয় হচ্ছিল, তাতে তোমার মস্তিষ্কে কোনো প্রভাব পড়েছে কি না। রিপোর্ট বলছে, তেমন কিছু হয়নি। তবে এখন ক'টা দিন উত্তেজনা থেকে দূরে থাকাই দরকার তোমার"।

"কিন্তু..." যে কথাটা জ্ঞান হারানোর মুহূর্তে, এবং জ্ঞান ফিরে আসার সময় থেকেই ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল সেটাই এবার বেরিয়ে আসে, "আমি করিডরে ব্লু-কে দেখেছিলাম। ও কি সত্যিই সেখানে ছিল?"

কেইন আর ধৃতিমানের চোখাচোখি হয়। গলা খাকড়ে বলেন কেইন, "অফ কোর্স নট। ব্লু আমাদের সঙ্গেই ছিল, ল্যাবের ভেতরে। সম্ভবত অক্সিজেনের অভাবে আপনার একটা বিভ্রম হয়েছিল"।

পাক্কা ষড়যন্ত্রকারীর স্টাইলে এদিক-ওদিক দেখে নেন ধৃতিমান। তারপর চোখের ইশারায় কেইনকে তিনি বোঝান যে তাঁদের কথা শোনার আর কেউ নেই।

রয়ের কানের কাছে প্রায় মুখ নিয়ে কেইন কথা শুরু করেন।

"আপনি ঠিকই দেখেছিলেন রয়। আমার আর ধৃতিমানের ডাকাডাকিতে আপনি যখন আর সাড়া দিচ্ছিলেন না, তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, অন্য কোনো ভাবে আপনাকে সজাগ করে তুলতেই হবে।

প্রফেসর নিশ্চিত ছিলেন যে অন্য কারো জন্যে না হলেও, ব্লু-র মতো একটা নিষ্পাপ প্রাণীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আপনি সজ্ঞান-অজ্ঞান যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করবেন।

তাই আমি আর প্রফেসর নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দরজাটা একটু ফাঁক করে ব্লু-কে আপনার কাছে যেতে বলি।

শুধু আপনিই ব্লু-কে পছন্দ করেছিলেন তা নয়, ব্লুর-ও আপনাকে ভালো লেগেছিল। তাই দরজা খোলা পেয়েই ও আপনার দিকে ছুটেছিল।

আর ওকে দেখে আপনি ঠিক তাই করেছিলেন, যা আমরা আশা করেছিলাম।

তবে ব্লু-কে এমন একটা বাতাসে এক্সপোজ করা হয়েছিল একথা সেনাবাহিনী জানতে পারলে ওরা ওকে নিয়ে তাই করবে, যা ফুয়াদের লোকজন করতে চেয়েছিল। তাই ডাক্তাররা আপনার কাছে আসার আগেই আমরা ব্লু-কে লুকিয়ে ফেলি। সত্যিটা শুধু আপনিই জানলেন"।

ইতিমধ্যে বাঁদরটা তার ছোট্ট হাতে রয়ের বড়ো হাতটা তুলে নিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে রয়ের খুব রাগ হয়, কেইন আর ধৃতিমানের ওপর। মাথাটা খুব ভারী ঠেকলেও সেটাকে তুলে ও বলে, "কিন্তু এমন নিষ্পাপ প্রাণীটার জীবন বিপন্ন করতে আপনাদের একটুও খারাপ লাগল না? ওকে ওই বিষ-বাতাসের মধ্যে আপনারা পাঠালেন কীভাবে?"

এবারো ধৃতিমান আর কেইনের মধ্যে চোখাচোখি হয়, তবে এটার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি আনন্দ লুকিয়ে ছিল।

এবার উত্তরটা দেন ধৃতিমান, "মাই বয়, যে ব্যাপারটা ডক্টর কেইন আর তাঁর টিম অবশ্যই অস্বীকার করবেন, কিন্তু যে কথাটা সত্যি বলে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আমার চোখে প্রথম দর্শনেই ধরা পড়ে গেছিল, সেটা হলঃ ব্লু-র গায়ের রঙটা প্রুশিয়ান ব্লু হলেও তার নিচে ওর আদি চেহারাটার রঙ ছিল সোনালি। ডাই করা না হলেও মাদাগাস্কারের গোল্ডেন লেমুরের জিন-স্প্লাইসিং করে তৈরি করা হয়েছে ব্লু-কে। একে তো গোল্ডেন লেমুরের সায়ানাইড-জাতীয় জিনিস বরদাস্ত করার ক্ষমতা প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি, তায় যে রিএজেন্ট দিয়ে ওর গায়ের রঙ প্রুশিয়ান ব্লু করা হয়েছে, সেটার সঙ্গে আজন্ম সংস্পর্শের ফলে সায়ানোজেন-এ ব্লু-র কিস্যু হত না।

কুইপার বেল্টে মাইনিং চালানোর জন্যে শ্রমিকরা যখন জমাট নাইট্রোজেন লেয়ারে খনন করে, তখন সেখান থেকে তৈরি হওয়া সায়ানোজেন অসংখ্য মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়।

কিন্তু ব্লু যে এই গ্যাসে অবধ্য, এই খবরটা লিক হয়ে গেছিল ফুয়াদ আর তার দলবলের কাছে, যারা বুঝতে পেরেছিল, ব্লু-র ক্লোনিং করে শ্রমিকদল তৈরি করলে রাবাত আর তার মতো অন্য খনির ঠিকাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে"।

"তাহলে এখন...?" প্রশ্নটা অসম্পূর্ণ রেখে দিয়ে দুই বিজ্ঞানীর দিকে তাকায় রয়।

"আপনি ইন্টার্নাল বুলেটিনটার খবর এখনও জানেন না," কৃত্রিম গাম্ভীর্য মেশানো গলায় বলেন কেইন, "ল্যাবরেটরিতে মারাত্মক দুর্ঘটনার ফলে এক আততায়ী আর দুই নিরাপত্তা রক্ষীর পাশাপাশি ব্লু-ও মারা গেছে। বিষ বাতাস সে সহ্য করতে পারেনি"।

চমকে নিজের ডান দিকে তাকিয়ে দেখে রয়, যেখানে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে কেইনকে দেখছিল ব্লু।

ধৃতিমান বলেন, "কাগজ-কলমে ব্লু আর বেঁচে নেই। কিন্তু ওকে কীভাবে নিরাপদ রাখা যায় সেটাই ভাবছি"।

হঠাৎ রয়ের মনে পড়ে একলা ঘরে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন গোণা একটি মানুষের কথা, নীল রঙ যার বড়ো প্রিয়।

জোর গলায় রয় বলে ওঠে, "রুচিরার খুব প্রিয় রঙ হল নীল, প্রফেসর। আর ওর কাছে ব্লু-কে কেউ খুঁজবে না"।

চমকে ওঠেন ধৃতিমান। নতুন চোখে উনি তাকান কেইন, রয়, আর শেষে ব্লু-র দিকে।

আর তারপর, যা কখনও তাঁকে কেউ করতে দেখেছে বলে রয়ের জানা নেই, সেটাই হয়। ব্লু-র দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলে ওঠেন ধৃতিমান, "তাহলে আমার সঙ্গেই চলো হে ব্লু। তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেলে আমার মেয়ের দিনগুলো একটু হলেও..."।

এক লাফে ধৃতিমানের গলা জড়িয়ে ধরে ব্লু।

অলঙ্করণ: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কল্পবিজ্ঞানের গল্পঃ

১৪ই এপ্রিল, ৩০১৬:

আজ অনেকদিন পর আমার মায়ের সঙ্গে খেলতে এলাম পার্কে। তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো, অনেকদিন পরে কেন? আমার মতন দশ বছরের বাচ্চার তো রোজই পার্কে আসা উচিৎ, তাই না? আসলে মা আমাকে নিয়ে আসতে লজ্জা পায়, তাই আর রোজ আসা হয় না। মা অবশ্য মুখে কিছু বলে না, বলতে পারার কথাও নয়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, তাই তো মা বলে আমার হেবি ব্রেইন, কোনও ইনডিউসড ইন্টেলিজেন্স এর কোর্স ছাড়াই। অবশ্য বেরোলে কেউ তেমন কিছু বলে না, সবাই সভ্য ভদ্র মানুষ, কিন্তু আমি জানি যে আমার মা চট করে বাইরে বেরোতে খুব অপ্রস্তুত বোধ করে, সে একলাই হোক বা আমাকে নিয়ে।

অবশ্য মায়ের কিন্তুমিন্তুর কারণটা আমি জানি।

আমি আর আমার মা, আমরা কেউই কথা বলতে পারি না। শুনতে পারি, বুঝতে পারি। কিন্তু বলতে পারি না। আমরা বোবা।

এই যুগে এটা যে ভাবাই যায় না সে তো তোমরা বোঝোই। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স তো আমাদের মতন বাচ্চাদের এখন থেকেই পড়ানো হয়। আমি অবশ্য স্কুল যাই না। মা-ই ঘরে পড়ায়। যা বলছিলাম, জেন্ট-ইঞ্জের কল্যাণে এখন কানা, খোঁড়া, অন্ধ বাচ্চা জন্ম নেয়ই না। যাদের পয়সা আছে, তারা তো কাস্টমাইজড বাচ্চা নেয়। এই তো পাশের সোসাইটির নিলসিয়েন কাকু, ডাক্তার বাচ্চা নিলো। যদিও স্যামাঞ্জন মোটে জেন্ট-ইঞ্জ বোঝে না, আর মেড-লাইফ পড়ে না, তবুও। ও শুধু মেন্টালটিউবে গান শোনে।

আমি আর মা কি করে বোবা হলাম বোঝা খুব শক্ত, জানো? আসলে মানুষের ডিএনএ-র সব মিস্ট্রি এখনও জানা যায় নি নাকি, মা একদিন বলছিলো। খুব অল্প কিছু পার্সেন্ট মতন নাকি এখনও ডিকোড করা বাকি আছে। তাই হঠাৎ করে দু একটা আমাদের মতন এরকম বায়োলজিক্যালি ডিফেক্টিভ ইউনিট জন্মে যায়। তা ধরো সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ছ'জন পোলিও, এগারো জন থ্যালাসেমিয়া, জনা দশেক অন্ধ (মানে ব্লাইন্ড, সরি, মা অন্ধ বলতে বারণ করেছিল, ভুলে গেছি, হি হি), প্রায় পঞ্চাশ জন মতন অটিস্টিক বা ইমোশনালি আনস্টেবল (উফ, কি

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

শক্ত শব্দ বাবা) লোক আছে, আর বোবা লোকজন আছে দুইজন।

আমি আর মা।

মা জানতো যে আমিও ওইরকম হবো, জানো? আজকাল জিন-ম্যাপিং করানো থাকে তো সবার। তাই তো মা বিয়ে-টিয়ে করেনি। কিডসফ্যাকটরি থেকে আমাকে বানিয়ে নিয়ে এসেছিল। সেখানে নাকি আমার বাবার ভালোবাসা ডিপকোল্ডস্পেসে ছিল, ছোট্ট একটা টিউবে। সেটাকে মায়ের পেটে বসিয়ে দিতেই নাকি আমি হই, হি হি। কি কিউট না স্টোরিটা? তবে মা কিছুতেই বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। বলে বাবা নাকি হারিয়ে গেছে, মিথ্যে বলে মা, তাই না?

ও, একটা মজার কথা তো বলাই হয়নি তোমাদের। আমি আর মা নিজেদের মধ্যে কি করে কথা বলি বলতো? হাত আর ঠোঁট নেড়ে, কিম্মজা না? অবশ্য অন্য লোকদের জন্যে হ্যাণ্ডট্যাব থাকেই, তাতেই নিজেদের মনের কথা বাঁহাতের চামড়ার স্ক্রিনে ফুটে ওঠে, আর সামনের লোকের কথাও ফুটে ওঠে। তবে ওরকম একটা গ্যাজেট হাতে বেঁধে ঘোরাটা ব্যাড লাগে না? বোবা লোকও আর দেখা যায় না, তাই এসবের ব্যবহার উঠেই গেছে। আমার জন্যে তো হ্যাণ্ডট্যাব পাওয়াই যাচ্ছিলো না। শেষে সায়েন্স অ্যান্ড টেক মিউজিয়ামের কিউরেটর অনেক পুরনো ফাইল রি-ডিকোড করে, হিস্টরিলিসিস করে এটা বানিয়ে দিয়েছেন। এটা অন করে বেরোলেই লোকে বোঝে যে আমরা কথা বলতে পারি না। আর কেমন করে যেন তাকায়, এইসান রাগ ধরে না। কিছু বলে না যদিও, ভদ্র-সভ্য লোক সব্বাই। আর বেশি অবাক হওয়াটা ব্যাড ম্যানার্স, মা বলেছে। তবুও লজ্জা লাগে না? তাই তো মা বেশি বেরোয় না। না একা, না আমাকে নিয়ে।

আগেই বলেছি না, যে আমি আমার মা বাড়িতে হাত আর ঠোঁট নেড়ে কথা বলি? অ্যানসিয়েন্ট টাইমে নাকি যারা আমাদের মতন ছিল, তারা নাকি এইভাবেই কথা বলতো। একে বলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রিহিস্টোরিক যুগে নাকি এসব শেখাবার স্কুল ছিল। হ্যাণ্ডট্যাবের যুগে সে সব বন্ধ হয়ে যায় আগেই। মা অনেক অ্যানসিয়েন্ট স্ক্রিপচার ডেটামেমরিড করিয়ে এগুলো শিখেছে, আর আমাকে শিখিয়েছে। আমরা ছাড়া এই ল্যাঙ্গুয়েজ আর কেউ জানে না। সমস্ত ওল্ড স্ক্রিপচার্স মায়ের কাছেই। আর কেউ শিখতেও পারবে না, হি হি হি, মজার না?.

ওই দ্যাখো মা ডাকছে, লিলিতা আন্টি হেসে হেসে কি যেন বলছে মা কে। যাই দেখে আসি।

৩০শে জুলাই, ৩০১৬:

আজ আমার মন খারাপ। মা বকেছে। স্কুলে ভর্তি করতে যেতে কে বলেছিল বলো? বাড়িতেই পড়ছিলাম তো দিব্যি। স্কুল থেকে যদি বলে যে ডিফেক্টিভ চাইল্ডদের জন্যে ওরা সিলেবাস পাল্টাতে পারবে না, সেটা কি আমার দোষ? মা টাও কি বোকা দেখো। উইন্ডো-শিল্ড খুলে বৃষ্টি দেখছে আর কাঁদছে। মা কাঁদলে আমার ভালো লাগে, বলো? যাই, মা কে একটু আদর করে আসি কেমন?

১ জানুয়ারি, ৩০২২:

আরেকটা ক্লান্তিকর নিউ ইয়ার। আবার সেই একঘেয়ে ননসেন্স নাচ গান, চেঁচামেচি, হেঁড়ে গলায় হল্লা। আজকাল একটু বিরক্তিকরই লাগে। তাও নিজেরা আয়োজন করলে বুঝতাম। এখন সব উৎসবই কান্ট্রি, স্টেট বা লোকাল এরিয়া কমান্ডের আয়োজনে হয়। সেখানে লোকজন হাস্যকর রকমের লোকদেখানো আনন্দ করে। দেখে রাগও ধরে, হাসিও পায়।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হিস্ট্রিতে পড়েছি যে পাঁচশো বছর আগের বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবারই কথা ছিল। এই ছোট্ট গ্রহটাকে উড়িয়ে দিতে কি লাগে, দু তিনটে ট্রাইনিট্রিয়াম বোমা ছাড়া? সৌভাগ্যবশত যারা যুদ্ধ করছিল, রুশেশিয়ান কনফেডারেট আর ইউরোমেরিকা অ্যাক্সিস, কেউই অত দূর যায়নি। তবে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়নি, পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি লোক মারা যায়। তারপর না খেয়ে আর মহামারীতে উজাড় যায় আরও বেশকিছু দেশ। আর ততদিনে সমুদ্রের জল বেড়ে আইসল্যান্ড আর গ্রিনল্যান্ড জলের তলায়, দক্ষিণ ইউরোপিয়ান ল্যাণ্ডপ্লেসও তাই। তবে রুশেশিয়ারও ক্ষতি কম হয়নি। সাউথইস্ট এশিয়ার প্রায় পুরোটাই জলের তলায় ভেসে যায়, শুধু তাতেই সত্তর কোটির কাছাকাছি লোক মারা গেছিল। সব মিলিয়ে বড় কর্তাদের বড় ধরণের টনক নড়ে। ফলে তখন সব বড় বড় নামকরা রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের মধ্যে বসে এই সেন্ট্রাল কমান্ডের ব্যাপারটা চালু করতে বাধ্য হয়।

এই সেন্ট্রাল কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টার প্রাচীন শহর জেরুজালেম।

সেই থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে এখন শাসন করে সেন্ট্রাল কমান্ড। তাদের বিপুল প্রতাপ, ঈশ্বর বললেই চলে। তার অধীনে কন্টিনেন্ট কমান্ড, আবার কন্টিনেন্ট কমাণ্ডের অধীনে কান্ট্রি কমান্ড। এই হতে হতে শহর জুড়ে সিটি কমান্ড আর তাদের অধীনে কয়েকটা করে লোকাল কমান্ড। দেশ বিদেশ বলে কিছু নেই, তাই সেনাবাহিনী বলে কিছু নেই। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষীবাহিনী আছে, লোকপ। তাদের দাপট দেখলে অবশ্য মাঝেমধ্যে বেশ রাগই ধরে।

মজাটা হলো কি, সেই থেকে জীবনযাত্রার বেশ কিছু অংশ আর আমাদের হাতে রইলো না, কমাণ্ডের হাতে চলে গেলো, যেমন বিভিন্ন উৎসব, জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ ইত্যাদি।

আর পৃথিবীর সবাইকে আয়, সামর্থ্য, ক্ষমতা, কমিউনিটিতে তাদের অবদান ও প্রয়োজন ইত্যাদি দেখে চার ভাগে ভাগ করে ফেলা হলো, সাব-নর্মাল, নর্মাল, প্রিভিলেজড আর সুপার। প্রত্যেকের কাছে সেই অনুযায়ী কার্ড আছে। এই ডিজিটাল কার্ড ছাড়া বেঁচে থাকাই মুশকিল। এটাই এখন সবার আইডেন্টিটি, সবার পরিচয়।

যেমন ধরুন আমি আর মা, আমাদের কার্ড সাব-নর্মাল। আমাদের কি আর সাধ্য আছে যে দোকানে গিয়ে ইচ্ছেমতন যা কিছু কিনবো? না হোটেলে গিয়ে খাবো? আমরা হলাম সাব-নর্মাল কার্ড হোল্ডার, সাব-হিউম্যানদের মতই প্রায়। নর্মাল কার্ড হোল্ডার আর আমরা, আমরা কেউই র‍্যাশনের বাইরে কেনাকাটা করতে পারি না। নিজেদের পছন্দমত কিছুই কিনতে পারি না, সে পছন্দের বডি-ক্লিন জেল হোক বা সোল-সাইকেল, কি হোভারকার। আমাদের পড়াশোনা লোকাল এডুসেন্টারে, মেডিসার্ভিস হয় লোকাল হেলথপয়েন্টে। জামা জুতো থেকে শুরু করে র‍্যাশনড খাবার, বেডর‍্যাপার, বডি-ক্লিন জেল, সবই কমান্ড থেকে সাপ্লাই দিয়ে যায়। এমনকি খাওয়ার জল অবধি।

একদিক দিয়ে অবশ্য ভালো, না খেয়ে কাউকে মরতে হয় না।

আর যাদের প্রিভিলেজড বা সুপার কার্ড আছে? আহা তারা হলো গিয়ে সমাজের মাথা। তাদের জন্যেই তো সব সুবিধা গো! ইচ্ছেমতন দামী স্টাডি-ভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সুবিধা, ইচ্ছেমতন খাবার সুবিধা, স্পেশাল মেডিসার্ভিস, ফি বছরে স্পেশাল দামি হোভারকার, দামি জামা, জুতো, স্পেশাল সুগন্ধি বডিফ্র্যাগ....

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

মাঝে মধ্যে খুব রাগ হয় কার্ড-বন্দী এই দুনিয়ার ওপর। গত সপ্তাহেই আমার ষোল বছরের জন্মদিন গেলো। মা গেছিলো পাশের বিল্ডিং এর সুসাহনিভাই-এর কাছে, যদি চুপিচুপি ওর প্রিভিলেজড কার্ডটা নিয়ে আমার জন্যে একটা সস্তা মেন্টালকল কেনা যায়। এখনকারটা দশ বছরের পুরনো কি না!

এই নোংরা লোকটার কি অবিশ্বাস্য স্পর্ধা, মাকে বলেছে বোবা মায়ের বোবা ছেলে মেন্টালকল দিয়ে কি করবে? বরং লোকাল কমান্ডকে বলে আরো দুটো ফ্রি হ্যাণ্ডট্যাব চেয়ে নিই না কেন?

সারা রাত মা আমাকে জড়িয়ে কেঁদেছিল। বিশ্বাস করুন, বোবা মায়ের কান্নাও আপনাদের মায়ের কান্নার মতন।

৫ই জুন, ৩০২৬:

অবিশ্বাস্য! অভূতপূর্ব! অসাধারণ!

খবরটা পেলাম আজ লোকাল লাইব্রেরিতে আমার কোর্স করতে গিয়ে। লাইব্রেরিতে লোকাল এডুকম থেকে আমার জন্যে একটা থ্রিডির্যাক্টিভ কিউবিকল বানিয়ে দিয়েছে। কনসোলটা মাথা গলিয়ে পরে নিলেই হলো। সব কোর্স হ্যাণ্ডট্যাব হয়ে ফ্যামিলিএডুমেমএ জমা হয়ে যায়। কোর্স-ওয়ার্কও ওইভাবেই জমা নেয়।

আজ থ্রিডি এনক্লোজারে ঢুকতেই সে কি হই-হট্টগোল! সবাই চেঁচাচ্ছে, হাসছে, লাফাচ্ছে, একে অন্যের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, সে এক অনবদ্য দৃশ্য! মনোকেল চালিয়ে আসার সময়েই অবশ্য দেখেছিলাম সব জায়গায় একটা খুশিখুশি ভাব। এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষী,মানে লোকপগুলোর পাথুরে মুখে অবধি মৃদু হাসি। ব্যাপারটা এবার বোঝা গেলো!

পুরো ব্যাপারটা শুনে অবশ্য আমিও সবার মতই খুব উত্তেজিত। আহা, জেন্ট-ইঞ্জিনিয়ার ইয়ুয়ানচন্দ্রার জয় হোক। এই যুগের তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

শুনেছি আজ থেকে হাজার বছর আগের সায়েন্সোলজাররা, যেমন আর্থার সি ক্লার্ক বা আইজাক আসিমভরা, বলেছিলেন মানুষের অন্য গ্রহে পাড়ি জমানোর কথা, সমুদ্রের তলায় থাকার কথা। যদিও এখন সেটা আমরা চাইলেই পারি, কিন্তু দরকার হয় নি। পর পর তিনটে বিশ্বযুদ্ধের ফলে এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা দুশো কোটির বেশি না। ল্যাণ্ডমাস গত পাঁচশো বছরে অনেক কমে গেলেও দুশো কোটি লোকের জন্যে যথেষ্ট। যথেষ্ট ফরেস্ট-প্লেসও বাঁচিয়ে রাখা আছে। মানুষ সবাই ছোট ছোট শহরে থাকে, সিটি-সেন্টার বলি আমরা, ভিলেজগুলোতে শুধু রোবট দিয়ে চাষবাস হয়, সেন্ট্রাল কমাণ্ডের এগ্রিডিটি ডিপার্টমেন্টের কড়া নজরে। আগেই বলেছি, প্রায় সব রিসোর্সই র‍্যাশনড। ফলে না খেয়ে কেউ মরে না।

শুধু একটা জিনিস মানুষ পারতো না।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

চিরযৌবন। ইচ্ছেমতন একটা বয়েসে অনেকদিন আটকে থাকা। মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা।

এইবার সেটা পারবে!

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মা' চিরদিনই আমার কাছে এইরকম থাকবে? ইয়া হুউউউউ। যত দামিই হোক, যতই পাউরোই লাগুক, আমাকে এই টেকনোলজি পেতেই হবে, পেতেই হবে, পেতেই হবে!

১০ই জুন, ৩০২৬:

নাহ, যতটা ভেবেছিলাম, ততটা আনন্দের খবর নয়।

জেন্ট-ইঞ্জিনিয়ার ইয়ুয়ানচন্দ্রা যেটা আবিষ্কার করেছেন, সেটা একধরণের ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল কমপাউণ্ড। একটা প্রেশারাইজড কিউবিকলে ঢুকে একটা শট নিতে হয়। এক একটা শটে মানুষ তার বর্তমান অবস্থায় একশো বছর বাঁচতে পারে। একশো বছর পর আরেকটা শট, আরও একশো বছর। মানে যে কেউ চাইলে প্রতি একশো বছর অন্তর শট নিয়ে নিয়ে আদি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে।

এতটা অবধি ঠিক ছিল, কিন্তু এর পরেই যেটা শুনলাম তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

প্রচুর পাউরো ছাড়াও আরও একটি জিনিস লাগে এই লাইফ-শটের জন্যে, আরেকটি মানুষের প্রাণ!!!

আরেকজন জীবিত মানুষের শরীর থেকে তার ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল লাইফজিস্ট বার করে সেই নিয়েই লাইফ-শট তৈরি হয়। বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, মহিলা, সুস্থ, নীরোগ সব চলবে, শুধু জীবিত হওয়া চাই। বলা বাহুল্য যে লাইফজিস্ট বার নেওয়ার পর কারও বেঁচে থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

মানে একটি প্রাণসংহার না করে কেউ একশো বছর বেশি তার জীবন বাড়াতে পারবে না। কেউ যদি পাঁচশো বছর বাঁচতে চাও তো পাঁচটা প্রাণ!

ল' অফ কনজার্ভেশন অফ লাইফ!

আশা করি সেন্ট্রাল কমান্ড এইসব শোনা মাত্র এই সর্বনাশা আবিষ্কারের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভাল প্রত্যাখ্যান করবেন। একজন মানুষের জীবনের বিনিময়ে আরেকজনের বেশিদিন বেঁচে থাকার মতন ঘৃণ্য টেকনোলোজিতে কোনও সভ্য মানুষেরই সায় থাকা উচিৎ নয়।

৫ই অগাস্ট, ৩০২৬:

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

খারাপ খবর। সারা দুনিয়া জুড়ে এত অনুরোধ উপরোধ সব বিফলে গেলো। সেন্ট্রাল কমাণ্ডের টেকঅ্যাড কমিটি পৃথিবীজোড়া অসন্তোষ উপেক্ষা করে লাইফ-শটকে বৈধ ঘোষণা করেছে! লেখাটা লিখে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। অন্যের প্রাণ কেড়ে নিজের বিলাসী জীবন কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে ভোগ করার এই জঘন্য বর্বর স্বার্থপর আবিষ্কার এরা অ্যাপ্রুভ করলো কি করে? মানবতাবাদ বলে কি আর কিছুই অবশিষ্ট নেই?

ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রাকে দোষ দিই না, উনি বৈজ্ঞানিক, বোধহয় গত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ওঁর কাজ আবিষ্কার করার, আবিষ্কার করেছেন। সেন্ট্রাল কমাণ্ডের প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা কি করছেন? তাঁরা না বিশ্বনেতা? ফার্স্ট কমান্ডেন্ট গোয়েলস্ফাইন কি করছেন? তিনি তো আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁকে তো ভালো লোক বলেই জানতাম। তিনিও চুপ করে আছেন?

সোশ্যাল-প্লেস মাইন্ড-বুক ভেসে যাচ্ছে ছিছিক্কারে, বিদ্রূপে আর কমিক-স্ট্রিপে। সারা দুনিয়া জুড়ে মাইণ্ডবুকে ঝড় উঠেছে বুঝতে পারছি। যাই, একবার কলইন করে দেখি, কেসটা কি?

২৯শে সেপ্টেম্বর, ৩০২৬:

ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

আজ খবরে প্রকাশ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ওষুধের কোম্পানি মেড্র্যাগন এই আবিষ্কার কিনে নিয়েছে। আরও বড় খবর হলো যে সই করার পর থেকেই ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না তাঁর বিলাসবহুল লাইভমেন্টে, না তাঁর ওয়ার্ক-স্পেসে। লোকপ বাহিনীর টপঅপস ডিভিশন নামানো হয়েছে ওঁর খোঁজে।

এদিকে মাইণ্ডবুকে ছিছিক্কারে আর কান পাতা যাচ্ছে না। প্রায় সবাই মনে করছে মেড্র্যাগন আর সেন্ট্রাল কমান্ড মিলে গুম করেছে লোকটাকে। বিপুল পাউরো ঢেলেছে নাকি মেড্র্যাগন, এই লাইফ-শট টেকনোলজি কেনার জন্যে। যাতে করে ম্যাজিশিয়ান চন্দ্রা পরে আর কোনোভাবেই না বাগড়া দিতে পারেন, তাই এরা আর ঝুঁকি না নিয়ে লোকটাকে হাপিশ করে দিয়েছে।

ওদিকে মা ডাকছে, ওয়ার্ল্ডভিশনে সেন্ট্রাল কমাণ্ডের নতুন কি সম্প্রচার শুরু হবে যেন। যাই, শুনে আসি।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ৩০২৬:

সারা দুনিয়া স্তব্ধ। এরকমও হয়? ছিঃ। নিজেকে মানুষ বলতে আর ইচ্ছে করছে না।

মেড্র্যাগন ঘোষণা করেছে যে তারা সেন্ট্রাল কমাণ্ডের সমস্ত কমান্ডেন্টদের ফ্রিতে লাইফ-শট দেবে। তারপর সমস্ত সিটিজেনদের জন্যে এই 'সুবিধা' দেওয়া শুরু হবে। তবে যথারীতি প্রিভিলেজড আর সুপার কার্ড-প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তারা কোথা থেকে জীবনদাতা আনবে সেটা তাদের ব্যাপার। কি নির্লজ্জ ঘুষখোরদের কাজকারবার!

এতেই শেষ নয়।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সেন্ট্রাল কমান্ড ঘোষণা করেছে তাদের কমান্ডেন্টদের জন্যে লাইফজিস্ট নেওয়া হবে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা পাওয়া আসামীদের থেকে! এবং এখানেই আমার তীব্র আপত্তি আছে। এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে। এদের প্রাণ কি সেন্ট্রাল কমান্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাকি? কি নৃশংস, কি নির্মম, কি হৃদয়হীন পাষণ্ড এরা!

তবে এর বিনিময়ে নাকি সেই অভাগাদের পরিবার পরিজনদের এককালীন কিছু পাউরো ধরিয়ে দেওয়া হবে। আহা, কর্তাদের দয়ার প্রাণ!

মাইণ্ডবুক পুরো ফুঁসছে, দিকে দিকে এই সেন্ট্রাল কমাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া চলছে। ওয়ার্ল্ডভিশনেও ইতিউতি বিক্ষোভের খবর পাওয়া যাচ্ছে। লোকপগুলো অবশ্য বিরামহীন ভাবে পেটানোর জন্যে বিখ্যাত।

১৫ই নভেম্বর, ৩০২৬:

আজ লাইফ-শটের প্রথম সার্থক প্রয়োগ হলো। নিলেন ফার্স্ট কমান্ডেন্ট গোয়েলস্ফাইন। তাঁকে অবশ্য খুবই অসুস্থ ও কৃশ দেখাচ্ছিল। লাইফ-শট নেওয়ার পর উনি পৃথিবীর সবার শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রেখে এবং বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি কামনা করে ভাষণ দিলেন।

অসুস্থ লাগছে। মা আজ সারাদিন কিছু খায় নি, চুপচাপ শুয়ে আছে। দেখি কিছু খাওয়ানো যায় কি না। আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না যদিও।

আজকের দিনটা মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে একটা কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

১৫ই নভেম্বর, ৩০৩১:

আজ লাইফ-শট টেকনোলোজির পাঁচ বছর হলো। প্রতি সপ্তাহে একজন করে কমান্ডেন্টকে দিয়ে দিয়ে প্রায় আড়াইশো জনের সেন্ট্রাল কমান্ডেন্ট বাহিনী আজ সম্পূর্ণভাবে লাইফশটেড। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামীও আর কেউ নেই। তাদের 'স্যাক্রিফাইটার' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

নাহ। কোথাও কোনও ঝুট-ঝামেলা নেই। মাইণ্ডবুক এখন অন্য কিছু নিয়ে চঞ্চল। ওয়ার্ল্ডভিশনে এখন স্ট্রোবো খেলার নতুন সিজনের কম্পিটিশন সম্প্রচার চলছে।

আকাশ নীল। মৃদু হাওয়া বইছে। নিচে বাচ্চারা খেলছে। মা বোধহয় কার সঙ্গে কথা বলছে। অনেকদিন পর মা'কে হাসতে দেখলাম। আকাশ বাতাসে পরম শান্তি।

ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আজ রাতে ওয়ার্ল্ডভিশনে সেন্ট্রাল কমান্ডের নতুন কি একটা ঘোষণা আছে। দেখি কি বলে।

১৬ই নভেম্বর, ৩০৩১:

সারা পৃথিবী রাগে ফুঁসছে। কাল রাত থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিপুল পরিমাণে লোকপ মোতায়েন করা হয়ে হয়েছিল, কিন্তু তাতেও আটকানো যাচ্ছে না। লেজার-শক, লাইট-ক্যানন, উইণ্ডব্লাস্ট, কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না উগ্র হয়ে পড়া প্রতিবাদীদের।

কাল রাতে সেন্ট্রাল কমান্ড জানায় যে এবার থেকে সমস্ত সুপার কার্ড হোল্ডারদের লাইফ-শট দেওয়া হবে। এবার থেকে আর সপ্তাহে একজন নয়। রোজই দেওয়া হবে। আপত্তি তাতেও ছিল না। ঘোষণার পরবর্তী অংশ শুনেই আগুন জ্বলে ওঠে।

সেন্ট্রাল কমান্ড ঘোষণা করেছে যে এবার থেকে সুপার কার্ড হোল্ডারদের জন্যেও জীবনদাতা সেন্ট্রাল কমান্ডই জোগাড় করে দেবে। আর জীবনদাতা জোগাড় হবে যেসব লোক ডেথ-উইশ লিস্টে নাম লিখিয়েছেন, বা যাঁদের আর বাঁচার আশা নেই এমন লোকেদের মধ্যে থেকে। পরে আর কাদের কাদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা বিবেচনা করে দেখা হবে!

মানে পাঁচ বছর আগে যা ঘোষণা করা হয়েছিল তা আর বৈধ রইলো না! সুপার কার্ড-হোল্ডাররা কমিউনিটির বড় বড় মাথা, তাঁদের জীবনদাতা খুঁজে বেড়াবার মতন তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত থাকলে চলে? সদাশয় সেন্ট্রাল কমান্ডই সেই গুরুদায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন!

ব্যক্তিগত স্বার্থে কমিউনিটির সার্বিক ক্ষমতা ব্যবহার করার এরকম নির্লজ্জ অপচেষ্টা শেষ কবে হয়েছে কে জানে! সেন্ট্রাল কমাণ্ডের কমান্ডেন্টদের লাইফ-শট দেওয়ার জন্যে জীবনদাতা খুঁজে দেওয়াটা তাও মানা যায়, হাজার হোক তাঁরা সিটিজেন-কমিউনিটির মাথা। সেন্ট্রাল কমান্ড কারও একার নয়, সবার। কিন্তু এটা কি? কিসের খেলা চলছে পর্দার আড়ালে?

৩১শে মার্চ, ৩০৩৯:

কাল রাতে পিতরসেফাস এসেছিল, রেজিস্টেন্সের একজন মেম্বার। অনেক কোডেড আলোচনা হলো। হ্যাণ্ডট্যাবে নয়, লিখে। সেন্ট্রাল কমাণ্ডের নজর এড়িয়ে এখন কোনও ডিজিকমে এইসব আলোচনা চলতেই পারে না। অগত্যা প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতিই ভরসা।

গত আট বছর ধরে ধীরে সেন্ট্রাল কমান্ড আরও বিভিন্ন আইনকানুন জারি করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। এই বর্তমান সেন্ট্রাল কমান্ড আজীবন এই ক্ষমতা ভোগ করে যেতে চান, লাইফ-শট ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এর পরপরই সেন্ট্রাল কমান্ডকে অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করা হয়েছে, ভোটাভুটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্লোবাল অ্যাডভাইজরি কমিটিতে শুধুমাত্র কর্তাভজা কিছু সুপারকার্ডহোল্ডারদের নেওয়া হয়েছে। বাকিদের সমস্তপ্রকার ভোটাধিকার নিষিদ্ধ।

এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় সেন্ট্রাল কমাণ্ডের বিরুদ্ধে গোপনে বিদ্রোহীরা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্ত হামলাও হয়েছে। জবাবে আরও প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়েছে সেন্ট্রাল কমান্ড, আরও হিংস্র। সেন্ট্রাল কমান্ডের চোখে এখন যাবতীয় অবাধ্যতা আর বিদ্রোহের একটাই শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড!

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এইসব মৃত্যুদণ্ড যাতে দ্রুত কার্যকর করা যায় তার জন্যে বিশেষ জাস্টিস্কোর্টও বসানো হয়েছে। কে না জানে, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের তো একটাই ভবিতব্য, অনিচ্ছুক জীবনদাতা হওয়া।

আমাদের এই এলাকার রেজিস্টেন্সে আমাকে বাদ দিয়ে আরো বারোজন আছে। যেমন এই পিতরসেফাস, তারই ভাই আঁদ্রুসেফাস, আলফাপুত্ত, ইয়ুদাসিওট ইত্যাদি।

পিতরসেফাস বেরিয়ে যাচ্ছিল আলোচনা-শেষে। এমন সময় ওর মেন্টালকলে মেরিডিলিওনের ফোন, "এখুনি ওয়ার্ল্ডভিশন খোলো, সেন্ট্রাল কমাণ্ডের নতুন আদেশ", বলেই ফোন কেটে দিলো।

দ্রুত হাতে ওয়ার্ল্ডভিশন অন করলো পিতরসেফাস।

দশ মিনিটের একটা মেসেজ। বুঝে গেলাম, আমার আর আমার মায়ের বেশিদিন আর নেই।

১৪ই এপ্রিল, ৩০৩৯:

আমি আর মা চুপ করে বসে আছি। ঘর অন্ধকার করে।

মা আমার হাত ধরে আছে। মায়ের এই ছোঁয়াটা আমি চিনি। মা বলতে চাইছে খোকা ভয় পাস না, আমি আছি তো। কিন্তু আমি জানি এবার শুধু মা কেন, কারো পক্ষেই কিছু করা আর সম্ভব না।

গতকালের ঘোষণায় সেন্ট্রাল কমান্ড বলেছে যে এবার থেকে সমস্ত জন্মগত ভাবে শারীরিক ত্রুটিযুক্ত লোকজনকে "সমাজের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় বলে ধরা হলো এবং তাদের জীবন-দাতাদের সম্ভাব্য লিস্টে গণ্য করা হবে"। মানে এক-এক ধাক্কায় আমাদের মতন সত্তর-আশি জন জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী লোকজন জীবনদাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলাম আর কি! কারণ আমরা সমাজের বোঝা! আমাদের থাকা না থাকার কোন মূল্যই নেই, আর যদি থাকেও বা, তাতে কার কিই এসে যায়?

১লা জুন, ৩০৩৯:

তিরিশ-জন, তিরিশ-জন মানুষ। জোয়ান বুড়ো, ছেলে মেয়ে, ওয়েস্টার্ন হেমিপ্লেসের কি ইস্টার্ন হেমিপ্লেসের। এদের মধ্যে দুটোই মিল। এক, এরা সবাই শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন, আর দুই আজ এঁরা কেউ বেঁচে নেই।

লোকাল রেজিস্টেন্সের সবাই অবশ্য অনেকবার বুঝিয়েছিল। সারা পৃথিবীজোড়া সেফআউটস আছে ওদের। বলেছিল পালিয়ে যেতে, যদ্দিন এই রাক্ষসদের হাত এড়িয়ে থাকা যায়। আমি শুনেই নাকচ করে দিয়েছি। মায়ের বয়েস হয়েছে, এই পলাতকের জীবন বেশিদিন সহ্যই করতে পারবে না। আর আমারও তেত্রিশ বছর বয়েস হলো। এই বোবা জীবন নিয়ে কতদিন আর পালিয়ে বেড়াবো? আর এই দুই বোবা মা ছেলের জন্যে রেজিস্টেন্সকে এত ঝুঁকির মধ্যে ফেলাটাও কোনও কাজের কথা নয়।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

দরজায় কেউ সিগন্যাল দিচ্ছে। দেখি কে এলো।

১৩ই জুন, ৩০৩৯:

সেদিন আলসেবিদিয়াস এসেছিলেন, ইস্টইণ্ডিয়ানাল্যাণ্ডের লোকপ বাহিনীর হেডকপ।

এমনিতে লোক ভালো। মুখে যেন মধু ঝরছে সবসময়। এসে আমি কেমন আছি, মা কেমন আছেন, ইত্যাদি দু-একটা খেজুরে আলাপের পর দ্রুত আসল প্রসঙ্গে ঢুকে গেলেন। প্রসঙ্গটা অবশ্য আন্দাজ করতে আমার অসুবিধা হয় নি। শুধু ভাবছিলাম এত সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও এরা জানলো কি করে?

এনার কথাতেই অবশ্য উত্তরটা পেয়ে গেলাম। সেদিন যে কাগজের টুকরোটায় আমি আর পিতরসেফাস কথা লিখে রাখছিলাম, সেটা পোড়ানোর বদলে ছিঁড়ে ময়লা ফেলার ব্যাগে ফেলা হয়েছিল, সেটাই কাল হলো। এরা অনেকদিনই তক্কেতক্কে ছিল, কাগজের টুকরোটাকরা গুলো নিয়ে পাজলডিকোড করতে ওদের কম্পিউটার বোধহয় সেকেন্ডের ভগ্নাংশের বেশি সময় নেয় নি।

অনেক ধানাইপানাই করে যখন বুঝলেন যে এতে চিঁড়ে ভিজবে না, তখন একটা টোপ ফেললেন, যদি রেজিস্টেন্সের বাকি মেম্বার্সদের নাম ঠিকানা বলে দিই, তবে আমার আর আমার মায়ের নাম জীবন-দাতার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হবে!

আমি বোধহয় একটু জোরেই হেসে ফেলেছিলাম। তেত্রিশ বছর বয়সী একটা ছেলে এইরকম শিশুভোলানো কথা বিশ্বাস করে দলের সঙ্গে বেইমানি করবে, এটাও যে উনি ভাবতে পেরেছেন দেখে হাসিই পাচ্ছিলো। মা কে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে বললাম কথাটা। মা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজেই জবাব দিলো, "এই জন্তুটাকে যেতে বল, ঘরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ জুলজুল করে দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন যে হাত পা ঠোঁট নেড়ে আমরা কি করছি? আমিও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের কথাটা বলে দিলাম। ইনি বোধহয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের নামই শোনেননি, শোনার অবশ্য কথাও নয়। খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে থেকে ফের স্বাভাবিক গলায় সেই একই প্রশ্নে ফিরে গেলেন। আমার এবার বেশ বিরক্ত লাগছিল। ফলে একটু কড়া করেই বলতে হলো যে কোনও ধরণের রেজিস্টেন্সের সঙ্গে আমার কোনোদিনই কোনও সম্পর্ক ছিল না। ওই কাগজের টুকরো ওঁরা কোত্থেকে পেয়েছেন সে নিয়ে আমার কোনও আইডিয়া নেই। আমি কোনরকমভাবে কোনও হেল্প করতে পারবো না।

ভদ্রলোক চলে গেলেন বটে, কিন্তু যে চাউনিটা দিয়ে গেলেন, সেটা সুবিধার নয়।

২৯শে জুন, ৩০৩৯:

অবেক্ষণ পর বহুকষ্টে বাঁ চোখটা খুলতে পারলাম। সারা শরীরে ব্যথার ছোবলে টাটিয়ে আছে। হাঁটু আর কনুইগুলোতেই মেরেছে বেশি, সামান্য নড়াচড়াতেই মনে হচ্ছে মরে যাবো। ঠোঁটের বাঁদিকটা ফেটেছে বিশ্রীভাবে, সে বুঝতেই পারছি। জিভে নোনা ঠেকছে এখনও।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

মা কে ওরা কাল নিয়ে গেছে, কোন এক বড়লোক ট্রেডিং-মাস্টারের স্ত্রীর লাইফ-শটের জন্যে। আমরা অবশ্য তৈরিই ছিলাম, কিন্তু ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটবে, বুঝিনি। আমি সাধ্যমতো মারপিট করেছিলাম অবশ্য, ফলাফল তো সারা শরীরে। ষোলোজন সশস্ত্র লোকপের সঙ্গে পেরে ওঠার কথাও ছিল না।

শুধু মাথার পেছনে লেজারশকটা খেয়ে যখন পড়ে যাচ্ছি, তখন অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মায়ের চোখে চোখ পড়ে গেছিল। দেখলাম, সেই চোখে নিজের জন্যে মায়ের একটুও ভয় নেই, শুধু আমাকে মার খেতে দেখার কষ্ট আর আতঙ্কটা আছে।

তোমাকে আর দেখতে পাবো না, তাই না মা? এতক্ষণে বোধহয় তুমি মরেও গেছো, তাই না? খুব কষ্ট হয়েছিলো গো মা? ব্যথা লেগেছিলো?

দুঃখ কোরো না মা, আমিও আসছি। বেশিদিন আর নেই।

১লা জুলাই, ৩০৩৯:

আজ মা কে শেষ বারের মতন দেখলাম, ক্রিমেশনস্টেশনে। সাদা ডেথ-স্যুটে ঢাকা শরীরে শুধু মুখটুকু জেগে আছে আমার বুড়ি মায়ের। অসীম প্রশান্তির চিহ্ন সারা মুখে। আহা, কত কথাই না বলার ছিল মায়ের সঙ্গে, কত কথাই আর বলা হলো না। আর কখনও বলা হবেও না।

একটু পরেই মায়ের বডিটা জ্বলন্ত ক্রিমেশনওভেনে ঢুকে যাবে। ছাই হিসেবে যেটুকু থেকে যাবে উড়িয়ে দেওয়া হবে কাছের কোনও ফরেস্ট-প্লেসে।

আজ আমি কাঁদছিলাম, হাউ হাউ করে কাঁদছিলাম। লোকপগুলো পাথরের মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বোবা মানুষের কান্না, কেই বা আর শোনে?

১০ই সেপ্টেম্বর, ৩০৩৯:

এরা বোধহয় ভেবেছে আমি পালিয়ে যাবো। চারিদিকে লোকপ বসিয়ে রেখেছে পাহারা দিতে। র‍্যাশন কালেক্ট করতে গিয়ে সেটা টের পেলাম।

র‍্যাশন নিয়ে ফিরে আসছি, দেখি উত্তরের আকাশ কালো হয়ে আসছে। মেঘ নয়, মানে মেঘের কালো নয়। যেন আকাশটাই কেউ দখল করে নিচ্ছে। কি জানি কি বিষয়-বৃত্তান্ত।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ৩০৩৯:

অ্যালিয়েন অ্যাটাক! পৃথিবীর ওপরে! আতঙ্কে থরথর কাঁপছে সারা পৃথিবী।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সেদিন উত্তরের আকাশ যে কালো হয়ে উঠতে দেখেছিলাম, ওটা আর কিছু নয়। অ্যালিয়েন স্পেস-শিপ আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হচ্ছিলো। টাইম-স্পেস বাঁকিয়ে ওয়র্মহোল তৈরি করা, যা আজ অবধি আমাদের কাছে সায়েন্স ফিকশন হয়েই থেকে গেছে, সেই টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে এরা হঠাৎ করে পৃথিবীর দোরগোড়ায় এসে হাজির! এত অল্প সময়ে ওজোন স্তরের ওপর অদৃশ্য জালের মতন ছেয়ে থাকা প্রোটেক্টিং স্যাটেনেট পেরিয়ে এরা যেভাবে চক্ষের নিমেষে হানা দিয়েছে তাতে আরও বোঝা যায় যে এদের টেকনোলজি আমাদের থেকে বহুগুণে উন্নত।

এত দিনে সারা পৃথিবী জুড়েই ওদের কয়েক হাজার ইন্টার-গ্যালাক্টিক স্পেস-শিপ। সারা আকাশ জুড়েই, যেদিকে তাকাও না কেন সেদিকেই। বিষণ্ণ অমোঘ নিয়তির মত তারা জুড়ে আছে এই গ্রহের সমস্ত আকাশ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। যেন অসহায় এই পৃথিবীকে দেখে ঠাট্টাতামাসা করতে এসেছে।

মানে এরা যদি চায় আমাদের নির্মূল করে বসতি গড়তে, আমাদের চান্স খুবই কম। যাক, তাতে আমার আর কি। যত তাড়াতাড়ি মায়ের সঙ্গে দেখা হয় ততই মঙ্গল। আমার এতে আর কিছু এসে যায় না।

২০শে নভেম্বর, ৩০৩৯:

সারা পৃথিবীজুড়ে চাপা দমবন্ধ করা একটা আবহাওয়া।

এদের টেকনোলজি যে আমাদের থেকে বহুগুণে উন্নত, সে আর বলে দিতে হয় না। পৃথিবীর সমস্ত মারণাস্ত্র লঞ্চ করার সিস্টেম এরা মুহূর্তে লক করে দিয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন ঠুঁটো জগন্নাথ।

মুশকিল হচ্ছে এদের কি দাবি, কেন এসেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সেন্ট্রাল কমাণ্ডের আধুনিকতম কমিউনিকেশন সিস্টেম অনেক চেষ্টা করেও কোনও যোগাযোগ করতে পারছে না। কোনও উত্তর, কোনও সিগন্যাল, কিছুই নেই। মনে হচ্ছে কয়েক হাজার পাহাড় যেন নির্বাক নিয়তি নির্দিষ্ট অভিশাপের মতই এই পৃথিবীর আকাশ জুড়ে জমে আছে।

যাক, আমার কি, গোল্লায় যাক এই পৃথিবী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

৩০শে নভেম্বর, ৩০৩৯:

আজ নাকি তেনাদের কেউ প্রথমবারের জন্যে দর্শন দিলেন। সারা পৃথিবীর সমস্ত নিউজ-ফিড আজ জেরুজালেমের রাস্তায়। স্বাভাবিক, পৃথিবীর এই এত হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও ভিনগ্রহের জীব এই মাটিতে পা রেখেছে। তাদের দেখতে কেমন এই নিয়ে মানুষের কৌতূহল হওয়াটা স্বাভাবিক। দুনিয়ার বোধহয় আজ এমন মানুষ একটিও নেই যে ওয়ার্ল্ডভিশন খুলে বসেনি।

যদিও শেষে বোঝা গেলো সে গুড়ে বালি। স্পেস-শিপ থেকে তারা নেমে এসেছিলো অদ্ভুত দর্শন এক যানে। জেরুজালেমের রোবটিক্স ফিল্ডের মাঠে নেমে তারা ঢুকে পড়ে তাদের জন্যে বিশেষ ভাবে নির্মিত কালো কাঁচ-ঢাকা হোভারকারে। তারপর সেই হোভারকার সোজা ঢুকে যায় কোরকমান্ড অফিসে। পুরো ব্যাপারটা এত গোপনীয় রাখা হয় যে কেউই তাদের টিকিটিরও দেখা পায় নি।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এদিকে আলোচনা কি হলো, কি এদের চাহিদা, কি পেলে এরা বিদায় হবে, বা আদৌ বিদায় হবে কি না এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সবাই খুবই উত্তেজিত। লোকপগুলোকেও দেখছি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে। সমস্ত এডুসেন্টার, স্টাডিভার্সিটি, হেলথ-পয়েন্ট, ওয়ার্ক-ক্লাউড সব বন্ধ। সারা পৃথিবীজুড়ে একটা ফিসফিসে ভয়ের আবহ ছড়িয়ে আছে যেন। হাজার হাজার গুজবে মাইণ্ডবুকে ছেয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটার বিবরণ আগেরটার চাইতে অনেক ভয়াবহ।

আজ রাতে স্বয়ং গোয়েলস্ফাইন ওয়ার্ল্ডভিশনে ভাষণ দেবেন। ওই শুরু হলো বোধহয়। দেখি কি বলে।

২রা ডিসেম্বর, ৩০৩৯:

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে একটা শক্ত শব্দ শিখিয়েছিল মা, ছোটবেলায়। সারা পৃথিবীর এখন সেই দশা। এরপর কি করা হবে কেউই কিছু বলতে পারছে না।

সেদিন ভিনদেশীদের সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি সেন্ট্রাল কমাণ্ডের। না, অন্য কোনও কারণ নয়, ভাষার অভাব। মানে পৃথিবীর কোনও মাইণ্ডরিডার, লিঙ্গুইস্টিকা কোন কিছু দিয়েই তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করা যাচ্ছে না। ফলে বিফল মনোরথ হয়ে তারা কাল চলে গেছে, এবং তার আগে শরীরী ভাষায় যেটা প্রকাশ করে গেছে, তার মানে আর যাই হোক বন্ধু-ভাবাপন্ন তাকে কিছুতেই বলা চলে না।

অজান্তেই আমার মুখে হাসি চলে এলো। আমার মা'কে ওরা টেনে নিয়ে গেছিলো না দীর্ঘজীবন লাভের জন্য? আরও কত লোকের মা, বাবা, সন্তান, আত্মীয়পরিজন, ভালোবাসার লোককে এই সেন্ট্রাল কমান্ড মেরে ফেলেনি যাতে করে সমাজের কিছু মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোক যেন অনেক অনেক বছর বাঁচে? কোথায় গেলো এতশত ষড়যন্ত্র, এত নিবিড় নিষ্পেষণ, অসহায় লোকের এত কান্না? আজ তোমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কে বাঁচাবে সেন্ট্রাল কমান্ড? কোন লাইফ-শট?

হা হা করে সেই অন্ধকার ঘরে বসে আমি হাসতেই লাগলাম, হাসতেই লাগলাম।

২৫শে ডিসেম্বর, ৩০৩৯:

দুপুরবেলা যখন কান্ট্রি কমাণ্ডের লাইট-জেট থেকে জেরুজালেমে নামলাম তখন বেশ লালচে মিঠে ঠাণ্ডা চারিদিকে। নেমেই দেখি একটা দামি হোভারকার দাঁড় করানোই আছে, তাতেই চারজন টপঅপসের অফিসার আর আমাকে নিয়ে কোরকমান্ড অফিসের দিকে রওনা আলসেবিদিয়াস, ইস্টইণ্ডিয়ানাল্যাণ্ডের লোকপ বাহিনীর হেডকপ।

আজ সকালে যখন ভদ্রলোক প্রায় জোর করেই আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকেন, চারজন গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার লোকপ নিয়ে তখনও আমার ব্রেকফাস্ট শেষ হয় নি। ঢুকেই ধরে-বেঁধে সোজা গাড়িতে চালান করার সময় আমি তো যেমন অবাক তেমন বিরক্ত। আজকেই কারও জীবনদাতা হতে হবে জানি, তা ধরে-বেঁধে নিয়ে যাওয়ার কি আছে? আরও আশ্চর্যের কথা যে তোরা দুদিন পর বাঁচবি কি বাঁচবি না তার ঠিক নেই, এখন আবার কার লাইফ-শট নেওয়ার বাই উঠলো?

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

একবারই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যাচ্ছি কোথায়। উত্তর এসেছিল, "জেরুজালেম",এবং তাতে বেশ অবাকই হয়েছিলাম।

কোরকমান্ড বিল্ডিংটা দেখতে গোল গম্বুজের মতন, আর বেশ ঠাণ্ডা। ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম এখানেই কি অপারেশন? সেন্ট্রাল কমান্ডের সবারই ত লাইফ-শট সেই কবেই নেওয়া। তবে?

ভুলটা যখন ভাঙলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আমি অবাক হওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

বিল্ডিঙের একদম টপ ফ্লোরে যে বিশাল ঘরটায় আমাকে এনে হাজির করা হলো, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় যে এটাই সর্বোচ্চ কমান্ডান্টদের মিটিং রুম। রুমের চারিদিকে থ্রিডি ভিশনস্পেস, যে কোনও ঘটনার, যা চারিদিকে ঘটছে, তার ক্ষুদ্র ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে। দেওয়ালে বিশাল স্ট্রিং-স্ক্রিন, পৃথিবীর বাইরের যাবতীয় খবর ধরার জন্যে। এখন অবশ্য সেই স্ক্রিন জুড়ে শুধু.....

ঘরের মধ্যিখানে ভাসমান টেবিল। তার চারিধার ঘিরে পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা, সবারই মুখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট।

টেবিলের একদম মাথায় যে লোকটাকে দেখছি, তাঁকে আমি অনেকবার ওয়ার্ল্ডভিশনে দেখেছি।

কমান্ডান্ট-ইন- চিফ গোয়েলস্ফাইন।

আমি সত্যি বুঝে উঠতে পারলাম না, আমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে।

শুরুটা গোয়েলস্ফাইনই করলেন, ওঁর সেই বিখ্যাত ওজস্বী কিন্তু সামান্য সানুনাসিক স্বরে,

"মাই বিলাভেড সিটিজেন, আমাদের মধ্যে আজ আপনাকে স্বাগত"।

আমি হতচকিত অবস্থায় শুনতে লাগলাম, "আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে? কি বিপুল বিপদের মধ্যে আমরা সবাই এই মুহূর্তে বাস করছি?" মাথা নাড়তে নাড়তে প্রথমবার খেয়াল করলাম যে ভদ্রলোকের ভাষার উপর দখল অসামান্য।

"আপনি নিশ্চয়ই এও অবগত আছেন যে কয়েকদিন আগে আমাদের মধ্যে আর ভিনগ্রহীদের মধ্যে যে আলোচনার সূত্রপাত হয় তা শুরুতেই ভেঙে যায়?"

মাথা নাড়লাম। জানি তো বটেই।

"আপনি কি জানেন তার কারণ কি?"

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

"দুই পক্ষেরই বোধ্য এমন ভাষার অভাব", বলে নিজেই চমকে গেলাম। এমন শুদ্ধ ভাষায় শেষ কবে কথা বলেছি আমি? এটা আমারই হ্যাণ্ডট্যাব তো?

"চমৎকার। এবার বলুন তো, মাননীয় নগর-সভ্য, আপনার কাছে যদি আপনার এই মাতৃভূমি, এই পৃথিবী কিছু সাহায্য চায়, আপনি কি সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করবেন? আপনি কি চান না মানবসভ্যতার উদ্ধারকারী হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে?"

আরেকটু হলেই হাততালি দিয়ে ফেলছিলাম। অসামান্য বাকপটু এই ভদ্রলোক। তবে বক্তৃতা যতই ভালো দাও, তোমাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে আমার বয়ে গেছে। তবুও নিছক কৌতূহলে জিজ্ঞেস করি, মানে হ্যান্ডট্যাবে ফুটে ওঠে "কি ধরণের সাহায্য, মাননীয় কমান্ডান্ট-ইন-চিফ?"

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর হাতের ইশারায় বাকি কমান্ডান্টদের যেতে বললেন। খানিকক্ষণ বাদে ঘর খালি হলে খর্বকায় কৃশ ভদ্রলোকটি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "মাননীয় নগর-সভ্য, এই ভিনজাতীয় হানাদারেরা একটা ভাষাই বোঝে, যেটা একমাত্র আপনি ছাড়া এই পৃথিবীর দুশো কোটি জনগণের মধ্যে আর কেউ জানে না।"

উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছিলাম আমি, "মাননীয় চিফ, আমার জ্ঞানত এমন কোনও ভাষা আমি জানি না, যা আর কেউ....."

"সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ", প্রায় চাপা ভুতুড়ে গলায় বললেন কমান্ডান্ট ইন চিফ, "দে অনলি স্পিক অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না আমাদের মধ্যে, মাননীয় নগর-সভ্য"।

মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা ঘুরে গেলো। তাই এত তোড়জোড়, আমাকে এখানে নিয়ে আসা। সেদিন থেকেই এরা জানতো, আর খোঁজাখুঁজি চলছিল। আলসেবিদিয়াস দেখেছিলেন আমাকে আর মা'কে...

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো মায়ের কথা মনে পড়তেই। নাহ, এদের সাহায্য করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

"মাননীয় চিফ। আশা করি অবগত আছেন যে এই পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে একজনই ছিলেন, আমার মা। শুধুমাত্র বোবা বলে....."

গোয়েলস্ফাইন দ্রুত এসে আমার হাত ধরলেন, "জানি নগর-সভ্য। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু আমাদের, কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকেদের পাপের জন্য সমগ্র মানব সভ্যতাকে কি আপনি ধ্বংসের মুখে ফেলে দিতে চান? চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন নগর-সভ্য, এরা কি আপনার কেউ নয়?"

গোয়েলস্ফাইনের হাতের ইশারায় মুহূর্তে জ্বলে উঠলো চারিদিকের সমস্ত থ্রিডি ভিশনস্পেস। সেখানে দেখলাম অগুনতি মানুষের মুখ, আফ্রিকানাস, ইউরোমেরিকান, রুশেশিয়ান। বৃদ্ধ অধ্যাপক, তরুণ চাকুরে, সাব নর্মাল প্রৌঢ় বাপ, প্রিভিলেজড আদুরে মেয়ে, দোকানদার থেকে শিক্ষক, লোকপ থেকে দরিদ্র হোভারকারচালক সবাই যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চুপ হয়ে, নিস্তব্ধ হয়ে, আমারই মতন বোবা হয়ে। যেন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

লক্ষ লক্ষ চোখ বলতে চাইছে...

মিটিং রুমের কাঁচের দেওয়াল ভেদ করে বিকেলের শেষ রোদ এসে যেন লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ে। প্রায় শেষ হয়ে আসা দিনের আলোয় যেন এক অলৌকিক মন্ত্রের মতন গোয়েলস্ফাইনের কথা আমার হ্যাণ্ডট্যাবে ফুটে উঠলো, "ইসরপুত্ত, আজ এদের দিকে তাকাও, এই লক্ষ মানুষের দিকে তাকাও। দেবে না, দেবে না তুমি এদের জীবন ফিরিয়ে? প্রতিশোধ কি তোমার বিবেক অন্ধ করে ফেলবে ইসরপুত্ত...."

আমি আর কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি, মরিয়মের সন্তান ইসরপুত্ত, মায়ের আদরের যিশু, কি করবো? কি করবো আমি? প্রতিশোধের যে আগুন বুকে দাউদাউ করে জ্বলছে তাতে এদের ছারখার হতে দেবো? নষ্ট হয়ে যেতে দেবো এই গ্রহকে? নাকি এই ইসরপুত্ত যিশু হয়ে উঠবে দুশো কোটি লোকের শেষ ভরসা, একমাত্র আশ্রয়, মহত্তম মানুষ?

শেষ জীবনদাতা!

অলঙ্করণঃ সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ধারাবাহিক অনুবাদ গল্পঃ

(অন্তিম পর্ব)

পর্ব-৩

মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে আমি যা যা পড়লাম এখনকার যেকোনো তথাকথিত পণ্ডিতের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশিরভাগই হায়ারোগ্লিফিকে লেখা থাকলেও আমি সেগুলো বুঝতে পেরেছিলাম ড্রোনিং মেশিনের সাহায্যে। তবে অন্যান্য বেশ কিছু খণ্ড এমন বিটকেল ভাষায় লেখা ছিল, হাজার চেষ্টা করেও প্রথমে সেগুলো উদ্ধার করতে পারিনি। পরে এগুলো পড়তেও কাজে লাগাই ড্রোনিং মেশিন। তবে জেগে ওঠার পর খুব ঝাপসা ভাবে এই স্মৃতিগুলো আমার মনে থাকত। এই উন্নত জাতি কিভাবে সময়কে জয় করেছে সেটা ভেবে খুব অবাক লাগতো। তার থেকেও বেশি অবাক হতাম এটা ভেবে বর্তমান সময় থেকে আমার চিন্তনকে সরিয়ে আনার পাশাপাশি ঠিক একই সময়ে কেউ ব্যবহার করে চলেছে আমার শরীর। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতি, শুক্রর মত গ্রহ থেকেও ঈথরা চিন্তনশক্তি সংগ্রহ করেছিল। আমাদের এই পৃথিবীর চিন্তনশক্তির মধ্যে ছিল অ্যান্টার্কটিকার ডানাওলা, তারার মত মুণ্ডু-ওলা আধা উদ্ভিদ প্যালিওজিয়ন প্রজাতি, ভ্যালুসিয়ার সরীসৃপ প্রজাতি, এমনকি প্রাক-মানবসভ্যতার সাতগুয়ার রোমশ জাতির গোটা চারেক নমুনা, বিবর্তনের শেষ পর্যায়ের মাকড়শা প্রজাতি আর ভয়ানক চো চো প্রজাতির নমুনাও ছিল।

এই সময় পাঁচ হাজার খ্রিস্টাব্দের এক দার্শনিক ইয়াং লির চিন্তনের সাথে কথা বলেছিলাম। কথা বলেছিলাম ষোলো হাজার খ্রিস্টাব্দের এক জাদুকর নাগসোথের সাথেও। এবং এদের সাথে কথা বলে আমি অতীতের বহু সমাধান না হওয়া রহস্যের আর ভবিষ্যতের বহু আসন্ন বিপর্যয় ও ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলাম।

এইসব স্বপ্নচারণের পর প্রত্যেকদিন সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙত দেখতাম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বপ্ন থেকে পাওয়া ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে এইসব নানারকম তথ্য নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করে দিতাম এবং আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য পেতাম। এখনকার বহু বিষয়, মানে যেগুলো নিয়ে অনেকের সন্দেহ আছে, স্বপ্নের মাধ্যমে তা অনায়াসে সমাধান করে দিতাম। টের পেতাম অতীতের এমন অনেক সত্য গোপন ছিল যা প্রকাশ পেলে সমগ্র মানবজাতি এক ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। মানবসভ্যতার পরে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হবে কীট-সভ্যতার। যারা শাসন করবে গোটা দুনিয়া। এবং অবশ্যই ঈথরা শাসন করবে গোটা ব্রহ্মাণ্ডকে। চিন্তন মনন আদানপ্রদানের খেলা অবশ্য চলতেই থাকবে। ঈথীয়ান লাইব্রেরীর যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হত শক্ত সেলুলোজ জাতীয় কাপড়ে। হাতে লেখা আর ছাপানো দুরকমই থাকত বই আকারে বাঁধাই অবস্থায়। বলা বাহুল্য এই স্বপ্নগুলো কখনোই আমাকে দৈনন্দিন জীবনের ছবি দেখায়নি। ঈথীয়ান দুনিয়ায় আমি

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

এতরকম প্রাণী আর প্রজাতি দেখেছিলাম, যে সবার কথা বলতে গেলে খণ্ডের পর খণ্ড লেখা হয়ে যাবে। খুব সম্ভবত আমি স্বপ্নে যে যুগের কার্যাবলী দেখতাম তা ছিল ১৫ কোটি বছরেরও আগেকার সময়ের- যখন পেলোজোয়িক যুগ শেষ হয়ে মেসোজোয়িক যুগ শুরু হতে যাচ্ছে।

এই সময় ঈথরা প্রায় মানুষের মতোই দেখতে এক ধরনের প্রাণীর শরীর দখল করেছিল। এই প্রাণীগুলো ঠিক কি পর্যায়ের বলতে পারব না, কারণ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তিতে এদের সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। ঈথদের কোষের গঠন ছিল অদ্ভুত আর অভিনব। এবং এই কোষের গঠনের জন্যই তারা কখনো ক্লান্ত হত না। তাই ঘুমেরও দরকার হত না। যাবতীয় পৌষ্টিক কার্যাবলী চালাত ওই শুঁড়ের মত উপাঙ্গ দিয়েই। আমাদের পরিচিত অনুভূতির মধ্যে মাত্র দুটি এদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল- দেখা আর শোনা। শোনার কাজ চালাত মাথার ওপরে থাকা ফুলের মত ধুসর রঙের অংশ দিয়ে আর দেখার কাজ চালাত কুঁতকুতে তিনখানা চোখ দিয়ে। এদের রক্ত ছিল থকথকে সবুজ রঙের। ঈথদের মধ্যে কোনরকম যৌন-ক্রিয়া না থাকলেও প্রজননের কাজ তারা চালাত বীজ বা দেহের নীচের দিকে থাকা এককোষী যৌন জননাঙ্গ দিয়ে। অগভীর জলাশয়ে চলত সদ্যজাতদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া। ঈথরা ছিল যথেষ্ট দীর্ঘায়ু। কমকরে চার থেকে পাঁচ হাজার বছর ছিল এদের আয়ু। যেহেতু ঈথদের স্পর্শক্ষমতা বা যন্ত্রণাবোধ ছিল না, তাই সদ্যজাতদের মধ্যে কারোর কোন খুঁত থাকলে তা ঈথরা চোখে দেখলেই বুঝে যেত। মৃত্যুর পর মৃতদের শরীর পুড়িয়ে ফেলা হত। ঈথদের হাতে বন্দী হওয়া কেউ কেউ ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার ফলেই কখনও কখনও আসন্ন মৃত্যুকে এড়াবার জন্য পালাতে সক্ষম হলেও এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটত না বললেই চলে। ঈথরা মিলিত হয়ে যে সমাজ গড়ে তুলেছিল, তাতে একনায়কতন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি যে উচ্চতায় তারা নিয়ে গিয়েছিল তা ধারনার বাইরে।

স্বপ্নচারণ আর জেগে উঠে যেটুকু মাথায় থাকতো সেগুলো নিয়ে সাতপাঁচ ভাবা এই ভাবেই চলছিল। আমার দুঃস্বপ্নের শেষ হত আমার চিৎকার দিয়ে। এগুলো আমার রোজনামচা হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে একইরকম বিভিন্ন কেস নিয়ে অনুসন্ধান চালাতাম। ১৯২২ সালে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেও ওই অপার্থিব আতঙ্ককে অতিক্রম করা ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। হয়তো এইভাবেই চলত, তারপর একদিন সমস্ত হিসেব গেল গুলিয়ে।

১৯৩৪ সালের ১০ই জুলাই আমার হাতে এলো সুদূর অস্ট্রেলিয়ার পিলবারা থেকে পাঠানো একটা চিঠি আর তার সাথে কিছু ফটোগ্রাফ আর কাগজপত্র। আর এই চিঠিটাই আমার সামনে তুলে ধরল সেই নারকীয় রহস্য উন্মোচনের এক অভাবনীয় সুযোগ। বেশি কিছু না বলে সরাসরি সেই চিঠির বয়ান হুবহু তুলে দিলাম:

অধ্যাপক ন্যাথানিয়েল উইনগেট পিসলি,
প্রযত্নে, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
৩০ই. ৪১ স্ট্রীট,
নিউইয়র্ক সিটি, ইউ.এস.এ

৪৯, ডাম্পিয়ের স্ট্রীট,
পিলবারা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া,
১৮ই মে, ১৯৩৪

মাননীয়েষু,

প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল যে আপনার সাথে আমার সরাসরি কোন পরিচয় নেই। কিছুদিন আগে পার্থ-এর নিবাসী ডঃ ই.এম.বয়েলের সাথে আমার বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছিল, তা কথা প্রসঙ্গে আপনার কথা অর্থাৎ আপনার ঐ দ্বৈত স্বত্বা নিয়ে কাগজে বিভিন্ন লেখালিখির কথা তিনি আমাকে বলেন। তিনি আমাকে এও জানান যে আপনি আপনার স্বপ্ন নিয়ে বিভিন্ন নিবন্ধ লিখেছেন। এই বিষয়ে আমি আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি আমাকে বলেন যে ডাকযোগে তিনি আমাকে সেগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। তা কদিন আগে তিনি আপনার লেখা বিভিন্ন নিবন্ধ, কিছু কাগজ ও ছবি আমাকে ডাকযোগে পাঠান। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার আর সরকারি খনি বিভাগের সাথে জড়িত। আপনি হয়ত শুনলে অবাক ও আশ্বস্ত হবেন যে আপনার স্বপ্নে দেখা বিভিন্ন জ্যামিতিক আঁকিবুঁকি আর অদ্ভুত ওইসব বিরাট পাথরের চাঁইয়ের কিছু নমুনা আমিও দেখেছি।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কিভাবে দেখলাম এবার সেই কথা বলি। বছর দুয়েক আগে সোনার খনির কাজে আমাকে যেতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে। তা কাজের জন্য সেখানকার আদিবাসীদের সাহায্য নিতেই হয়। এই আদিবাসীদের মুখেই প্রথম শুনি নানারকম অদ্ভুত প্রচলিত কিংবদন্তীর কথা। যার মধ্যে একটা ছিল এক অজানা প্রাচীন শহরের কথা। যেখানে নাকি ওইরকম পেল্লায় পাথরের চাঁই দেখা যায়, যেগুলোর গায়ে থাকে অদ্ভুত নকশা আর আপনার বর্ণনার সেই সব হায়ারোগ্লিফ। স্থানীয় এইসব আদিবাসীরা যে কুসংস্কার-গ্রস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু যেটা দেখলাম এই কিংবদন্তী নিয়ে তাদের মধ্যে এক অজানা চাপা আতঙ্ক। তারা আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে এর সাথে নিজেদের কিছু চালু উপকথাকেও মিলিয়ে নিয়েছে। যেমন বুদ্দাই নামে এক বিশালাকার বৃদ্ধ, যে কিনা যুগযুগ ধরে নিজের হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। যেদিন সে জেগে উঠবে তার আগ্রাসী খিদে নিয়ে খেয়ে ফেলবে গোটা দুনিয়াকে। আর যেখানে সে ঘুমিয়ে আছে তার আশেপাশেই দেখা যায় ওইসব রাক্ষুসে পাথরের চাঁই।

এই পাথরগুলো নাকি যেখানে আছে, তার নীচেই আছে এক ভয়ংকর দুনিয়া। যার বিস্তার কতদূর তা কেউ জানে না। এই দুনিয়া কতটা ভয়াবহ তা এই আদিবাসীদের কাছে অজানা হলেও এর প্রসঙ্গ উঠলেই তারা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। কারণ তারা নাকি শুনেছে বহুযুগ আগে কিছু সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় এইরকমই এক সুড়ঙ্গের ভেতর আর এরপর তারা কেউই আর ফিরে আসে নি। কিন্তু তাদের আশ্রয় নেবার পর থেকেই ওই জায়গা দিয়ে বইতে শুরু করে ভয়ানক ঝোড়ো বাতাস। আমি এদের এইসব আষাঢ়ে গপ্পে তেমন পাত্তা না দিলেও আমার মনে গেঁথে আছে বছর দুয়েক আগের সেই স্মৃতি।

বছর দুয়েক আগে এই মরুভূমিরই ৫০০ মাইল পূর্বে আমি এরকমই কিছু রাক্ষুসে পাথরের চাঁই দেখেছিলাম। প্রায় ১২ ফুট লম্বা এই চাঁইগুলো মাটিতে পোঁতা ছিল। প্রথমে কিন্তু আমি এগুলোর গায়ে কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি, কিন্তু একটু কাছে গিয়ে ভালভাবে দেখার পর এর গায়ে গভীরভাবে খোদাই করা অদ্ভুত কিছু আঁকাবাঁকা রেখা দেখতে পাই, ঠিক যেমনটি ওই আদিবাসীরা তাদের আষাঢ়ে গপ্পে বলেছিল। কেন জানিনা আমার মনে হল মাইল-খানেকের মধ্যে এরকম আরও ৩০- ৪০ টা পাথরের চাঁই পোঁতা থাকলেও থাকতে পারে। আমার যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটু খোঁজার পর দেখলাম ঠিক তাই। খুঁজে পেলাম এরকম আরও কয়েকটা চাঁই। এবং সেগুলোর কাছে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। এবং আশ্বস্ত হবার পর দশ বারোটা ছবিও তুললাম। ছবিগুলো এই চিঠির সাথেই আপনাকে পাঠিয়েছি। এর আগে অবশ্য আমি এই চিঠি আর তথ্যগুলো পার্থের সরকারি বিভাগেও পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা এগুলোতে কোন পাত্তাই দেয়নি। এর পর আমার সাথে আলাপ হয় ডঃ বয়েলের। এই ডঃ বয়েল আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির জার্নালে আপনার নিবন্ধগুলো পড়েছিলেন। আমি তাঁকে এই পাথরের চাঁইগুলোর কথা বলতেই তিনি প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে পড়েন। আমি তাঁকে এও জানাই যে এই পাথর আর এর গায়ে আঁকা নকশাগুলোর সাথে আপনার স্বপ্নে দেখা নকশাগুলোর যথেষ্ট মিল আছে। সাথে আমি তাঁকে আমার তোলা ছবিগুলোও দেখাই। এর পরেই তিনি আমাকে বলেন অবিলম্বে আপনার সাথে চিঠিতে যোগাযোগ করার জন্য। আমার এই চিঠিটা পাঠাতে একটু দেরী হল কারণ ইতিমধ্যে ডঃ বয়েল আমাকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার প্রায় সব প্রবন্ধ নিবন্ধ আমাকে পাঠান, আমি আরও একবার সমস্ত আঁকা আর বর্ণনাগুলো ভালভাবে মিলিয়ে নিলাম এবং দেখলাম ঠিক যেমনটি আপনি বলেছেন আমার এই ছবিগুলোও সেইরকমই। এবং ওই পত্রপত্রিকার কপি আর যাবতীয় তথ্য ইত্যাদিও চিঠির সাথে পাঠালাম। বাকিটা নাহয় ডঃ বয়েলের থেকে সরাসরি সাক্ষাতেই শুনে নেবেন। সত্যি কথা বলতে কি এগুলো দেখার পর আমি বুঝতে পারলাম এগুলো আপনার কাছে ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আগেই বলেছি একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরুন ভূতত্ত্ব সম্পর্কে অল্পবিস্তর পড়াশোনা আমার আছে। সেই নিরিখেই বলতে পারি এই পাথরের চাঁইগুলো এতটাই প্রাচীন যে সাধারণ ভূতত্ত্বের জ্ঞান দিয়ে এগুলোর আনুমানিক বয়েস বলা অসম্ভব। তবে এটুকু বলতে পারি পৃথিবীর গঠনের সময়ও এই পাথরগুলোর অস্তিত্ব ছিল। এই পাথরগুলোর উপাদান হিসেবে থাকা কংক্রিট আর সিমেন্টের উপাদান রীতিমতো বিস্ময়কর। এবং আরও বুঝতে পারি বহুদিন, হয় তো সহস্র লক্ষাধিক বছর কিংবা তারও বেশিদিন এগুলো জলের তলায় ডুবে ছিল। এবং বহু যুগের বিবর্তনের সাক্ষী এই পাথরের চাঁইগুলো। আর এগুলো বারেবারে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক কতদিন আমি বলতে পারব না। সত্যি বলতে কি ভাবতেও চাই না। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত আমরা দুজনেই মুখোমুখি হয়েছিলাম বহু প্রাচীন এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের।

একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত এগুলো হাতে পাবার পর আপনি অবশ্যই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সেই মরুভূমিতে অভিযান করতে চাইবেন। এ ব্যাপারে আমার আর ডঃ বয়েলের তরফ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা আপনি পাবেন। আপনি চাইলে আপনার পরিচিত কোন সংস্থার সাথেও অভিযানের আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। আমি অভিযানের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালাবার জন্য কিছু মজুরের

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ব্যবস্থা করতে পারি। কারণ স্থানীয় ওইসব আদিবাসীদের দিয়ে এসব কাজ আর করানো যাবে না। ব্যাটারা ভয়েই কুঁকড়ে আছে। তবে এই অভিযানের ব্যাপারে আপনি, আমি ও ডঃ বয়েল ছাড়া আর কেউ জানবে না। আর একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, যদি কিছু আবিষ্কারও করতে পারি সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হবে আপনার।

এবার আসি জায়গাটার প্রসঙ্গে। পিলবারা থেকে মোটর ট্র্যাক্টরে করে ওখানে পৌছতে দিন চারেক লাগবে। ওই মোটর ট্র্যাক্টরে আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতিও নিয়ে নেওয়া যাবে। ওয়ারবার্টন পাথের দক্ষিণ পশ্চিমে আর জোয়ানা প্রপাতের ১০০ মাইল দক্ষিণে গিয়ে শেষ হবে ট্র্যাক্টর যাত্রা। তারপর ডি গ্রে নদীপথেই আমাদের পরবর্তী যাত্রা শুরু হবে। ওই পাথরের চাঁইগুলোর সঠিক অবস্থান হল ২২ ডিগ্রি ৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ড দক্ষিণ অক্ষাংশ আর ১২৫ ডিগ্রি ০ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড পূর্ব দ্রাঘিমা। ওখানকার আবহাওয়া কিন্তু খুবই গরম আর ক্রান্তীয় প্রকৃতির। তাই জুন থেকে আগস্টের মধ্যেই যাওয়া ভাল। যদি আপনারও কোন পরিকল্পনা থাকে সেটাও জানাবেন। সে যাই হোক অত চিন্তা করার কিছু নেই। বাকি কথাবার্তা নাহয় সামনাসামনিই হবে। ডঃ বয়েলও আপনাকে পরে চিঠি লিখবেন। আর জরুরী কিছু বলার হলে না হয় পার্থ থেকে তার করে দেওয়া যাবে।

আপনার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।

নমস্কারান্তে

রবার্ট. বি. এফ. ম্যাকেঞ্জি

চিঠিটা পড়বার পর কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই চিঠিটা আরও বার দুয়েক পড়লাম। আনন্দে আর উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতর ধুকপুকুনিটা যেন স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। এরপর আর খুব বেশি দেরী করিনি। আমার জবাব ম্যাকেঞ্জি আর ডঃ বয়েলকে জানিয়ে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে মিসকাটোনিক বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সাহচর্য আর পৃষ্ঠপোষকতা পেতে আমার খুব বেশি অসুবিধে হয় নি। ওদিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ম্যাকেঞ্জি আর ডঃ বয়েলও যাবতীয় আয়োজন সেরে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আমরা বিষয়টা যতটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেটা আর হল না। সর্বজ্ঞ কাগজ-ওলারা ফেউয়ের মত লেগে গেল আমাদের পেছনে। শুরু হল আমাদের এই আসন্ন অভিযান নিয়ে নানারকম আষাঢ়ে গল্প আর টিটকিরির বন্যা। যদিও আমাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য তাদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তাই গুজব আর টিটকিরিতেই এগুলো সীমিত থাকল।

এবার এই অভিযানের আমার সহযাত্রীদের নিয়ে বলা যাক। প্রথমেই বলব মিসকাটোনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপকের কথা। এঁরা হলেন ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম ডায়ার (যিনি ১৯৩০-৩১ নাগাদ অ্যান্টার্কটিকা অভিযান করেছিলেন), প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ফার্ডিনাণ্ড সি অ্যাশলে আর নৃতত্ত্ব বিভাগের টাইলার এম. ফ্রিবরন। এবং এদের সাথে অবশ্যই ছিল আমার মেজো ছেলে উইনগেট। ১৯৩৫ নাগাদ ম্যাকেঞ্জি আর্কহ্যামে আসে। এবং আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে যারপরনাই সাহায্য করে। আমি এই পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই ভদ্রলোকের উৎসাহ, আর অস্ট্রেলিয়ার হাল হকিকত নিয়ে জ্ঞান যত দেখছিলাম ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

চিঠিতে যেমন বলা ছিল ঠিক সেইভাবেই পিলবারাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মোটর ট্র্যাক্টর। আর এরপর আমরা ভাড়া করে নিই একটা টহলদারি স্টিমার। আমরা একেবারে আধুনিক আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাতে যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো যায় তার জন্য সবরকম যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলাম। ১৯৩৫ এর ২৮শে মার্চ আমরা বোস্টন থেকে এসে পৌঁছলাম লেক্সিংটনে। সুয়েজ খাল বরাবর আটলান্টিক সাগর, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম লোহিতসাগরে এবং ভারত মহাসাগর পেরিয়ে আমরা চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। যাত্রাপথের ক্লান্তিকর আর দীর্ঘ বর্ণনায় আর গেলাম না। ইতিমধ্যে আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছেন ডঃ বয়েল। মনোবিজ্ঞানের ওপর তাঁর দখল দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এবং বাকি যাত্রাপথ আমি আর উইনগেট তাঁর সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলাম।

যাত্রাপথের শেষে যখন আমাদের অভিযানের দল সেই বালি আর পাথরের দুনিয়ায় প্রবেশ করল, তখন ক্লান্তিতে আমাদের যা হাল হয়েছিল তা হয়ত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অবশেষে ৩১শে মে এক শুক্রবার ডি গ্রে নদীর শাখা বেয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অজানা আর অদ্ভুত জগতে। যে অপার্থিব বস্তুগুলো এতদিন আমার দুঃস্বপ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেগুলোকে সামনে দেখলে ঠিক কি মনে হতে পারে, একথা ভাবতেই এক অজানা আর নারকীয় আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করল।

৩রা জুন, সোমবার আমরা এসে পৌঁছলাম সেই জায়গায়, যেখানে ওই রাক্ষুসে পাথরের চাঁইগুলো রয়েছে। প্রথমে অর্ধেক পোঁতা পাথরটা দেখে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলাম। তারপর যখন সেটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম, তখন যে আমার ঠিক কি অনুভূতি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ওই পাথরের চাঁইটা ছিল আমার স্বপ্ন তথা দুঃস্বপ্নে দেখা দৈত্যাকার স্থাপত্যে তৈরি বাড়িগুলোর দেওয়ালের একটুকরো ভগ্ন নিদর্শন। ওই পাথরের গায়ে খোদাইয়ের চিহ্ন ছিল। এবং যখন হাত দিয়ে একটা নকশাকে দেখে চিনতে পারলাম, উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপতে লাগলো। কারণ বহুদিন ধরে নিয়মিতভাবে যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্ন আর গবেষণার ফলে ওই নকশাটা ছিল আমার কাছে ভীষণভাবে পরিচিত।

একমাস ধরে খোঁড়াখুঁড়ি চালাবার পর নানারকম আকৃতির প্রায় ১২৫০ টা পাথরের চাঁই আমরা খুঁজে পেলাম। বেশিরভাগই ছিল ওপর-নীচে ঢেউ খেলানো মান্ধাতা আমলের খোদাই করা স্মৃতিস্তম্ভের মত। কিছু ছিল আমার স্বপ্নে দেখা ওই পাষাণ-পুরীর মেঝে আর রাস্তার ধারের ফুটপাতের মতোই চৌকোণা বা আট-কোণা চ্যাটালো ছোট পাথর। কয়েকটা আবার দানবীয় আকারের পাথরও ছিল। আমরা উত্তরপূর্ব দিক বরাবর যত খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে লাগলাম ক্রমাগত এরকম পাথরের নমুনা আরও চোখে পড়তে লাগল। যদিও এযাবৎ আবিষ্কৃত সবকটা পাথরের মধ্যে কোনরকম যোগসূত্র আছে কিনা সেটা আমরা বের করতে পারিনি। অধ্যাপক ডায়ার এই পাথরগুলোর প্রাচীনত্ব দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তবে অধ্যাপক ফ্রিবরন অবশ্য কিছু চিহ্নর সাথে পাপুয়ান আর পলিনেশীয় ভয়ানক কিছু প্রচলিত কিংবদন্তীর মিল খুঁজে পেলেন। তবে পাথরগুলোর অবস্থা দেখে আমরা সকলেই একটা বিষয়ে একমত ছিলাম, এগুলো বহু যুগের বিবর্তনের সাক্ষী।

আমাদের সাথে যে এরোপ্লেন ছিল আমার মেজো ছেলে উইনগেট তাতে চেপে মাঝেমাঝেই বিভিন্ন উচ্চতা থেকে জরিপ করে মরুভূমির বালি আর পাথরগুলোর মধ্যে নতুন কোন চিহ্ন বা সূত্র খুঁজে দেখার চেষ্টা চালাত। অবশ্য তার এই চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন সে সাফল্যর মুখ দেখল। ঝোড়ো হাওয়ার ফলে বেশ কিছু বালি এক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। আর তার ফলেই তার চোখে পড়ল নতুন এক পাথরের ছাঁদ। আর এইগুলোর মধ্যে দু একটা দেখার পরই আমি চিনতে পারলাম এই ছাঁদগুলোকে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না হুবহু কোথায় এগুলোকে আমি দেখেছিলাম। হতে পারে আমার সেই নারকীয় দুঃস্বপ্ন অথবা দিনরাত পড়াশোনা আর গবেষণার ফলেই হয়ত অবচেতন মনে এর ছাপ রয়ে গেছে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ আমি প্রথম সেই অজানা উত্তুরে ভয়ানক বাসিন্দাদের সম্পর্কে ভয় আর কৌতূহল মেশানো একটা অদ্ভুত গা শিরশিরে অনুভূতি টের পেলাম। হয়ত এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল আমার আগের ভয়ানক অভিজ্ঞতার স্মৃতি। আমি মাথা থেকে এই সব চিন্তা হটাবার জন্য নিজেকে নানারকম মনো-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলাম। কিন্তু সবই বিফল হল। এই সময় গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত যোগ হল অনিদ্রা। তবে এটা আমার কাছে তেমন কোন অসুবিধে হয়নি, কারণ ঘুমলেই তো আবার ওইসব স্বপ্ন দেখতে হবে! সে যাইহোক এই সময় আমার একটা নতুন অভ্যাস তৈরি হল। সেটা হল গভীর রাতে উত্তর বা উত্তরপূর্ব দিক বরাবর মরুভূমিতে হাঁটা। কেন জানিনা মনে হত হয়ত আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত দুঃস্বপ্ন নগরীর বা তার বাসিন্দাদের দেখা পেলেও পেতে পারি। নিজের ইচ্ছা থাক বা না থাক কেউ যেন জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে যেত ওই নৈশভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতেই কখনো কখনো হোঁচট খেতাম মাটি থেকে সামান্য উঁকি মারা সেই আদ্যিকালের স্থাপত্যের কিছু পাথরের টুকরোয়। কিন্তু সেগুলো সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। যদিও আমার বিশ্বাস ছিল মাটির নীচে এই স্থাপত্যের সিংহভাগই বহুযুগ ধরে লুকিয়ে রয়েছে। তার কারণও ছিল অবশ্য। আমাদের ক্যাম্পটা ছিল ওই পাথুরে টুকরোগুলোর থেকে উঁচু জায়গায়। বালির ঝড়ের দৌলতে একটা সাময়িক টিলার সৃষ্টি হয়েছিল। আর টিলার জন্যই অপেক্ষাকৃত নতুন পাথরের টুকরোগুলো কিছুটা মাথা বের করে ছিল।

এই গোটা এলাকার খোঁড়াখুঁড়ি চালালে ঠিক কি কি আবিষ্কার হতে পারে তার জন্য আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলাম না। এই নৈশভ্রমণের ফলেই আমি একদিন আবিষ্কার করলাম এক ভয়ানক জিনিস। সেটা ছিল জুলাই মাসের ১১ তারিখ। জ্যোৎস্নায় ঝলমলে হয়ে ছিল গোটা এলাকাটা। আমিও নিজের নৈশভ্রমণের এক্তিয়ার পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম আরও খানিকটা। এবং ঘুরতে ঘুরতেই আমার চোখে পড়েছিল একখানা রাক্ষুসে পাথরের চাঁই। পাথরটা প্রায় পুরোটাই বালিতে ঢেকে গিয়েছিল। আমি ভালভাবে দেখার জন্য দুহাত দিয়ে সব বালি পরিষ্কার করলাম। তারপর চাঁদের আলো আর আমার ইলেকট্রিক টর্চের যুগলবন্দীতে ভালভাবে দেখতে লাগলাম পাথরটা। একেবারে নিখুঁত

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

বর্গাকার এই পাথরটা ছিল আমাদের অভিযানে আগে দেখা সবকটা পাথরের থেকে এক্কেবারে আলাদা। ব্যাসাল্ট জাতীয় শিলা দিয়ে তৈরি এই পাথরের চাঁইটায় কোন উত্তল বা অবতল অংশ ছিলনা। আর তখনই আমার মাথায় একটা ঝলক দিল! ঠিক এইরকম পাথরগুলোকেই আমি আমার স্বপ্নে দেখতাম। ঈথদের দুনিয়ায় আমি যে জানলা-হীন পেল্লায় পাথুরে বাড়িগুলো দেখতাম, এই পাথরটা সেই বাড়িগুলোরই একটা অংশ। এই বাড়ির মধ্যেই পাতাল-কুঠুরিতে চিরকালের জন্য দরজার মুখ বন্ধ করে রেখে দেওয়া হত কোন অপার্থিব শক্তিকে। আর দেরী নয়, দৌড় লাগালাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে। সে রাতে আর ঘুম এলোনা আমার। ভোরবেলা বুঝতে পারলাম কি বোকামিটাই না করেছি! একটা মান্ধাতা আমলের উপকথা আর আমার দুঃস্বপ্নের ভিত্তিতে ওভাবে ভয় পাওয়াটা আমার উচিত হয়নি। একটু বেলা হলে আমি সবাইকে আমার আবিষ্কারের কথা বললাম। তারপর সবাই মিলে একসাথে রওনা দিলাম পাথরটাকে দেখার জন্য। কিন্তু আমার কপালটাই বোধহয় খারাপ ছিল। গতরাতে বালির ঝড়ে গোটা এলাকাটা ঢাকা পড়ে গেছে, ফলে আমি ঠিক কোন জায়গাটায় ওই পাথরটাকে দেখেছিলাম খুঁজে বের করতে পারলাম না।

এইবার আমি আমার এই লেখার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে বলতে চলেছি। কারণ একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এগুলো কখনই আমার কল্পনা বা স্বপ্ন নয়, ভয়ঙ্কর রকমের সত্যি। কারণ আমার মেজো-ছেলের মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল আর ও কখনোই এই বিষয়গুলোকে হাল্কা-ভাবে নেয়নি। আর আমার এই কেসের গোড়া থেকেই উইনগেট সাক্ষী ছিল। যাই হোক এবার আসি আসল ঘটনায়। সেটা ছিল জুলাই মাসের ১৭ ১৮ তারিখের এক রাতের ঘটনা। বাইরে তুমুল ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। আমি ক্যাম্পে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেও ঘুম আসছিল না। তখন বোধহয় ১১টা বেজেছিল, দেখলাম আর শুয়ে কাজ নেই। যথারীতি আমার সেই নৈশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাম্প থেকে যখন বেরোচ্ছি ট্যাপার বলে একজন অস্ট্রেলিয়ান খনি মজুর আমাকে দেখে অভিবাদন জানাল। আকাশে তখন ঝলমলে চাঁদ তার নিজস্ব শোভা নিয়ে বিরাজমান। জ্যোৎস্নায় চারদিক উজ্জ্বল। আমি নিশ্চিত কারোর কবিতা লেখার শখ থাকলে তিনি বেশ কয়েক ছত্র কবিতা লিখে ফেলতেন। কিন্তু আমি তো ঘরপোড়া গরু, তাই কি একটা অশুভ আমাকে যেন ক্রমাগত ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল। খেয়াল করলাম সেই ঝোড়ো বাতাসটা আর তেমন জোরে বইছে না। বুঝলাম আগামী চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আর ঝোড়ো বাতাস বইবে না। আসলে ট্যাপারদের সাথে কথা বলে এইসব ব্যাপারস্যাপার আমিও বেশ জেনে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ হেঁটেছিলাম খেয়াল নেই, তখন বোধহয় ৩:৩০ বেজেছিল, আবার সেই ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। সেই ঝোড়ো বাতাসের এমনই দাপট ছিল যে আমাদের ক্যাম্পের সকলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙে যেতে সবাই দেখল আমি গায়েব। কিন্তু যেহেতু আমি রোজই নৈশ-ভ্রমণে বেরুতাম, কেউ গা করেনি। এদিকে তখনও বাইরে জ্যোৎস্না ঝলমল করছে, আকাশে ছিটেফোঁটাও মেঘ নেই। আমাদের ক্যাম্পের কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান মজুর আবার বেশ কুসংস্কার-গ্রস্ত ছিল। তারা মনেপ্রাণে এইসব প্রচলিত উপকথায় বিশ্বাস করত। তাদের ধারনা ছিল মেঘহীন ঝকঝকে আকাশ থাকা সত্ত্বেও যখন অনেকদিন বাদে এই ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করবে, সেটা নিশ্চিত ভাবে অশুভ। এই বাতাসে কান পাতলে নাকি অনেক অপার্থিব ফিসফিসানি শুনতে পাওয়া যায়। আর এই বাতাসের ফলেই বালির ভেতর থেকে জেগে ওঠে বহু যুগ ধরে মাটির নীচে সুপ্ত থাকা সেইসব রাক্ষুসে আঁকিবুঁকি কাটা পাথরের চাঁই। এই সময় তারা ভুলেও ওই এলাকা কখনও মাড়ায় না। তখন আন্দাজ চারটে বাজে, দুম করে ঝোড়ো বাতাস বওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই বালি ফুঁড়ে তখন অনেক নতুন আকারের পাথর মাথা তুলেছে।

যখন পাঁচটা নাগাদ চাঁদ পশ্চিমদিকে বিদায় নিলো, আমিও টলতে টলতে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। আমার মাথায় না ছিল কোন টুপি, আর ইলেকট্রিক টর্চটাও গিয়েছিল হারিয়ে। আর আমার চেহারা অবিকল লাশকাটা ঘরের কোন কাটাছেঁড়া করা লাশের মতোই ফুটিফাটা,শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পের সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়লেও অধ্যাপক ডায়ার ক্যাম্পের সামনে বসে জুত করে পাইপ টানছিলেন। আমার চেহারার হাল দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডঃ বয়েলকে ডেকে আনলেন। তারপর দুজনে মিলে আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন আমার বিছানায়। এর পর ডঃ বয়েল, অধ্যাপক ডায়ার আর উইনগেট মিলে আমাকে ঘুমপাড়ানোর চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু আমার তখন যা মানসিক অবস্থা ওসব ঘুমটুম তখন বিশ বাঁও জল। হয়ত এযাবৎ আমার মানসিক অবস্থা যতবার বিগড়েছে, এবারেরটা ছিল সবথেকে ভয়াবহ। কিছুক্ষণ বাদে আমি এলোমেলো ভাবে আমার হাল কিকরে এরকম হল বর্ণনা দিতে শুরু করলাম। আমি ওদের বললাম যে আমি ক্লান্ত হয়ে বালির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যেসব ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছিলাম তা এযাবৎ কাল যত দুঃস্বপ্ন দেখেছি, সবগুলোকে টেক্কা দিয়েছিল। অবশেষে যখন আমার স্নায়ু আর দুঃস্বপ্নের ভার বইতে পারে নি, তখন আমি জেগে উঠি। এবং প্রচণ্ড ভয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসার সময় ওই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পাথর-গুলোয়ে ধাক্কা খেয়েই হয়ত আমার শরীর এভাবে কেটেছড়ে গেছে। হয়ত আমি একটু বেশিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তবে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

একটা কথা মানতেই হবে যে ওই বীভৎসতার মুখোমুখি হয়েও আমি নিজেকে খুব ভালভাবে সামলে নিয়েছিলাম। এরপর আমি জানাই আমাদের অভিযানের কর্মসূচী একটু পালটে যাবতীয় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ উত্তরপূর্ব দিক বরাবর করলে ভাল হয়। যদিও আমার কথায় কোন যুক্তি ছিল না। শুধু কিছু দুঃস্বপ্ন আর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কেউই কর্মসূচী পালটাতে রাজি হয়নি। এদিকে আমাদের অভিযানের পুঁজিও ফুরিয়ে আসছে, আর আমার যা শরীর ও মনের অবস্থা তাতে কোন নতুন ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি হয়নি, এমন কি উইনগেটও নয়।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে ক্যাম্পের চারদিকে একটু টহল দিলেও ওদের খোঁড়াখুঁড়ির কোন কাজে কোন অংশ নিলাম না। দেখলাম এদের সাথে থাকলে আমার কাজ তেমন এগোবে না। কিন্তু আমাকে কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। তাই ঠিক করলাম আমাকে দেশে ফিরতে হবে। আমার মেজো-ছেলে উইনগেটকে বললাম আমার সাথে বিমানে প্রায় হাজার মাইল দক্ষিণ পশ্চিম -পার্থে যাবার জন্য। সাথে এও বললাম সেখানে পৌঁছনোর পর যাবতীয় যা কাজ সব আমি একাই করব। জুলাই মাসের ২০ তারিখ নাগাদ উইনগেট আমার সাথে পার্থে রওনা দিল। ২৫ তারিখ লিভারপুল থেকে স্টিমার ছাড়া অবধি ও আমার সাথে ছিল। এবং স্টিমারের কেবিনে বসে বসেই আমি এই লেখা লিখছি। কারণ আমার মনে হয়েছে, উইনগেটের গোটা ব্যাপারটাই জানা দরকার। বিশেষ করে সেই রাতের ঘটনাটা যেটা আমি কাউকে বলিনি। আমার দুঃস্বপ্নের প্রতীক সেই নারকীয় হায়ারোগ্লিফিক লেখাওলা সাইক্লোপিয়ান পাথরগুলো যখন পাতাল ফুঁড়ে আমার সামনে হাজির হয়েছিল, আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন আর তাদের কেন্দ্র করে আমার গবেষণা সবকিছু নিছকই শিশুসুলভ মনে হয়েছিল। হয়ত আকাশ থেকে জরিপ করার সময় উইনগেট এই পাথরগুলোই দেখেছিল আর এদের মধ্যে মিল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হয়ত আমি যখন এগুলো তেমন ভাবে খেয়াল করি নি, কোন এক অজানা, অশুভ শক্তি প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিল এগুলো আমার দৃষ্টিগোচরে আনতে। আমি আগেই বলেছি জুলাই মাসের ১৮ তারিখের সেই চাঁদনী রাতে ঝোড়ো বাতাস হঠাৎ করেই থেমে গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার সেই মরুভূমি আচমকাই সমুদ্রের মত শান্ত আর স্থির হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু আমার এই অভিযানে তেমন কোন কাজ ছিল না, তাই উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতাম, উদ্দেশ্য একটাই যদি কপালফেরে সেই দুঃস্বপ্ন নগরীর কোন নিশান খুঁজে পাই! আমরা জানি আমরা সবথেকে বেশি ভয় পাই অজানা, অচেনাকে। কিন্তু সেই অজানা অচেনা জিনিস যদি আমাদের চোখের সামনে বারেবারে উঠে আসে আমাদের ভয় অনেকটাই কমে যায়। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আদৌ তাই হয় নি, বরং উল্টোটাই হয়েছিল। স্বপ্নের জগতের সেই সব করাল বিভীষিকারা যখন স্বপ্নের গণ্ডি পেরিয়ে আমার রোজকার জীবনে হানা দিয়েছিল, আমার জীবন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। আমার চোখের সামনে প্রাক মানবসভ্যতার সেইসব ভয়াবহ পাথুরে আতঙ্ক-পুরীর বালি-আবৃত বারান্দা, খিলান, কুঠুরি – বারেবারে ফিরে ফিরে আসত। সাথে অবশ্যই সেইসব হায়ারোগ্লিফিক নকশা। এখানেও কিন্তু আমি ঠিক ঐ আতঙ্ক-পুরীর মতোই বিভিন্ন বালি দিয়ে ঢাকা পাথরের চাঁই দেখতাম। সেদিন ঠিক কতক্ষণ ধরে কোন দিক বরাবর আমি হেঁটেছিলাম আমার কোন খেয়ালই ছিল না। তাই যখন আমি হাঁটতে হাঁটতে ওই পাথরের চাঁইগুলোর কাছে সেদিন পৌঁছলাম, আমার বুকের ভেতর দামামা বাজতে লাগল। কারণ একসাথে এতগুলো পাথরের চাঁই আমি এখনও পর্যন্ত দেখিনি। আকাশের চাঁদ আর মরুভূমিকে এখন আর সৌন্দর্যের প্রতীক মনে হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল অগণিত বছর ধরে কোন অন্ধ অতীতের সাক্ষী এরা।

আমি এবার একটু কাছে এগিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর আমার ইলেকট্রিক টর্চের আলো ফেললাম। প্রায় চল্লিশ ফুট দুরে একটা টিলা দেখতে পেলাম। আমার কেন জানিনা মনে হল এই পাথরের চাঁইগুলো কোনভাবেই সাধারণ হতে পারে না। এযাবৎ আমরা যেকটা নমুনা দেখেছি, এগুলো তার থেকে অনেক গভীর অর্থপূর্ণ ছিল। এগুলোর ওপর যে আঁকাবাঁকা রেখাগুলো ছিল, সেগুলো আমি দেখেই চিনতে পারলাম। গবেষণা করে করে এই রেখাগুলো আমার খুবই পরিচিত। অনেক কসরত করে আমি একটু নিচু জায়গা দেখে নামলাম। তারপর এখানে ওখানে যে বালি লেগেছিল, সেগুলো আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলাম। তারপর ক্রমাগত এগুলোর আকার,আকৃতিগত সামঞ্জস্য খুঁজতে লাগলাম। প্রথমে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঠিক তারপরেই টের পেলাম এই ধ্বংসস্তূপকে কোথায় দেখেছি! এগুলো হল আমার দুঃস্বপ্নে দেখা সেই রাক্ষুসে তিরিশ ফুট লম্বা ইমারতেরই ভগ্নাংশ! কিন্তু এগুলো ঠিক কতদিন ধরে মাটির নীচে লুকিয়ে ছিল কোন কূলকিনারা পেলাম না। আমি এই পেল্লায় ইমারতের লাইব্রেরী, বারান্দা, সেইসব ঘরগুলো এবং সর্বোপরি সেই দানবীয় ঈথদের অনেক আগেই দেখেছিলাম। আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বইতে লাগল।

হঠাৎ টের পেলাম সেই পাথরের গাদা থেকে আবার ঠাণ্ডা, দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঠিক যেন গভীর পাতাল থেকে কোন ঘূর্ণাবর্ত জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। বাইরের এই ধ্বংসস্তূপগুলো যার খোলস। আমার প্রথমেই মনে পড়ল স্থানীয় আদিবাসীদের সেইসব উপকথার কথা। কিন্তু তারপরেই আমার মনে পড়ে গেল আমার সেইসব দুঃস্বপ্নের কথাগুলো। টের পেলাম আমার বহু আতঙ্কিত রাতের সেইসব দুঃস্বপ্ন এবার

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

সত্যি হতে চলেছে। এই সময় হয়ত আমার পালিয়ে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু একটা কৌতূহল আর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা যাই হোক না কেন আমাকে সাহায্য করল সেই ভয় কে জয় করতে। কোনকিছুর সাহায্য ছাড়াই আমি তরতরিয়ে এগোতে লাগলাম, সেই ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার উৎসের সন্ধানে। কোন অলৌকিক বল যেন আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। কি করে জানিনা প্রথমেই আমি এক ঝটকায় একটা পেল্লায় পাথরের চাঁইকে সরিয়ে ফেললাম। আমার শরীরে তখন অমানুষিক শক্তি ভর করেছে। তারপর একের পর এক পাথরকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে লাগলাম। একটা জিনিস টের পেলাম এই মরুভূমির দেশে থাকলেও পাথরগুলো কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁতে। তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই অলৌকিক বল আমাকে টেনে নিয়ে গেল অতল গহ্বরে। তলিয়ে যাবার সময় আমি আবার সেই বিদ্যুতের ঝলকানি দেখতে পেলাম। যখন হুঁশ ফিরল, দেখি সেই গহ্বরের মধ্যে আমি পড়ে আছি। আমার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেই ধ্বংসস্তূপের নানা নিদর্শন। পাশেই পড়ে আছে আমার ইলেকট্রিক টর্চ। আমি টর্চটা জ্বালালাম। কিন্তু সেই অন্ধকার ঘোচাবার পক্ষে ওই টর্চ নিছক খেলনা ছাড়া কিছুই নয়। এই মরুভূমির অতলে কত যুগ ধরে এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রক্ষিত হয়েছে, কে জানে? খুব সম্ভবত পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকাল থেকেই। আমি ব্যাটারির আয়ু বাঁচাবার জন্য টর্চটা নেভালাম। আমার আগের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট বুঝলাম খুব ভয়ানক অশুভ কিছু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাইহোক আমি হাত ও পা একসাথে কাজে লাগিয়ে এগোতে লাগলাম।

আমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল, সেই দানবীয় আঁকিবুঁকি কাটা বিশাল দেওয়াল আর সীমাহীন অন্ধকার। আমি প্রথমটাই বেছে নিলাম। আমি ঠিক কোন পথে নীচে এলাম সেটা কোনভাবেই আঁচ করতে পারলাম না। অতঃপর এলোমেলো কিছু স্মৃতির ওপর ভরসা করেই এগোতে লাগলাম। আমার শরীর তখন পুরোপুরি অসাড়। তার ওপর ভয়ও কাজ করছিল। এগোতে এগোতে এতক্ষণে একটা ঘরের মেঝে মত পেলাম। মেঝের এদিক ওদিক বিভিন্ন পাথরের টুকরো পড়ে আছে। সাথে ধুলো ও জঞ্জাল। ঘরের অন্যদিকে প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু একটা দেওয়াল উঁচু হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। ওই দেওয়ালেও আঁকিবুঁকি থাকলেও সেগুলো ঠিক কিরকম এতদূর থেকে আমি ঠাহর করতে পারলাম না। কিন্তু যে জিনিসটা দেখে আমি সবথেকে ঘাবড়ে গেলাম সেটা হল এই ঘরের ধনুকের মত বাঁকানো ছাদ। যদিও টর্চের আলোয় সবটা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ওই ছাদের নীচের অংশটা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম এগুলো আমার সেই দুঃস্বপ্নের পাতালপুরীর মতোই! এই অতল গহ্বর থেকে আমি কি করে ফিরবো কোনভাবেই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি এবার আমার বাঁদিকের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই দেওয়ালটা অন্যগুলোর থেকে কিছুটা কম এবড়োখেবড়ো ছিল। অনেক কষ্টে আমি এগোতে লাগলাম। এগোনোর সময় আমি কয়েকটা পাথরের টুকরোকে জঞ্জালের গাদায় ঠেলে দিতেই টের পেলাম এই ঘরের শান বাঁধানো মেঝেও হুবহু আমার আতঙ্ক-পুরীর মতোই।

এবার আমি টর্চটা আবার জ্বেলে ভালভাবে দেখলাম। বেলেপাথরের ওপর কোন জলপ্রবাহের ক্রিয়ায় কিছু কিছু জায়গা আলগা আর নরম হয়ে ভেঙ্গেচুরে গেছে। কিন্তু যেটা দেখে আমি সবথেকে বেশি অবাক হলাম সেটা হচ্ছে পাথরের ওপর আঁকিবুঁকি নকশাগুলো দেখে। এগুলো হচ্ছে সেই নকশা যা বহু যুগের আতঙ্ককে একসাথে আমার অবচেতন মন দেখতে পেয়েছিল। রাতের পর রাত আমি দেখেছিলাম দুঃস্বপ্ন। যে দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এতদূর। এই ধ্বংসস্তূপের প্রত্যেক টুকরোর সাথে আমি পরিচিত, ঠিক আর্কহ্যামে আমার ক্রেন স্ট্রীটের বাড়ির মতোই। কিন্তু স্বপ্নে আমি যা দেখেছি, তার থেকে অনেক অনেক বেশি ভয়াবহ বাস্তবে এই দুঃস্বপ্ন নগরীতে হাজির হওয়া। এই আতঙ্ককে হুবহু ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দুঃস্বপ্নে আমি যেসব জলজ্যান্ত বিভীষিকাদের দেখেছিলাম, যদি তাদের মুখোমুখি হই, তাহলে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করব এবং আদৌ পারব কিনা সেটা ভেবেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হঠাৎ করেই আমি যেন আমার চারপাশে সেইসব বিভীষিকাদের অস্তিত্ব টের পেতে লাগলাম। অন্ধকারের কোথাও যেন তারা ঘাপটি মেরে আমাকে লক্ষ্য করছে। দুঃস্বপ্নের সেইসব দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। এখনও কি সেই লাইব্রেরীতে ঈথরা ঘুরে বেড়ায়? এখনও কি সেই আতঙ্ক-পুরীর বারান্দা আর বন্ধ কুঠুরিগুলোর অস্তিত্ব আছে? যদিও আমার স্বপ্নে দেখা আর ওইসব কিংবদন্তীর অনেককিছুই ভবিষ্যতের ইতিহাসের খোলনলচে পাল্টে দিয়েছিল। অবশ্যই এক ভয়ানক উন্মাদনা আমাকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু যে ভয়াবহতার সামনে এখন আমি দাঁড়িয়ে – তার কাছে সেগুলো কিছুই নয়। এইসময় আমার হঠাৎ করেই মনে পড়ল ঈথদের সেই লাইব্রেরীর কথা। যেখানে আমিও তাদের মত একজন হয়ে গিয়ে ঝড়ের গতিতে লিখে চলতাম পাতার পর পাতা। যদি সত্যিই ওরকম কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে আমি নিমেষেই সেখানে পৌছতে পারব।

আমার মাথার মধ্যে এবার যেন ঝড় বইতে লাগল। সমস্ত স্মৃতি থমকে থমকে ভিড় জমালো মগজে। আমার ইলেকট্রিক টর্চের কমজোরি আলো দেখে যেন ওই অনন্ত অন্ধকার বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল। সত্যি বলতে কি টর্চের ওই আলোয় জায়গাটা আরও ভুতুড়ে লাগছিল। এক-জায়গায় দেখলাম আলসেটা প্রায় পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, তাই ঠিক করলাম ওই দিকেই যাওয়া যাক। আলসে থেকে পাথরের চাঁই পড়ে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

টুকরো টুকরো হয়ে গাদা হয়ে জমে আছে। অনেক কষ্টে সেগুলোর ওপর ওঠা গেল। এই দানবীয় গুহায় আমার আকৃতি ছাড়া সবকিছুই বেশ মিলে যাচ্ছিল আমার দুঃস্বপ্নের সাথে। নিজেকে মনে হচ্ছিল দানবের দেশে গ্যালিভার। যাইহোক টলতে টলতে, লাফ দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে আমি কোনমতে এগিয়ে চললাম আমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে। একবার তো কোনমতে তাল সামলালাম, আর একটু হলে আমার টর্চটাই ভেঙে যাচ্ছিল। তবে আমার এখন আর কোন কিছু মনে হচ্ছিল না, কারণ এই পাতাল গহ্বরের প্রত্যেকটা ইঞ্চি এখন আমার কাছে পরিচিত মনে হল। মনে হচ্ছিল এরা যেন আমাকে বলছে "ক্ষণিকের অতিথি হয়ে কেন এলে আমাদের কাছে? আমরা যে যুগ যুগ ধরে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। এসো আমাদের কাছে এসো।"

এখানকার বেশিরভাগ ঘরগুলোই হয় ভেঙ্গেচুরে গেছে নয়তো আবর্জনায় ভর্তি। কয়েক জায়গায় দেখলাম কিছু ধাতব পাত পড়ে আছে। কয়েকটা অক্ষত থাকলেও অধিকাংশই ভেঙে-চুড়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম এগুলো হচ্ছে আমার দুঃস্বপ্নে দেখা সেই টেবিলের অংশ, যেগুলোর ওপর রেখে আমি পাতার পর পাতা লিখে চলতাম। এবার একটু নীচের দিকে নামলাম। দেখলাম নীচের দিকটা বেশ ঢালু। এগোতে এগোতে এবার থামলাম। দেখলাম ফাটলের জন্য সামনে প্রায় ফুট চারেক ফাঁকের সৃষ্টি করেছে। ওই অন্ধকারের জন্য ফাঁকের ভেতরে কি আছে তা আন্দাজ করা ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। আমি জানতাম এই ইমারতের মাটির নীচে আরও দুটো তলা আছে। আর একদম শেষ তলায় আছে ধাতুর তৈরি সেই সেই চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া দরজা। এদিকে এই ফাটল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আমার পক্ষে এগোনো রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কেন জানি না হয়তো নিজের পাগলামির ভরসাতেই আমি এগোতে থাকলাম বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে। এইভাবে পৌঁছলাম একেবারে শেষের ধাপে। আমার ক্ষীণ স্মৃতি আমাকে বলল এই পথে গেলেই আমি আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই মেশিন ঘরে পৌছতে পারব। কালের প্রকোপে যেগুলো হয়তো আজ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে-কিংবা হয়নি! কোথায় কি ছিল, আমার একদম মুখস্থ। তাই বেশ মনের জোর নিয়েই আমি সেই ধ্বংসস্তূপের গাদা পেরিয়ে এগোতে লাগলাম। আমি জানতাম একসময় এই তেরচা বারান্দা পেরিয়েই আমি পৌঁছতাম সেই দুঃস্বপ্নের লাইব্রেরীতে। তাই আমার আশা ছিল এবারেও সেখানে পৌঁছে যাব।

যত এগোতে লাগলাম আমার মনে হল বহু যুগ ধরে লুকিয়ে রাখা গোপন রহস্য এবার আমার সামনে উন্মোচিত হতে চলেছে। দেওয়াল, বারান্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে আমার দুঃস্বপ্নের সাথে কিছু কিছু মিল খুঁজে পেলাম, কিছু আবার নতুন জিনিষও দেখলাম যেগুলো আগে দেখিনি। আমি জানতাম মাটির নীচের কোন রাস্তা এই আতঙ্ক-পুরীকে মূল রাস্তার সাথে যোগ করেছে। শুধু এই বাড়িই নয় আশেপাশের সেই রাক্ষুসে বাড়িগুলোকেও। তবে এখনও অবধি আমি আমার স্বপ্ন থেকে খুব বেশি কিছু ফারাক খুঁজে পাই নি। খুব আবছা-ভাবে হলেও কিছু কিছু রাস্তা আমার এখনও মনে ছিল। তবুও আমি আরও ভাবতে লাগলাম। মাথায় বেশি জোর দেবার ফলে আমার অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়ল। তবুও আমি মনে করতে পারলাম, মাটির নীচের সেই গোলাকার গম্বুজঅলা ঘর কমকরে দুশো ফুট জুড়ে ছিল। মেঝেটা এতই চকচকে ছিল যে আমি নিজের ছায়াও দেখতে পেতাম। ঈথদের দরকার না থাকায় এখানে কোন সিঁড়িও ছিল না। স্বপ্নের সেই দানবীয় মিনারগুলো ঈথরা কড়া পাহারায় রক্ষণাবেক্ষণ করত, কিন্তু এখন তো আর সেখানে কোন পাহারা নেই! ভেবেই আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

এবার সেই বারান্দায় এক-জায়গায় গিয়ে থামতে বাধ্য হলাম। এখানে পাথরের স্তূপ প্রায় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। আর দেখলাম একটা বিশাল বড় গহ্বর, যেটা দেখে বুঝলাম আমার ইলেকট্রিক টর্চ এখন দেওয়াল বা গহ্বর কোন কিছু দেখার জন্যই আর কাজে আসবে না। আমার কেন জানি না মনে হল এটা মাটির নীচের সেই চোরা কুঠুরির কোন ধাতু দিয়ে তৈরি সীমারেখা। আমি বুঝতে পারলাম ঈথদের সেই তথ্যভাণ্ডারের খুব কাছাকাছি এসে গেছি। কিন্তু তিন নম্বর ধাপে উঠে যা দেখলাম সেটা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। মনে হল এতক্ষণ যা করলাম সব পণ্ডশ্রম! এত কাঠ খড় পুড়িয়ে আবার আমি এসে হাজির হয়েছি নতুন এক প্রকাণ্ড বারান্দায়। এখানে ভাঙাচোরা পাথরের টুকরো প্রায় ছাদ ছুঁয়ে ফেলেছে। এরপর পুরোপুরি হয়তো আমার পাগলামির ওপর ভর করেই হ্যাঁচকা দিয়ে ওই পাথরের স্তূপগুলোকে সরাবার জন্য উদ্যোগী হলাম। স্বপ্ন নাকি সত্যি নাকি দুঃস্বপ্ন জানি না, কিন্তু অনেক কসরত করে এক-ফালি এগোবার রাস্তা বানাতে সক্ষম হলাম। আমার ইলেকট্রিক টর্চ ক্রমাগত জ্বালাতে ও নেভাতে(অবশ্যই ব্যাটারি বাঁচাবার জন্য) লাগলাম পাথর সরাবার কাজে। একবুক তেষ্টা নিয়ে কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করলাম তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে হয়তো আরও একটি অধ্যায় লিখে ফেলতে হবে।

বারেবারে পিছলে যেতে যেতেও দাঁতে দাঁত চেপে আঁকড়ে ধরেছিলাম পাথরের চাঁইগুলোকে। যুদ্ধশেষে একটা মোটামুটি দাঁড়াবার জায়গা পেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম। এবং অবশেষে টের পেলাম আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু সেই লাইব্রেরীর খুব কাছাকাছি এসে গেছি। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি এসে পৌঁছেছি চারদিক বন্ধ খিলানওলা একটা নিচু গোলাকার সমাধি-গৃহে। এই সমাধি-গৃহের

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

অবস্থা কিন্তু অতটা তথৈবচ নয়। বরং দেখলে মনে হবে দীর্ঘদিন ধরে এর রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছে। এর দেওয়ালগুলো আমার টর্চের নাগালের মধ্যেই ছিল। তাই টর্চের আলোয় ভাল করে দেখলাম। এবং দেখে চমকে উঠলাম! আরে! এগুলোতে তো হায়ারোগ্লিফিক লেখা ও আঁকিবুঁকিতে ভর্তি! কিছু কিছু আঁকিবুঁকি তো হুবহু আমার স্বপ্নের মত। বুঝলাম আমার নিয়তি আজ আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই আলোআঁধারির দেশে। আমার বাঁদিকের একটা ধনুক আকারের খিলানওলা পথ গেছে দেখলাম, তাই সেদিকেই পা বাড়ালাম। এই পথে এগোতে এগোতে দেখলাম ওপরে আর নীচে যে অংশগুলো এখনও টিকে আছে, এখান থেকে নাগাল পাওয়া যেতে পারে। একটা জিনিস ভেবে অবাক হয়ে গেলাম সমস্ত পৃথিবী থেকে সুরক্ষিত, সৌরজগতের যুগান্তরের নিখুঁত বর্ণনা-সমৃদ্ধ এই তথ্যভাণ্ডার নির্মাণে কি অমানবিক দক্ষতা প্রয়োগ হয়েছে। এই গোটা স্থাপত্যটা নিজেই যেন এক স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম! নিখুঁত গাণিতিক পদ্ধতিতে সিমেন্টের সাহায্যে এই বিরাট পাথরগুলোকে বিস্ময়কর ভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই স্থাপত্য। পৃথিবীর কেন্দ্র-মণ্ডলের মতোই মজবুত এর ভর। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম। একটা জিনিস খেয়াল করলাম এই নতুন রাস্তা বানিয়ে নেওয়ার পর তুলনামূলক ভাবে হাঁটতে আমার সুবিধে হচ্ছে বরং একরকম দৌড়েই এগোতে লাগলাম। এই ব্যাপারটা আমাকে একটু হলেও অবাক করল আর ভাবিয়ে তুলল। এযাবৎ ওই দুঃস্বপ্নে আমি যা যা দেখেছিলাম তার সাথে আমি আমার গতিপথের অস্বাভাবিক মিল দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার দুদিকে হায়ারোগ্লিফিক নকশা আঁকা ধাতুর দরজা থাকে থাকে তাদের স্বকীয় মহিমায় বিরাজমান। কালচক্রে এই স্থাপত্যের অনেককিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও এগুলোতে তেমন ভাবে সময় তার থাবা বসাতে পারে নি। ওই দরজার থাকের সারির মাঝে মাঝে ধুলোর পাহাড় তৈরি হয়েছে। বুঝতে পারলাম ভূমিকম্পের ফলে এই ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মাঝে আবার বিভিন্ন লেখাওলা গম্বুজ রয়েছে, যেগুলো দেখে বোঝা যায় কোন তাকে কি কি খণ্ড রয়েছে তার বিবরণ রয়েছে ওতে। হঠাৎ দেখি সমাধি ঘরের মত দেখতে একটা ঘরের দরজা খোলা! আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখি এখানে কয়েকটা ধাতব তাক-ওয়ালা আলমারি দিব্যি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, এবং এগুলোতে একটুও ধুলো জমে নি। আমারও এবার গোয়েন্দাগিরির শখ চাগিয়ে উঠল। কসরত করে ওই পেল্লায় আলমারি বেয়ে উঠতে লাগলাম। ওপরের তাকে কয়েকটা রোগা পাতলা নমুনা দেখতে পেলাম। ঠিক করলাম ওগুলো মাটিতে নামিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ওগুলোতে ঠিক কি লেখা আছে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মাটিতে নামালাম কয়েকটা পাতলা নমুনা।

এবার উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। ধাতব মলাট ওয়ালা বইগুলো লম্বায় ছিল কুড়ি ইঞ্চি আর চওড়ায় পনেরো ইঞ্চি। আর বইগুলোর ঘনত্ব ছিল ইঞ্চি দুয়েক। এগুলোর পাতায় পাতায় হায়ারোগ্লিফিক লেখায় ভর্তি! এগুলোর কিছু কিছু আমার দুঃস্বপ্নে দেখা হায়ারোগ্লিফিকের মত। এবার আমি আর একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। এবার আমার মাথায় বিদ্যুতের ঝলকানি দিয়ে উঠল। এগুলোর লেখার পদ্ধতি আমার খুব ভালভাবে পরিচিত। যখন আমি গবেষণা চালাতাম এই ধরনের লেখা আমি অনেক দেখেছি! ডি এরলেটসের কাল্টস ডি গাউলস, লুডউইগ প্রিনের ডি ভারমিন মিস্ট্রিজ, ভন জানৎসের আনঅসপ্রেলিচেন কাল্টেন , আব্দুল আলহাজারদের "নেক্রোনোমিকন" আর সেগুলোর সূত্র ধরে যে যে জিনিস নিয়ে আমি গবেষণা চালিয়েছিলাম, সেটা থেকে এই বইয়ের হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, তাতে এর বিষয়বস্তু পুরোপুরি না বুঝলেও এর সম্ভাব্য সারমর্ম কিছুটা হলেও আন্দাজ করলাম। সেলুলোজ দিয়ে তৈরি পাতায় অদ্ভুত রঙিন কালি দিয়ে হায়ারোগ্লিফিকে অনেককিছু লেখা। কত কালচক্রের ইতিহাস যে লেখা রয়েছে আন্দাজ করতে পারলাম। এই হায়ারোগ্লিফিক কোন পরিচিত পার্থিব হায়ারোগ্লিফিক নয়, এ হল সম্পূর্ণ অশুভ অপার্থিব কোন লিপিমালা। আমার শরীরে আশ্রয় নিয়েছিল যে দুর মেঘলোক থেকে আসা কোন প্রাণীর চিন্তন, এ হল তার ভাষায় লেখা বিবরণ! কোন অজানা গ্রহের সৃষ্টির সময়ের বিবরণ হয়তো বন্দী আছে এখানে, তারপর সেটা জায়গা পেয়েছিল ঈথদের সংগ্রহশালায়। তবে আমি নিশ্চিত এ আমাদের পরিচিত সৌরজগতের কোন গ্রহ নয়। এদিকে পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমার খেয়াল ছিল না যে আমার টর্চের ব্যাটারির হাল খারাপ। যখন দেখলাম ব্যাটারির দৌলতে টর্চ দপদপ করতে শুরু করেছে, চটজলদি ব্যাটারি পাল্টে নিলাম। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যাটারি সবসময়ই থাকে, তাই কোন অসুবিধে হল না। আমার দুঃস্বপ্নের জন্য আমি এই গোলকধাঁধা আর অলিগলির অনেকটাই চিনতে পেরেছিলাম, তাই জানতাম বলেই সঙ্গে অতিরিক্ত সরঞ্জাম রেখেছিলাম। এদিকে আমার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে নিজেরই কেমন একটা অদ্ভুত লাগছিল। কতকাল এই পাণ্ডববর্জিত ধ্বংসাবশেষে কোন জীবিত প্রাণীর পায়ের শব্দ শোনা যায়নি কে জানে? বহুযুগ ধরে জমে থাকা ধুলোর পরতের ওপর নিজের পায়ের ছাপ দেখে নিজেরই বুকটা কেঁপে উঠল। আমার অবচেতন মন ক্রমাগত জানান দিচ্ছিল কোন অশুভ শক্তি হয়তো কোথাও ওত পেতে রয়েছে। এবার আমি আর একটু গভীরে যাবার জন্য নীচের দিকে দৌড় লাগালাম। আমার সামনে শুধু টর্চের আলো। দৌড়নোর সময় টর্চের আলোয় অনেক অদ্ভুত জিনিসের নিদর্শন দেখতে পেলেও, একবারের জন্যও থামলাম না। দৌড়ের গতির সাথে কেন জানি না, হয়তো আমার অবচেতন মনের নির্দেশেই বারেবারে ডানহাত ঝাঁকাতে লাগলাম! যেন আমি আধুনিক প্রযুক্তির কোন বিশেষ কম্বিনেশনের তালা খুলতে চাইছিলাম। স্বপ্নে দেখেছিলাম নাকি সত্যি জানি না, কিন্তু ওই তালাটার ব্যাপারে যেন আমার অবচেতন মন যেন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

একশো ভাগ নিশ্চিত ছিল। স্বপ্ন না হলেও হয়তো সেই দুঃস্বপ্ন-ভ্রমণের সময় কোন প্রাচীন অপার্থিব শক্তি নিখুঁতভাবে আমাকে ওই তালার গঠনপ্রণালী শিখিয়েছিল। এইসব ধ্বংসাবশেষের সাথে দুঃস্বপ্নের ক্রমাগত মিল খুঁজে পেয়ে আমার মন বারেবারে শিউড়ে উঠেছিল। এই গোটা ধ্বংসাবশেষ যেন কোন অলীক অপার্থিব আতঙ্কের ভগ্নাংশ মাত্র।

ইতিমধ্যে আমি সব থেকে নীচের ধাপে চলে এসেছিলাম। কিন্তু কথায় বলে না, "যেখানে বাঘের ভয়-"! ওই অন্ধকারের নাগপাশের জন্যই হয়তো আমার দৌড়ের গতি কিছুটা কমে গিয়েছিল। আর যে জায়গায় এসে গতিটা কমল, আমার বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। কারণ আমার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম এই জায়গাটা পার করা সবথেকে কঠিন। কারণ এখানেই রয়েছে সবথেকে নিরাপত্তা-যুক্ত ধাতুর গরাদওলা দরজা। এবং এই দরজা অনধিকার প্রবেশকারীদের জন্য একটা ফাঁদও বটে। এই দরজার পাহারায় থাকতো অনেক রক্ষী। যদিও এখন কোন রক্ষী সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তাহলেও ভয়ে আমার হাত পা কেঁপে উঠল। কারণ কোনক্রমে এই ব্যাসাল্টের গুহা পার করলেও ঠিক একই রকম আরেকটা দরজার ফাঁদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা কনকনে, ভ্যাপসা হাওয়া আমাকে ওই দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমার ইচ্ছে না থাকলেও ওই হাওয়ার প্রকোপে আমি ওইদিকে যেতে বাধ্য হলাম। যখন ওই হাওয়ার দমক থামল, আমি দেখলাম ওই ধাতুর গরাদওলা হাঁ করে খোলা! কি করে ওটা খুলে গেল আমার মাথায় এলো না। ওই দমকা হাওয়ার জন্যই হবে হয়তো। যাইহোক আমি আর একটু এগোলাম। সামনে আবার সেই সারি সারি ধাতুর তাকওলা আলমারি। এবার মেঝের দিকে তাকালাম। এক-জায়গায় ধুলোর পাহাড় জমেছে, এবং গোটাকতক আলমারি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ঠিক এই সময়েই এক অজানা আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠল। কারণ যে আলমারিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সেগুলো আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। সেই বিগ ব্যাং এর সময় থেকে পৃথিবী সৃষ্টির সমস্ত রহস্য লিপিবদ্ধ হয়ে জায়গা নিয়েছিল ওই তাকে। আর অগুনতি বছর ধরে যখন মাঝে মাঝে কিছু বিরতিতে পৃথিবীর বিবর্তন ঘটেছে, এই আলোহীন গোলকধাঁধাও বিধ্বস্ত হয়েছে বারেবারে। আর সেইজন্যই এইসব দানবীয় আলমারি যখন নিজেদের জায়গা ছেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠেছে এই পাতালপুরী।

যখন আর একটু কাছে এগোলাম বুঝতে পারলাম ঠিক কি কারণে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। না, ওই ধুলোর পাহাড় নয়। বরং ওই ধুলোর গাদার মধ্যে বিশেষ কিছু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমি এবার টর্চের আলোয় ভালভাবে জায়গাটা দেখলাম। এখানে ঠিক যতটা ধুলো জমে থাকার কথা, ততটা নেই। ঠিক যেন মাস-খানেক আগে এখান থেকে কিছু সরানো হয়েছে, কারণ বাকি জায়গার ধুলোর আস্তরণ এর তুলনায় যথেষ্ট পুরু। আরও ভালভাবে টর্চের আলো ফেলে যা দেখলাম সেটা আমার কাছে খুব একটা আনন্দদায়ক ছিল না। কারণ ধুলোর ওপর যে তিনটে ছাপ পড়েছিল, সেগুলো ছিল আমার খুব পরিচিত। মিসকাটোনিক ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেওয়ার সময় আমার চোখের সামনে যে বিদঘুটে অপরিচিত জ্যামিতিক আকার ভেসে উঠেছিল, এগুলো ছিল তারই একটা। ঠিক ওই সময়ই আমার ক্লাসরুমের আকারও গিয়েছিল পাল্টে। ধুলোর ওপর এই ছাপগুলো ছিল কোন কিছুর বর্গাকার চারটে পায়ার। আর ছাপগুলো ছিল প্রায় গোলাকার আর পাঁচ ইঞ্চি মত পুরু। চারটে পায়ার একটা বাকি তিনটের তুলনায় দেখলাম একটু বড়। ঠিক যেন এগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়েও কোন কারণে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু কি কারণ? হয়তো যে কারণে এই দানবীয় ধাতব তাক-ওয়ালা আলমারি মুখ থুবড়ে পড়েছে বা ঠাণ্ডা, ভ্যাপসা হাওয়ার প্রকোপে ধাতুর গরাদওলা এই দরজা খুলে গেছে এক নিমেষেই!

হঠাৎ আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হল, ঠিক কি রকম ভাষায় ব্যাখ্যা হয়তো করতে পারব না, কিন্তু একথা ঠিক যে এখন আমার আর আগের মত ভয় করছিল না। আর ওই পায়ার ছাপগুলো দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার স্বপ্নের কিছু প্রভাব এখনও আমার অবচেতন মনে রয়ে গেছে। এদিকে আমার ডানহাত তখনও সেই বিশেষ কম্বিনেশন তালা খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমি ওই উল্টে পড়া আলমারি আর ধুলোর গাদা পেরিয়ে নিজের অজান্তেই ছুট লাগালাম একটা বিশেষ দিকে, যেন এই রাস্তা আমার কতদিনের পরিচিত! আমার নিজের এই আচরণের কোন ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম না। শুধু আমার শরীরের কার্যকলাপের সাথে তাল মেলাতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম কোন প্রাণীর চিন্তন এখন আমার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করছে? কোন মানুষ কি আদৌ সেই বিশেষ প্রযুক্তির তালার নাগাল পেতে পারে? যে প্রাণীর চিন্তন এখন আমার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেকি আদৌ এর কম্বিনেশন জানে? আর জানলেও এতযুগ বাদে সেই তালা কি আদৌ টিকে আছে? মনের মধ্যে প্রশ্নের ঝড় বইতে লাগল। ওই তালাবন্ধ কুঠুরির ওপারে এমন কি রয়েছে যার মুখোমুখি হবার আগে আমার মন এভাবে ভয়ে কেঁপে উঠছে? আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু এইটুকু মনে ছিল যে আমার দৌড় সাময়িক ভাবে থামিয়ে আমি হাঁ করে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

তাকিয়েছিলাম একসারি হায়ারোগ্লিফিক লিপি আঁকা বিরাট দরজাওলা আলমারির দিকে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য একটু অন্যরকম ছিল। এগুলো দেখলে মনে হচ্ছিল এগুলোর কিন্তু যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটের দরজা আবার হাট করে খোলা। এগুলো দেখে আমার ঠিক কি মনে হচ্ছিল ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না, শুধু এটুকু বলতে পারি এগুলো দেখে মনে হচ্ছিল এরা বহুযুগ ধরে আমার পরিচিত। আমি তাকগুলোকে একবার মেপে নিলাম। নাঃ, সহজে এগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে না। কোন ফন্দি আঁটতে হবে। খানিকক্ষণ ভেবে একটা উপায় বের করলাম। একটা আলমারির নীচের দিকের খোলা দরজা আর অন্যান্য বন্ধ দরজাগুলোর সাহায্য নিলে হাত পা এর সাহায্যে বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠা যাবে। সেইভাবেই কোনরকম শব্দ না করে টর্চটাকে কামড়ে ধরে উঠতে লাগলাম। আমার ডান হাত যেভাবে কাজ করছিল, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওই কম্বিনেশন তালা আমি খুলতে পারব। এখন তালাটা কাজ করলে হয়! এদিকে বন্ধ দরজাগুলোর খাঁজে পা লাগিয়ে আমার উঠতে তেমন কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ তাক বেয়ে উঠতে উঠতে ডানদিকে চোখ গেল আর আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই তালাটাকে দেখতে পেলাম।

ওপরে চড়তে চড়তে আমার আঙ্গুলগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেই না আমি তালাটাকে দেখতে পেলাম, ওমনি আমার আঙ্গুলে সাড় ফিরে এলো। কিন্তু চমকের তখনও শেষ হয় নি। আমাকে হতভম্ব করে ওই ধাতব দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল!! যেন আমার আসার জন্যই অপেক্ষায় ছিল।এগিয়ে গেলাম ওই দিকে। আমার ডান হাতের কাছেই একটা হায়ারোগ্লিফিক নকশাওলা বইয়ের তাকে একটা বাক্স ছিল। সেটা দেখে আমার ডানহাত এমনভাবে কাঁপতে শুরু করল যে যন্ত্রণায় প্রায় কুঁকড়ে গেলাম। শুধু মনের জোরে আমি ওই ব্যথাটা ভুলে ছিলাম, নয়তো আর একটু হলেই হাতটা ফসকে যেত আর কি! বাকি তাকগুলোর থেকে এটা একটু বেশিই বড় ছিল আর এর বেধ ছিল ইঞ্চি তিনেক। আর এই বাক্সটাতে ছিল অনেকরকম গাণিতিক নকশা। আমি অনেক কসরত করে বাক্সটার নাগাল পেলাম। তারপর কোটের কলারের সাথে আটকে সেটাকে নিয়ে নিলাম পিঠে। আর চিন্তা নেই, এখন আমার হাত খালি। এবার আমি তরতরিয়ে নীচে নামতে লাগলাম। আমার মনে তখন তীব্র কৌতূহল, আমার এত যন্ত্রণা সহ্য করার পর পুরস্কার হিসেবে যে বাক্সটা পেলাম, কি আছে তার ভেতরে। নীচে নেমে ধুলোর ওপরেই হাঁটু গেড়ে বসলাম। তারপর পিঠ থেকে বাক্সটাকে নিয়ে এলাম সামনে। আমার হাত রীতিমতো কাঁপছিল। বাক্সটা খুলে আমি একটা বই বের করলাম। যেন আমার ভেতর থেকে অন্য কারোর অদম্য ইচ্ছাশক্তি বইটাকে বের করে আনল। এই বইটার মলাটেও আমার পরিচিত হায়ারোগ্লিফিক নকশা আছে। এবার যেন আমি একটু হলেও আমি বুঝতে পারলাম ঠিক কি জিনিস খোঁজার জন্য এতদিন আমি অপেক্ষা করেছি আর এতদূর ছুটে এসেছি। যদি আমি সত্যিই স্বপ্ন না দেখে থাকি, আর যেটা ভাবছি সেটা হয়, তাহলে সমগ্র মানবসভ্যতা যে ভয়াবহতার মুখোমুখি হতে চলেছে, তা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। সবথেকে ভয়ানক ব্যাপার হল যে আমি চেষ্টা করেও এই ঘটনাগুলোকে স্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। এমনকি এটা লিখতে লিখতেই যতবার ঘটনাগুলো মনে পড়ছে, আমার হাত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

যাই হোক ঘটনায় ফিরে আসি। বইটার হায়ারোগ্লিফিক নকশাওলা ধাতব মলাটের দিকে তাকিয়ে আমি চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। সত্যি বলতে কি বইটার মলাট উলটে ভেতরে কি আছে সেটা দেখার জন্য আমার সাহসে কুলোচ্ছিল না। আমার সেই দুঃস্বপ্নে ড্রোনিং মেশিনের সাহায্যে এটার সারমর্মের অনুবাদ করেছিলাম কিনা সেটাও মনে পড়ছিল না। যা হবে দেখা যাবে ভেবে কপাল ঠুকে আমি মলাট উল্টোলাম। ব্যাটারি বাঁচাবার জন্য মুখ থেকে টর্চটা বের করে বন্ধ করলাম। অন্ধকারে বসে বসে খানিকক্ষণ সাহস সঞ্চয় করলাম। তারপর অবশেষে টর্চ জ্বালিয়ে সেই আলোয় তাকালাম খোলা পাতার দিকে।

যা ভেবেছিলাম তাইই। পাতায় যা লেখা ছিল সেটা দেখে আমার দাঁতে কাঁপুনি লেগে গেল। হয় আমি স্বপ্ন দেখছি, নয়তো সময় আর স্থান নিয়ে যা যা থিয়োরি আছে সব ভাঁওতা। আমি ঠিক করলাম যে করেই হোক এই বইটা নিয়ে গিয়ে আমার ছেলে উইনগেটকে এটা দেখাতে হবে। যদিও আশেপাশের অন্ধকারে আমি অন্য কিছুর অস্তিত্ব টের পাইনি, কিন্তু অতীতের সেই ভয়াবহ স্মৃতির ঝলক আমার চারদিকে ভিড় জমাতে লাগল। আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিল। আমি বইটা বন্ধ করে আবার কোটের কলারের সাথে আটকে পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। সত্যিই যে এই পাতালপুরীর অস্তিত্ব আছে তা সবার জানা দরকার। অবশ্য বাইরের জগতের এমনকি আমারও আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু নীচে নামার সময় আমার যে ভয়টা করে নি, সেটা এবার হতে লাগল। মনের জোরে তো এই অবধি আমি নেমে এসেছি। কিন্তু ওই পরিমাণ প্রতিকূলতা কাটিয়ে আবার ফিরে যাবই বা কি করে? আর একটা ভয় হল ঈথরাও ভয় পেয়েছিল যাদের, তারা হয়তো এখনও এই পাতালপুরীর অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। মনের মধ্যে আরও নানারকম ভয় ঘুরতে লাগল। স্থানীয় আদিবাসীদের ঝোড়ো

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হাওয়ার গল্প, ধ্বংসাবশেষ, শিষের মত শব্দ, ধুলোর ওপর পায়ার ছাপ, দুঃস্বপ্নে ভেসে আসা জ্যামিতিক আকার- সব মিলেমিশে একেবারে সাড়ে বত্রিশ ভাজা হয়ে গেল।

ঠিক কি ধরণের অজানা আতঙ্ক আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তা যদিও আমার ধারনার বাইরে ছিল। কিন্তু তার কিছু কিছু নমুনা আমি আগে দেখেছিলাম। একটা দেখেছিলাম এখানে ঢোকার আগে একটা খাঁজকাটা দেওয়ালের গায়ে আঁকা একটা চিহ্নে। আর একটা দেখেছিলাম প্রথম যে বইটা নামিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম, তার আগে ধনুকের মত খিলানওলা আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে গোলাকার গম্বুজওলা হলে। ডানদিকের খিলানটার দিকে তাকালাম। নাঃ এবার ফিরতে হবে। এটা বেয়ে নেমে এখানে এসে পৌঁছলেও ফিরতে আমার যে কি অবস্থা হবে, ভেবেই আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। পিঠে এই ধাতব মলাটওলা বইয়ের ভার নিয়ে এই ধ্বংসস্তূপ পেরনো যে খুব সহজ হবে না তা বলাই বাহুল্য! এবং হলও ঠিক তাই। এই ধ্বংসস্তূপের এক একটা টুকরো আমার কাছে হয়ে দাঁড়াল পাহাড়প্রমান বাধা। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে করে আমার এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, যে নির্দিষ্ট গন্তব্যে না পৌঁছনো অবধি আমি হাল ছাড়তাম না। এক্ষেত্রেও তাইই হল। আমি দেখলাম অবশেষে আমি এসে পৌঁছেছি সেই পাহাড়ের মত ধ্বংসস্তূপের ঢিপির সামনে, যেটা পেরিয়ে আমি প্রথম একটু যাওয়ার রাস্তা বানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার মনে একটা ভয় কাজ করছিল। প্রথমবার এখানে ঢোকার সময় কিঞ্চিত শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা যেন আর না হয়। কারণ ধুলোর ওপর ওইসব ছাপ দেখে আর এই পাতালপুরীর ভেতর হাড় হিম করে দেওয়া নানারকম শব্দ শুনে আমার আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি আগের মত ছিল না। আর ওই বাক্সবন্দী বইটা পিঠের ওপর হয়ে দাঁড়িয়েছিল গোদের ওপর বিষফোঁড়া। কিন্তু আমি ওসব তোয়াক্কা না করে এগোতে লাগলাম বেয়ে বেয়ে। টর্চটা কামড়ে ধরলাম মুখে আর বইয়ের বাক্সটাকে ওঠার পথে পথে যা যা ফাঁকফোকর পাচ্ছিলাম, সাময়িক বোঝা লাঘব করার জন্য ঠেলে ঠেলে দিচ্ছিলাম। কিন্তু ওই সাময়িকই! তার পরের মুহূর্তেই পিঠের বোঝার জন্য বেয়ে উঠতে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে এই কসরত করতে করতেই ঘটল আসল বিপত্তি! যেইনা পরের ধাপে একটা পাথরের ফাঁকে বইয়ের বাক্সটাকে চালান করতে যাব, আমার হাত ফসকে বাক্সটা ঢাল বেয়ে গিয়ে পড়ল ধ্বংসস্তূপের গাদায়। আর শুধু যে পড়ল তাই নয়, পড়ে এমন একটা শব্দের সৃষ্টি করল যে তার প্রতিধ্বনিতে এই পাণ্ডববর্জিত পাতালপুরীর প্রত্যেকটা দেওয়াল যেন কেঁপে উঠল! আর আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বেয়ে গেল। আমি ঠিক যে জিনিসটা মনেপ্রাণে চাইনি, সেটাই হল। আর এই সময়ই বহু দুর থেকে যেন একটা খনখনে, তীব্র শিসের মত শব্দ ভেসে এলো আমার কানে। শব্দটা যে ঠিক কি রকম ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কোন পার্থিব শব্দের সাথে এর কোন মিল নেই, তাই কোনকিছুর সাথে তুলনা দিয়ে এটা বোঝাতে পারব না। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বোঝাতে লাগলাম, ওই শব্দ সম্পূর্ণ আমার কল্পনা। কিন্তু আমার সচেতন আর অবচেতন মন এর বিরোধিতা করতে লাগল। যদিও আমার আতঙ্কের শেষ এতেই ঘটে নি, কারণ এরপর যেটা ঘটল, সেটা এতটাই ভয়ানক ছিল যে ভাবলেও এখন আমি শিউড়ে উঠছি। আমি বইয়ের বাক্সটাকে হস্তগত করার জন্য দৃঢ়ভাবে টর্চটা ধরে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলাম। আমি তো তখন বাইরের দুনিয়ায় চাঁদের আলো আর মরুভূমিতে পৌঁছোবার আনন্দে মশগুল! তাই আমার ধারণা ছিলনা বইটাকে হস্তগত করার পরও এই পৈশাচিক ঘটনাক্রমে কোন ইতি ঘটবে না। জিনিসটা ঘটল ওই ধ্বংসস্তূপের পাহাড়ের ঢিপির ওপর ওঠার পর। হঠাৎ করেই আমার পা গেল পিছলে, আর আমি শুধু দেখলাম কিছু গাঁথনি আর পাথরের টুকরোর ধ্বসের সাথে আমিও গড়িয়ে পড়ছি। আর সেই ধ্বসের কি আওয়াজ! মনে হবে একশোটা কামান যেন একসাথে দাগা হয়েছে। এই বিপর্যয়ের ঠিক পরেই কি ঘটেছিল, আমার মনে ছিল না। যখন আমার হুঁশ এলো দেখলাম চাতালের ওপর পড়ে আছি। আমার পাশেই পড়ে রয়েছে আমার টর্চটা আর সেই বইয়ের বাক্সটা। শুধু এইটুকু মনে করতে পারলাম, ওই সশব্দ ধ্বসের সাথে প্রবল গতিতে আমিও নিমজ্জিত হতে চলেছি কোথাও। আর ওই ধ্বসের শব্দে আমার চিৎকারও ঢেকে গিয়েছিল। এদিকে ওই ধ্বসের বিকট শব্দের প্রতিধ্বনি তখনও যেন ফিরে ফিরে আসছে পাতালপুরীর দেওয়াল থেকে। আর ঠিক সময়ই আবার সেই অপার্থিব খনখনে শিসের মত শব্দটা ভেসে এলো খুব স্পষ্টভাবে। নাঃ এবার আর কোন ভুল হবার কথা নয়। কারণ এবার শব্দটা আর আমার পিছনদিক থেকে নয়, আসছে সামনের দিক থেকে! সামনের সেই খোলা দরজার ওপারে থাকা সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে থেকে। আর শুধু শব্দই নয়, তার সাথে বইছে এক ভয়ঙ্কর দমকা হাওয়া। আর হাওয়াটা কোন ঠাণ্ডা,সোঁদা বা ভ্যাপসা হাওয়া নয়। যেন ওই নরকের অন্ধকারের মধ্যে থেকে কোন অশুভ উদ্দেশ্য নিয়েই এর আগমন। আর এই হাওয়াটা আমাকে কেন্দ্র করেই যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বইতে লাগল। আর প্রত্যেক মুহূর্তে এই হাওয়ার দমক বেড়ে চলল। সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল সেই খনখনে শিসের শব্দ। হাওয়ার ধরনটা দেখে মনে হল যেন এটা কোন ফাঁস বা কাউবয়দের ল্যাসোর মত আমাকে বেঁধে ফেলতে চাইছে। এবং এই হাওয়ার দমকের সামনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলনা। শুধু খেয়াল ছিল একটা ভয়ানক

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

চক্রাবর্তের সাথে আমিও ঘুরছি।

কতক্ষণ ঘুরেছিলাম খেয়াল নেই, কারণ এরপরেই আমি টর্চ আর বইয়ের বাক্স সহযোগে নিজেকে আবিষ্কার করলাম কমকরে দু ধাপ নীচের একটা চাতালের ওপর পড়ে আছি, যেখানে ওই গুপ্ত দরজাগুলো হাঁ করে রয়েছে। আমার রীতিমতো কান্না পেল। কিন্তু দেখলাম কান্নার বদলে আমি বিড়বিড় করছি নিজের মনে- হয়তো এটা গোটাটাই একটা স্বপ্ন, হয়তো আমার ঘুম ভাঙবে আর্কহ্যামের পাগলা গারদে কিংবা মরুভূমিতে আমাদের ক্যাম্পে। যদিও আমি জানতাম ওই ফুট চারেক ফাঁকটা আরেকবার পেরোতে হবে। কিন্তু হয়তো এবার আমার জন্য নতুন কোন অজানা আতঙ্ক অপেক্ষা করছে। আমি ভেবে দেখলাম লাফ দিয়ে দিয়ে আমি এগিয়ে যেতে পারব, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সঙ্গী সেই অপার্থিব খনখনে শিস-ওয়ালা বিভীষিকা। এদিকে আমার টর্চের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আমার স্মৃতিশক্তির ওপর ভর করেই এগোতে হবে। আর ভেবে দেখলাম এগিয়ে যেতে গেলে আমাকে এই ভয় কাটাতেই হবে। আর তার জন্য আমাকে এই নারকীয় আতঙ্কের মুখোমুখি হতে হবে। এইসব বাধাবিপত্তির কথা ভাবলে যেটুকু সাহস সঞ্চয় করেছি সেটুকুও গায়েব হয়ে যাবে। তাই আমি আবার এগোতে লাগলাম। আর ওই ফাটলের কিনারা দেখতে পেলাম। সাহসে ভর করে যেই না এগোতে যাব, ওই ঝোড়ো দমকা হাওয়া, নারকীয় অন্ধকার, অপার্থিব শব্দ সবকিছুর মিলিত একটা ঘূর্ণি আমাকে গ্রাস করল। শুধু ক্ষীণ স্মৃতি হিসেবে মনে আছে আমি ওই নারকীয় চক্রাবর্তে হারিয়ে যাচ্ছি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও ওই চক্রাবর্তের মিলিত শব্দের সামনে তা হারিয়ে গেল অচিরেই।

ব্যাস, এই ছিল আমার অভিজ্ঞতা। মানে আমার যতটুকু মনে ছিল আমি লিপিবদ্ধ করলাম। এর বেশি কিছু বলতে গেলে হয়তো আমাকে আশ্রয় নিতে হবে আমার উন্মাদনা কিংবা অলৌকিক তত্ত্বের। স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন,স্মৃতি, পাগলামি সবকিছুর মিলিত যোগফলে হয়তো জন্ম হয়েছিল কোন অপার্থিব বিভ্রমের যার সাথে এই পার্থিব জগতের কোনকিছুরই মিল নেই। এর বেশি আর কিই বা বলতে পারি? যুগ যুগ ধরে এই মহাজাগতিক বিবর্তন, বিভিন্ন গুপ্তবিদ্যা সংক্রান্ত বই নিয়ে পড়াশোনা, রাতের পর রাত দুঃস্বপ্নের মোকাবিলার যোগফলই ঘটেছিল হয়তো বা। তবে এরপরেও কিন্তু ওই ভয়ানক শহর আমার স্বপ্নে হানা দিয়েছিল। আমিও তখন ঈথদের একজন হয়ে গিয়ে শঙ্কু-আকৃতির দেহ নিয়ে চলাফেরা করতাম। শুঁড়ের সাহায্যে তাক থেকে বই নামিয়ে নিতাম আবার রেখেও দিতাম। তারপর এই পাতালপুরীর ভয়ানক স্মৃতি(সে সত্যি মিথ্যে যাই হোক না কেন) আর সবশেষে নারকীয় চক্রাবর্তে হারিয়ে যাওয়া সব মিলিয়ে কোনটা কোনটা সত্যিই ঘটেছিল আর কোনটা নিছকই আমার কল্পনা তা এই মুহূর্তে হয়তো আমার পক্ষে বলা মুশকিল। কারণ এই সবকিছুই ঘটেছিল উল্টো-ক্রমে। নিজেকে ঈথরুপে দেখা, চক্রাবর্তে হারিয়ে যাওয়া, দমকা হাওয়া আর খনখনে শিসের শব্দ, ধ্বংসস্তূপ বেয়ে ওঠা, বইয়ের বাক্সটা খুঁজে পাওয়া, হায়ারোগ্লিফিক নকশাওলা বইয়ের তাক, আঁকাবাঁকা খিলানওলা পথ, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে মাথা ফুঁড়ে ওঠা নকশাওলা পাথরের চাঁই, চাঁদনী রাত- সবকিছু।

এই দৃশ্যায়নের উল্টো ক্রমপর্যায় যখন শেষ হল দেখলাম অস্ট্রেলিয়ার সেই মরুভূমিতে বালি খামচে পড়ে আছি। আমার চারদিকে এক অদ্ভুত হাওয়া বইছে শনশন করে, এই হাওয়া কোন পার্থিব হাওয়া নয়। আমার জামাকাপড়ের অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়। পুরো ফর্দাফাঁই! দেখলে মনে হবে কোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছি। সারা শরীর কেটে ছড়ে গেছে। সচেতন অবস্থায় আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। স্বপ্ন, অভিযান – সবকিছুই ক্ষীণ স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেল! কোথা থেকে আমার স্বপ্ন শুরু হয়েছিল আর কোথায়ই বা অভিযানের শেষ হয়েছিল, আমার কিছুই মনে নেই। আমার আশেপাশে কয়েকটা রাক্ষুসে পাথরের চাঁই যেন দুঃস্বপ্নের অভিযানের সাক্ষী হয়ে ব্যাঙ্গের হাসি হাসছে। যাই হোক একটা দুঃস্বপ্নের অভিযান, একটা নারকীয় আতঙ্কের প্রহরের সমাপ্তি ঘটল অবশেষে। এর মধ্যে কতটা সত্যি আর কতটা আমার কল্পনা বা স্বপ্ন সেটা অজানাই রয়ে গেল। আমার টর্চ, আমার সংগ্রহ করা বইয়ের বাক্স কিছুই আমার আশেপাশে খুঁজে পেলাম না। ওগুলো থাকলে হয়তো সাক্ষী হিসেবে কাজ করত। ওই বইয়ের বাক্সটা দুটো দুনিয়ার মধ্যে মিসিং লিংকের কাজ করতে পারত। কিন্তু সত্যিই কি কোন পাতালপুরী ছিল? বা ওই বইয়ের বাক্সটা, অথবা সেই প্রাচীনতম সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ? নাকি সবই আমার কল্পনা? কিন্তু আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আমার আশেপাশে মরুভূমির রুক্ষ বালি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। সেই অশুভ হাওয়াটা আর বইছিল না। রাঙাভাঙা চাঁদও পশ্চিমে ঢলে গিয়েছিল। আমিও কোনরকমে আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর রওনা দিলাম ক্যাম্পের দিকে। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল। যদি আমি জ্ঞান হারিয়ে গোটাটাই স্বপ্ন দেখে থাকি, তাহলে আমি এতক্ষণ বেঁচে রইলাম কি করে? আরও একবার সেই উপকথার গল্পগুলো আমার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল। যদি ওই পাতালপুরীর অস্তিত্ব সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে ঈথরাও সত্যি! আর বিশ্বব্যাপী কালচক্রের সেই চক্রাবর্তও একটা হৃদয়বিদারক সত্যি ছাড়া কিছু নয়। সত্যিই হয়তো আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম কয়েকশো কোটি বছর আগের প্রাক মানবসভ্যতার যুগে আমার সেই অন্ধকারের দিন-গুলোয়। হয়তো সত্যিই প্যালিওজিয়ন যুগের কোন ভিনগ্রহের ভয়ংকরের মনন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

আমার এই শরীরটাকে ব্যবহার করেছিল সময় অভিযানের বাহন হিসেবে। কিন্তু এর কিছু অংশও যদি সত্যি হয়, তাহলে তা মানবসভ্যতার জন্য অপেক্ষা করছে সেই ভয়াবহ অকাল তমসা! পাশাপাশি একথাও ঠিক এগুলোকে সত্যি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আমার কাছে কোন প্রমাণ ছিল না। যাওবা ওই বইয়ের বাক্সটা ছিল, সেটাও হারালাম! অবশ্য সত্যি না হলে সেটা গোটা মানবসভ্যতার জন্যই আশীর্বাদ।

যাইহোক উইনগেটের জন্য সবই খুঁটিনাটি আমি লিখে রাখলাম। একজন মনস্তাত্ত্বিক আর আমার বিপর্যয়ের সাক্ষী হিসেবে ওই নাহয় এগুলোর বিচার করুক। আর শেষ করার আগে একটা কথা বলে রাখা ভাল, ওই পাতালপুরীর নরকে টর্চের আলোয় যখন আমি বাক্স থেকে বইটা বের করে দেখেছিলাম তখন ঠিক কেন শিউড়ে উঠেছিলাম। ওই বইয়ের সেলুলোজের পাতায় কোন প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালা ছিল না। যা ছিল সেটা সত্যি হলে সময় আর স্থানের শিশুসুলভ সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানবসভ্যতা যেকোনো দিন ডুবে যাবে সেই ভয়াবহ অকাল তমসায়। ঈথরাও যাদের ভয় পেয়েছিল তারা শাসন করবে এই গোটা মহাবিশ্ব! হ্যাঁ, ওই বইয়ের সেলুলোজের পাতায় হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালার বদলে আমি দেখেছিলাম নিজের হাতের লেখায় রোজকার খুঁটিনাটি বিবরণ! যে ভাষায় আমি কথা বলতাম মিসকাটোনিক ইউনিভার্সিটিতে, সেই চালু ইংরেজিতে!

(সমাপ্ত)

অলঙ্করণঃ রূপক ঘোষ

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

জাপানি কল্পবিজ্ঞানের অনুবাদঃ

(洪水Kouzui)

অনেকদিন আগের বা সুদূর ভবিষ্যতের কথা (পাঠকের যা মর্জি ভেবে নিন), এক সৎ, কপর্দকহীন কিন্তু জ্ঞানী ভবঘুরে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের উচ্চাশায় একটা নদীর ধারে নতুন গড়ে ওঠা নীলচে রঙের লঙ্গরখানার ছাদে টেলিস্কোপ বাগিয়ে বসল। স্বাভাবিক ভাবেই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে কিছু গোদা গোদা নুড়ি পাথরের অর্থহীন ছোটাছুটি আর হরতাল বা অবরোধে আটকানো ট্রেনের চাকার মত কিছু মুখপোড়া তারার একবগগা স্থির অবস্থান ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না। তাও এসব দেখতে তার বেশ লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ মনের খেয়ালে বা হয়ত দৈবাৎ-ই সে তার টেলিস্কোপের মুখ নিচে মাটির দিকে ঘোরালো। অমনি একটা পিচ বাঁধানো রাস্তার ছবি তার নাকের ডগায় এসে উল্টো হয়ে ঝুলে রইলো। আর সেই উল্টোনো রাস্তায় একটা অচেনা শ্রমিক এসে উল্টো হাঁটতে শুরু করল। একগাল হেঁসে ভবঘুরে মশাই মনে মনে উল্টো ছবিটা সোজা করে টেলিস্কোপের আতস-কাঁচ একটু আগুপিছু করে নিতেই টেলিস্কোপের জোরালো বিবর্ধনের গুনে স্পষ্ট দেখা গেল যে শ্রমিকটির ছোট্ট মাথাটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। শ্রমিকটি সারা রাত কারখানায় কাজ করে সবে বাড়ি ফিরছে। কাজেই তার মাথার ভেতরে সেই মুহূর্তে হাড়ভাঙ্গা খাটনির ক্লান্তি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।

খুবই ছাপোষা একটা দৃশ্য। কিন্তু কেন যেন ভবঘুরে তার থেকে টেলিস্কোপের মুখ সরাল না। একাগ্র মনে টেলিস্কোপে চোখ রেখে তার দৃষ্টি সেই শ্রমিককে অনুসরণ করতে থাকল আর ঠিক তখনই তার প্রথম চোখে পড়ল একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। দৃশ্যপটে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটল। একটু ঝাপসা হয়ে এলো শ্রমিকের দেহ-রেখা। ভালো করে লক্ষ্য করতে দেখা গেল পা থেকে শুরু করে তরল হয়ে যেতে শুরু করেছে শ্রমিকের শরীরটা। প্রথমে অবয়ব হারিয়ে একটা কাদার তালের মত হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লোকটা। আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল রাস্তার ওপরে শুধু তার পোশাক, জুতো ও টুপী পড়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ শরীরটা তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রাজপথ জুড়ে।

তরল শ্রমিক পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম মেনে উঁচু জমি থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে চলল। চলতে চলতে সে গড়িয়ে একটা গর্তে গড়িয়ে পরল। কিন্তু এর পরে যা ঘটল তাতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভবঘুরের হাতের টেলিস্কোপ ফসকে পড়ে যাবার যোগাড় হল। তরল পদার্থের চিরন্তন ধর্মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রমিকের সেই তরল শরীর সেই গর্ত থেকে বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। বেয়ে বেয়ে সে পথের ধারে পৌঁছে একটা বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে একটা খোলস-বিহীন শামুকের মত সেই বেড়ার গা বেয়ে সেটা অতিক্রম করে তার উল্টো দিকে উধাও হয়ে গেল। ভবঘুরে তার টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে কিছুক্ষণ থমকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পরদিন সকালে সে ঘোষণা করল যে সারা পৃথিবী জুড়ে এক মহাপ্লাবন আসছে!

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

চারদিকে গরীব মানুষ ও শ্রমিকদের তরলায়ন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল গণ-তরলায়ন। বড় বড় কলকারখানায় মেশিন-পত্র উৎপাদনের মাঝেই হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল। কারখানার সব কর্মী একসাথে গলে একটা বৃহৎ তরলের ধারা দরজা, জানালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, ফাটক ও দেয়াল লঙ্ঘন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কখনো কখনো ত কারখানা জনশূন্য হয়ে যাবার পড়েও মেশিন-পত্র নিজেদের মত উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলতে থাকছিল, যতক্ষণ না সেগুলো বিকল হয়ে পড়ে। গন-তরলীকরণের ফলে জেলখানা বন্দি-শূন্য হয়ে পড়া বা এক একটা গোটা গ্রামের সম্পূর্ণ জনসংখ্যা গলে জল হয়ে গিয়ে ছোটখাটো বন্যার খবরে সংবাদপত্রের পাতা ভরে যেতে থাকল।

২

সারা পৃথিবী জুড়ে এই মানুষের হঠাত করে গলে জল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রচুর বিভ্রাটও দেখা দিল। অপরাধী গলে গিয়ে সব তথ্যপ্রমাণ হারিয়ে বিভিন্ন অপরাধের মামলার সুরাহা করতে পুলিশের কালঘাম ছুটে সম্পূর্ণ আইনি ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়ার যোগার। স্বভাবতই বিভিন্ন দেশে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সমস্যার সুরাহা করতে গোপনে বিজ্ঞানী ও পদার্থবিদদের শরণাপন্ন হল। কিন্তু পদার্থবিদ্যার সবরকম আইন-কানুন ভাঙা এই মানুষ গলা জল নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরে গেলেন মহা ফাঁপরে। এই জল দেখতে, স্পর্শ করতে বা স্বাদে-গন্ধে সাধারণ জলের মতই। কিন্তু কখনো কখনো কোন অজানা কারণে এর পৃষ্ঠটান বেড়ে ওঠে। তখন এই বস্তু শুধু এম্যিবার মত যে কোন অনির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে ও নিচু থেকে উঁচু জায়গায় বয়ে চলতে সক্ষম তা শুরুতেই সকলে জানা ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এক মানুষ গলে সৃষ্ট জল অনন্য মানুষ গলা জল থকে শুরু করে সাধারণ প্রাকৃতিক জলে মিশে গেলেও কোন এক অদ্ভুত উপায়ে কোন অজানা উদ্দীপকের প্রভাবে হঠাত করে এই মানুষ গলা জল একে অপরের থেকে বা অন্য দ্রাব তরলের থেকে মুহূর্তে আলাদা হয়ে যেতেও সক্ষম। আবার অন্য একদল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখলেন যে এই জলবৎ তরলে ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত কম পৃষ্ঠটানও দেখা যায়, অনেকটা এলকোহলের মত। আর এই অবস্থায় এই তরলের ভেদ ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। ফলে একই বস্তু, যেমন একটি কাগজের টুকরো, এক এক সময়ে এই তরলে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকছে ত অন্য সময়ে এতে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে! এরকম আজব কাণ্ড দেখে বৈজ্ঞানিকদের ত মাথায় হাত পড়ল। কিন্তু বিভ্রাট এখানেই থামল না।

দেখা গেল এই মানুষ গলা জল সাধারণ জলের মতই জমাট বেঁধে বরফ হয় আবার গরমে বাষ্প হয়ে উবেও যায়। কিন্তু যথারীতি এই সৃষ্টিছাড়া জলের কোন নির্দিষ্ট হিমাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক নেই। মেরু-অঞ্চলে অনেক জায়গা থেকে ঘোড়া, কুকুর সুদ্ধ স্লেজ গাড়ি পাথরের মত জমাট বরফে হঠাত তলীয়ে যাবার খবর এলো। শীতকালীন খেলার আসরে ত স্কি রেসের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রেস সমাপ্তি-রেখার একেবারে দোরগোড়ায় এসে হঠাত চোরাবালির মত বরফে সটান পাতাল-প্রবেশ করল। অন্যদিকে উষ্ণ অঞ্চলে হঠাত হঠাত সুইমিং পুলের জল জমাট বেঁধে পুলে সাঁতার দেওয়া লোকজন জলের মধ্যে জমে কাঠ হয়ে যাওয়ার মত ঘটনাও ঘটতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই এই মানুষ-জলের ধারা নদী, সমুদ্রে মিশে, বাষ্প হয়ে মেঘের মধ্য দিয়ে বৃষ্টি বা তুষার হয়ে পাহাড়, বন হয়ে সারা বিশ্বে সব দেশে মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি হল চরম বিভ্রান্তির। কখন কোথায় কি ঘটবে তার অজানা শঙ্কায় সিটিয়ে রইল সবাই। সমস্ত রাসায়নিক গবেষণা লাটে উঠল; বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের বয়লার এই মানুষ-গলা জলের ধাক্কায় অচল হল; আর সবচেয়ে করুন দশা হল জলের মাছ ও ডাঙার গাছেদের, যাদের জীবনের প্রাথমিক সূত্রই হল জল। অনেক জায়গায় গাছের ফলপাকুড় আশে পাশে চলতে থাকা গান-বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে গাছ থেকে ঝড়ে পরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠে ঘাটে গড়িয়ে বারাতে লাগল, কোথাও বা খেতের প্রায় পেকে ওঠা ফসল ফটরফট ফটরফট শব্দে পটকার মত ফেটে উঠল। তবে আসল দুর্ভোগ তখনো বাকি ছিল।

প্রথমে যাকে বিভ্রাট মনে করা হয়েছিল, কয়েকদিনেই বোঝা গেল যে তা আসলে তার চেয়ে অনেক গুরুতর এক বিভীষিকা। সেটা বোঝা গেল যখন তখনো শরীর ধারণ করে থাকা মানুষদের ওপরে সরাসরি আক্রমণ শুরু হল এই গলে যাওয়া মানুষদের। প্রথম সরাসরি আক্রমণ এলো সমাজের উঁচুতলায় থাকা ধনী সম্প্রদায়ের ওপরে। এক সকালে এক কারখানার মালিক তার প্রাতরাশের কফির কাপে ঠোঁট ছোঁয়াতেই সরাসরি ওই কাপের তরলে ডুবে গেল। আর একজন শিল্পপতি একটা পার্টিতে একঘর লোকের চোখের সামনে এক পাত্তর হুইস্কিতে বিলীন হয়ে গেল। তবে চূড়ান্ত আতঙ্কজনক ঘটনাটা মনে হয় এক তারকা অভিনেত্রীর শুটিং চলাকালীন একফোঁটা নকল চোখের জলের মধ্যে সলিল সমাধি হওয়া। অবিশ্বাস্য হলেও এই সব ঘটনাই বাস্তবে ঘটেছিল।

এই সমস্ত ঘটনার খবর দাবানলের মতই চারদিকে ছড়িয়ে পরল আর সঙ্গে সঙ্গে বেশীরভাগ বিত্তবান মানুষই সত্যিকারের জলাতঙ্কের শিকার

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হল। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলার বয়ানে –

"যখনই আমি গেলাসে জল নিয়ে সেটার দিকে তাকাচ্ছি আমি জল দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে আমার হাতে ধরা রয়েছে এক গেলাস বিষাক্ত কালো পোকার দল। মনে হচ্ছে এখুনি তারা আমার হাত বেয়ে মুখে উঠে আমার ঠোঁট, গালের মাংস ভেদ করে আমার গলায় তাদের বিষ ঢেলে দিতে উতলা হয়ে কিলবিলিয়ে ফুঁসছে! এই আতঙ্কের আক্রমণ আমি আর সহ্য করতে পারছি না! জল দেখলেই আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হয়ে আসছে!"

যেখানে এই রকম কণ্ঠনালী রুদ্ধ হচ্ছে না সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক মহিলা-পুরুষ জলের এক ঝলক দেখা মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে পরছিলেন। বলাই বাহুল্য, প্রচলিত জলাতঙ্কের ওষুধ বা টিকা ব্যাবহার করে তাদের অবস্থার কোন উন্নতিই হল না।

৩

এই সব ঘটনার মাঝে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এক আসন্ন অবশ্যম্ভাবী মহাপ্লাবনের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পরল। যদিও সব সংবাদ-মাধ্যমই কোনরকম প্লাবন বা বন্যার আশঙ্কা অমূলক বলে আশ্বাস-বানী প্রচার করতে থাকল আর কোন রকম গুজবে কান দেওয়ার থেকে জনগণকে বিরত হওয়ার অনুরোধ করতে থাকল।

-প্রথমত, সে বছর সারা পৃথিবীতেই আঞ্চলিক বা সামগ্রিক গড় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক মাত্রার নিচেই ছিল।

-দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে বলে খবর আসছিল, সেই সব কটাই বিপদসীমার নিচ দিয়েই বইছিল।

-তৃতীয়ত, পৃথিবীতে কোনরকম ভূতাত্ত্বিক বা জলবায়ু সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতা ধরা পরে নি।

এই সবই নির্ভেজাল তথ্য। কিন্তু আরো নির্ভেজাল সত্য হল প্লাবন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর যত সরকার ও গণমাধ্যম গুলো এই সত্য কে অস্বীকার করতে চাইলো ততই জনসাধারণ এই নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠল। সকলেই বুঝতে পারছিল যে এই প্লাবন কোন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। শেষে কিছুটা রেখেঢেকে হলেও সংবাদ মাধ্যম এই বিপদের সত্যতা মেনে নিলো। সঙ্গে প্রচারিত হল চিরাচরিত স্তোকবাক্য যে এই আজব ঘটনা গুলো নিতান্তই সাময়িক, কোন মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফলে এসব হচ্ছে এবং অতি শীঘ্রই পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি...।

এদিকে মানুষ গলা জলের ধারা কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে চলল গ্রাম কে গ্রাম, শহর কে শহর। গ্রাম-শহরের বিত্তবান মানুষদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল এই জলের ধারাকে এড়িয়ে পাহাড়-মালভূমি গোছের উঁচু জায়গায় গিয়ে আস্তানা গাড়ার জন্য। যে সৃষ্টিছাড়া জল দেয়াল বেয়ে উপরদিকে উঠতে পারে তাদের কাছে পাহাড়ের উচ্চতা কোন বাধাই নয়, এই কথাটা তাদের অনেকের মাথায় এসে থাকলেও সেই মুহূর্তে তারা আর কোনো অন্য উপায় ভেবে পেলো না।

অবশেষে সমস্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরাও একে একে মেনে নিলো যে পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। দেশে দেশে সরকারি ঘোষণায় মানব সভ্যতাকে মহাপ্লাবনে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাতে বড় বড় বাঁধ ও পরিখা গরবার জন্য সব রকম ভাবে দেশের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করা হল। লক্ষ লক্ষ মানুষকে সরকার বাধ্যতামূলক শ্রমদান কর্মসূচিতে নিয়োগ করে এই সব নির্মাণকার্যে নিয়োগ করল। সংবাদ মাধ্যমগুলো এঁদের এই মহান প্রচেষ্টা, সমগ্র মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম ইত্যাদি প্রশস্তিতে সাজিয়ে দিলো। কিন্তু মনে মনে সরকার, জনসাধারণ বা সংবাদ মাধ্যম, সকলেই জানত যে এই মানুষ গলা জলের প্লাবনের সামনে এই সব বাঁধ, পরিখা অনেকটা কোয়ান্টাম ডাইনামিকসের ব্যাখ্যা নিউটনের গতিসূত্র দিয়ে বুঝতে যাওয়ার মত, একদমই বৃথা। তার ওপরে এই সব নির্মাণে কাজ করা শ্রমিকেরা এই সব বাঁধের ভেতরের অংশে নিজেরাই গলে জল হয়ে এইসবের কার্যকারিতার অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটাচ্ছিল।

এই সময়ে একদল বিজ্ঞানী রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব রাখল যে পারমানবিক শক্তি ব্যাবহার করে মানুষ গলে সৃষ্টি হওয়া জলরাশিকে উবিয়ে দেওয়া হোক। রাষ্ট্রপুঞ্জ এই প্রস্তাবে সম্মত হলেও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সব দেশ নানা সমস্যায় পড়ল। প্রথমত মানুষ গলে জল হওয়ার গতি চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছিল। গলে যাওয়া শ্রমিকদের জায়গা নেওয়ার মত যথেষ্ট শ্রমিক কোন দেশের কাছেই ছিল না। দ্বিতীয়ত এই গলে জল হওয়ার ঘটনা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পরছিল দ্রুতহারে। আর তৃতীয়ত সব দেশেই প্রচুর কলকারখানা এই মহাপ্লাবনের জলে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ভেসে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে কোন দেশের সরকারই প্রয়োজনীয় পারমানবিক শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রাংশ বানানোর কাজ শুরুই করতে পারল না।

৪

এই অন্তহীন বিভীষিকার সন্মুখিন হয়ে পৃথিবী আক্রান্ত হল চরম হতাশা আর নৈরাজ্যে। আতঙ্কে জল না খাওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুকিয়ে মৃত্যুবরণ করে মমিতে পরিণত হল। যারা বেঁচে রইল তাদের মধ্যেও দেখা দিল নানান মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয়।

তবে এই চরম দুর্দিনে যখন মানুষ বিলুপ্ত হওয়ার জোগাড়, একজন মানুষ কিন্তু বেশ শান্ত ও খোশ মেজাজে ছিল। সেই মানুষের নাম নোয়া। প্রচণ্ড উদ্যমী ও আশাবাদী মানুষ এই নোয়া ছিল এই ধরনের প্লাবন ও তার মোকাবিলা করার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ। এই বিচিত্র মহাপ্লাবনের আগাম সংকেত পেয়ে সে বিচলিত না হয়ে অনেকদিন ধরেই তার বিশাল নৌকা তৈরির কাজে মননিবেশ করল। যখনই তার মনে হত যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ তার ও তার পরিবারের হাতে, তখনই মনে মনে সে নিজেকে মনে মনে এক অতিমানবীয় ক্ষমতার ধারক ও বাহক ভেবে আনন্দের তূরীয় স্তরে উত্তীর্ণ হত।

বর্তমানে মানুষ গলা জলের মহাপ্লাবন দুর্দমনীয় মেজাজে নোয়ার নৌকার দিকে ছুটে চলেছে। নোয়াও প্রস্তুত। সে তার নিজের পরিবারবর্গ ও সমস্ত গবাদি পশু-পাখি সমেত নৌকায় চেপে বসেছে। কিন্তু এ কি! মানুষ গলা জলের এ কি আস্পর্ধা! তারা নোয়ার নৌকার প্রতি কোনরকম সমীহ না প্রদর্শন করে সটান তার গা বেয়ে তাদের স্বভাবসিদ্ধ অস্বাভাবিক চলনে উপরদিকে উঠে চলেছে!

"তফাৎ যাও, বেয়াদবের দল! জানো না এটা কার নৌকা? এটা কোনো হেঁজিপেঁজির নৌকা নয়! আমি আদি অকৃত্রিম মানব-প্রাণের রক্ষক নোয়া! দূর হও এখান থেকে!"

ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠেছে নোয়া।

কিন্তু নোয়ার হিসেবে একটা মস্ত বড় ভুল হয়েছে। এই গলে যাওয়া মানুষদের না আছে চেতনা না আছে শ্রবণ ক্ষমতা। আছে শুধু জলের পরিবর্তিত ধর্ম। মহাপ্লাবনই এই জলের মোক্ষ। আর কোন দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ তাদের যে আর নেই। মুহূর্তে তারা নৌকার ডেক-এ উঠে এসে নৌকার মানুষ পশু নির্বিশেষে সব প্রাণীকে গ্রাস করল। চারদিকে অথৈ জলের নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার তোড়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল শুধু সেই বিধ্বস্ত প্রাণহীন নোয়ার নৌকা।

এইভাবে দ্বিতীয় মহাপ্লাবনে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লোপ পেলো। কিন্তু যদি আপনারা সারা পৃথিবী ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন এই সমুদ্রের তলদেশে ডুবসাঁতার দিয়ে নামতে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন যে জলে ডুবে থাকা গ্রাম গঞ্জের পথঘাটের কোনায় কোনায় ইদানীং একটা হালকা দ্যুতিময় এই জলের থেকে ভিন্ন ধর্মী পদার্থ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সম্ভবত এই মানুষ-গোলা জল অবশেষে মানুষ-ভারে অতি-সংপৃক্ত হয়ে পড়েছে।

(সমাপ্ত)

ইংরেজি অনুবাদ - সিরো তোমুরা ও গ্রানিয়া ডেভিস

বাংলা অনুবাদ - সুপ্রিয় দাস

অলঙ্করণঃ শিল্পী রয় বসু

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

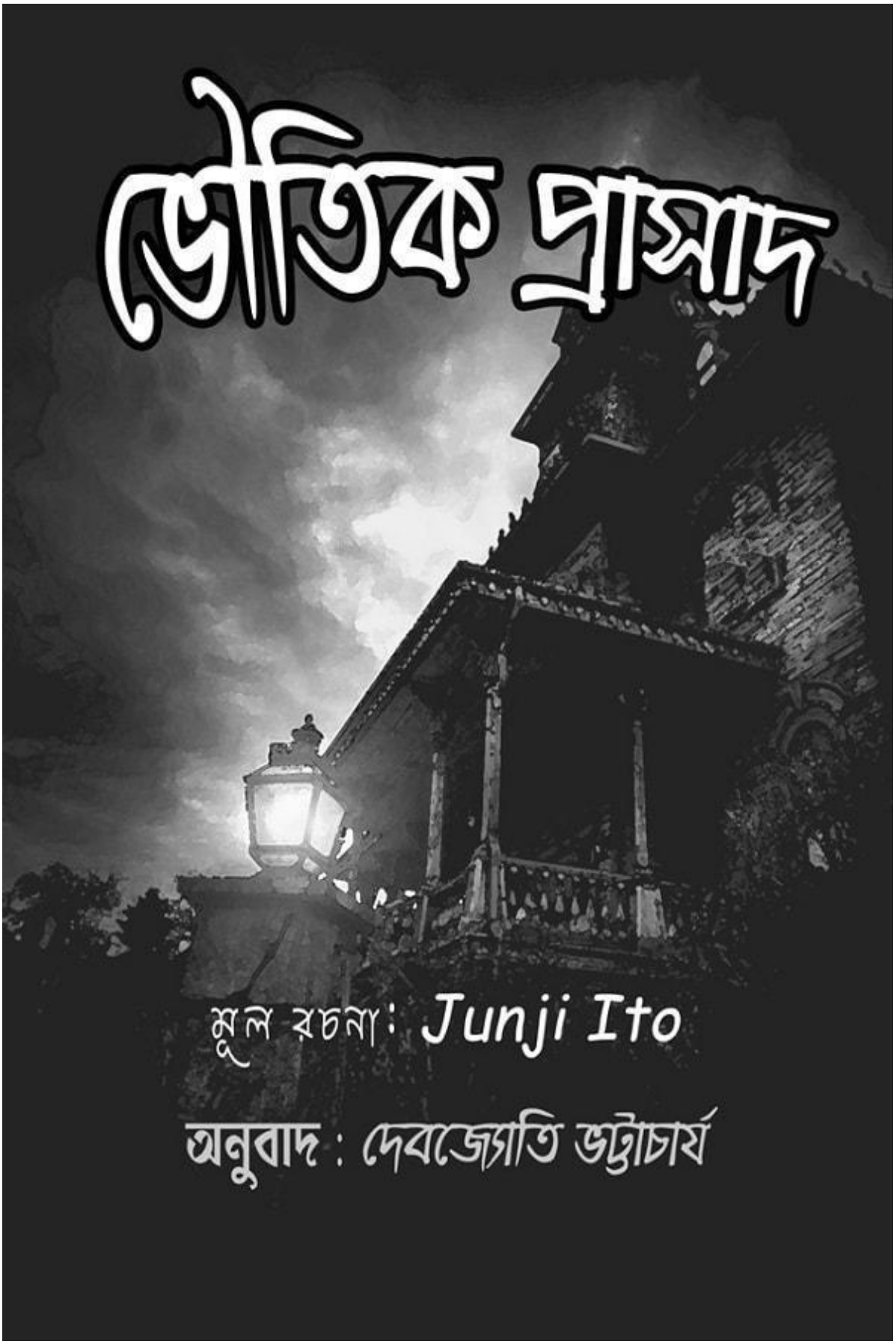

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

• কমিক্সটি ডান দিক থেকে বা দিকে পড়তে হবে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

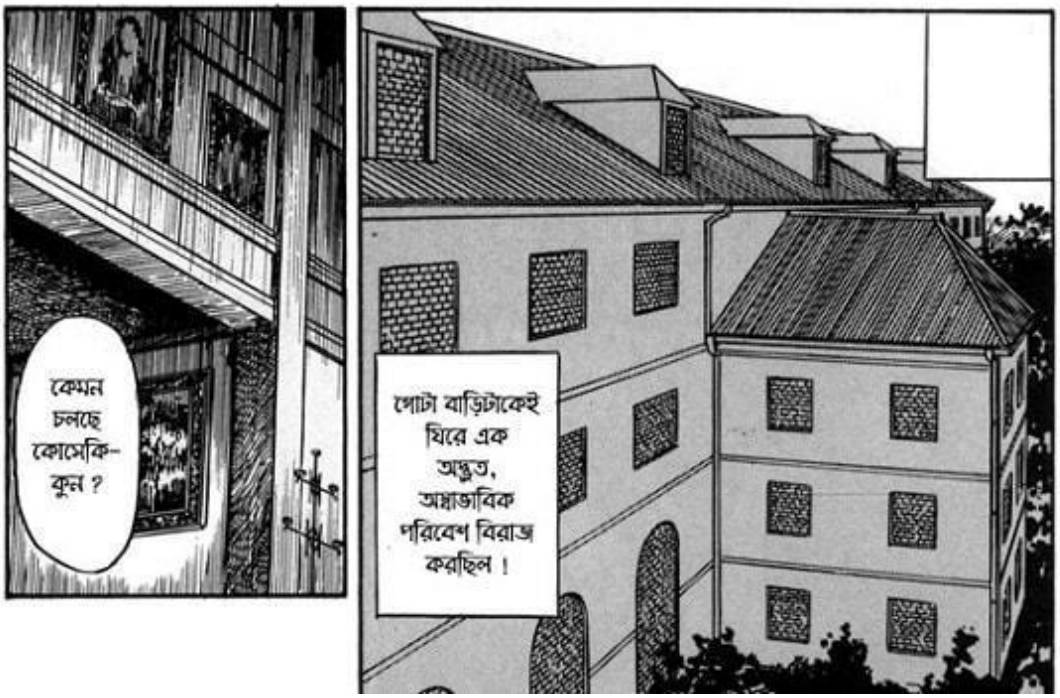

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

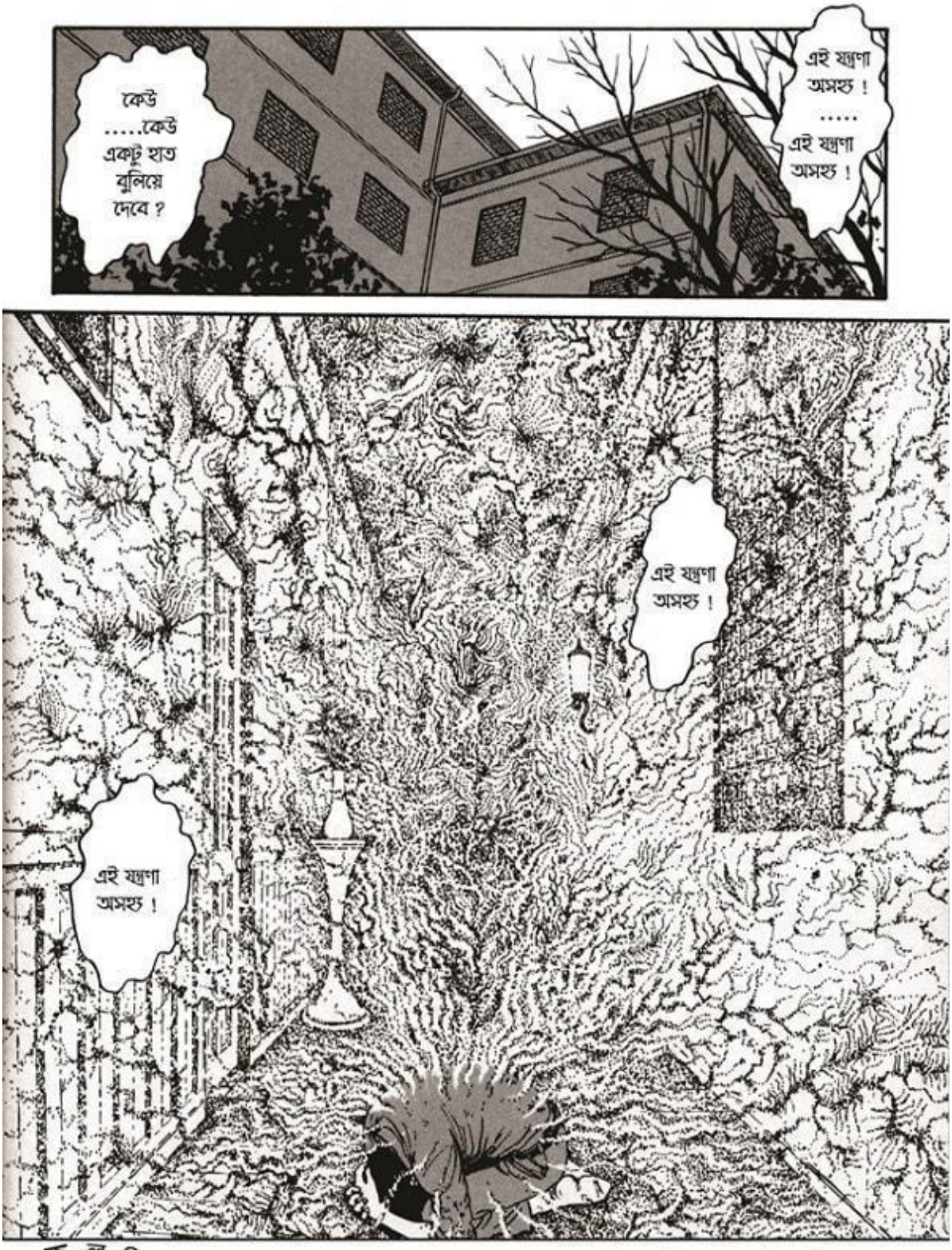

Junji Ito (born July 31, 1963) একজন জাপানি কার্টুনিস্ট, মূলত তাঁর ভৌতিক manga কমিকস সিরিজের জন্য বিখ্যাত। 'ভৌতিক প্রাসাদ' (The Phantom Mansion) কমিকসটি 2007-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

তৃতীয় শিকারের খোঁজে

মূল রচনা - মাসামুনে শিরো

বাংলা অনুবাদ - রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্তু বাগ

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

*সারিন - চটজলদি মিশে যাওয়া স্নায়ু গ্যাস। ক্ষতিকর মাত্রা ১ মাইক্রোগ্রাম (০.০০০০০০০৩৫ আউন্স)

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হেশ - হাই এক্সপ্লোসিভ স্কোয়াশ হেড

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

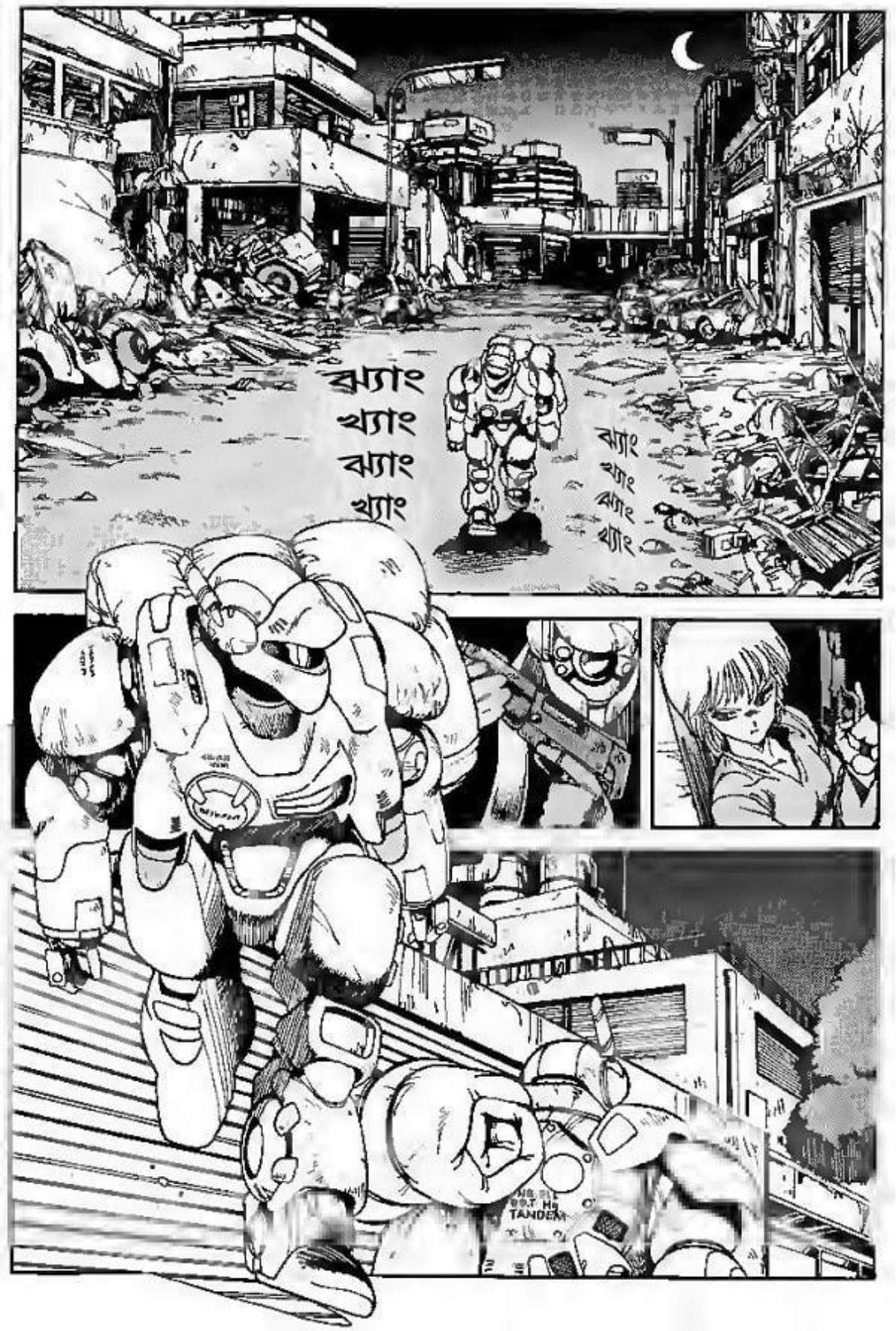

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

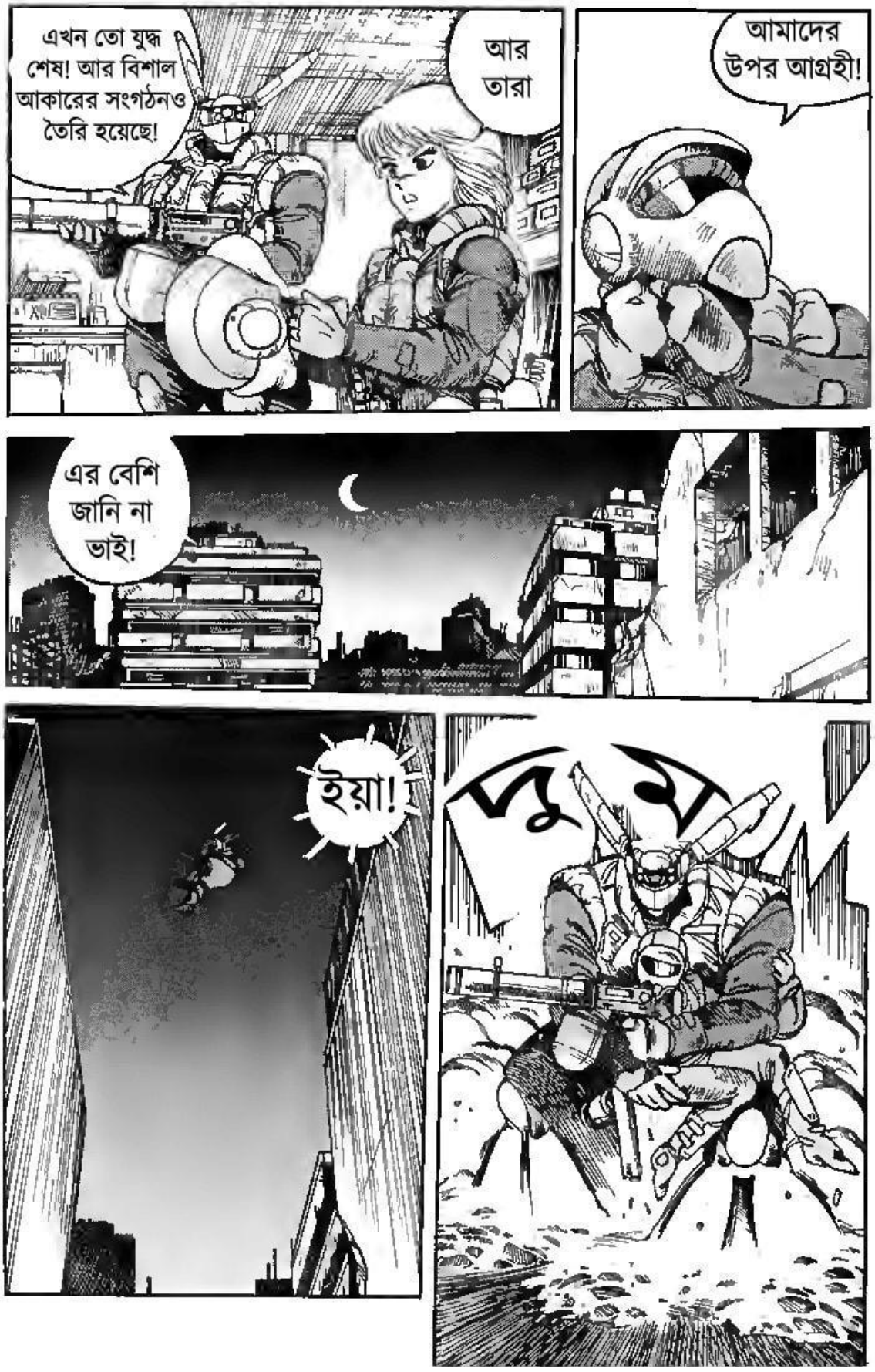

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

হিট - হাই এক্সপ্লসিভ অ্যান্টি ট্যাঙ্ক

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

চলচ্চিত্র আলোচনাঃ

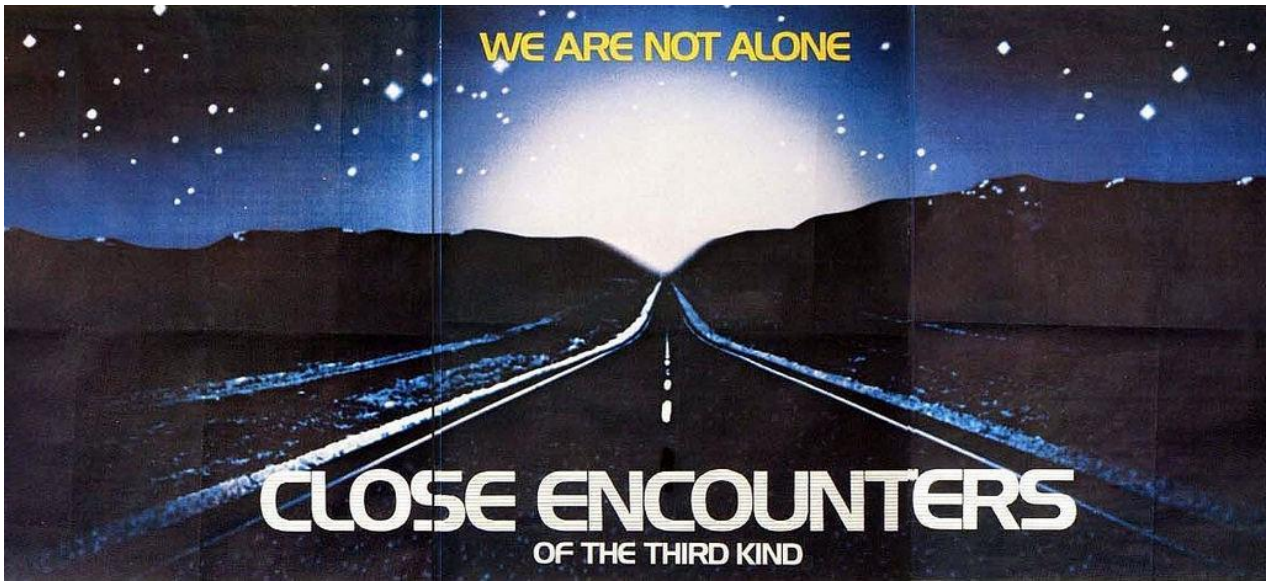

Close Encounters of the Third Kind (1977)

সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ১৯৪৫ সালে হারিয়ে যাওয়া ফ্লাইট ১৯ এর এক ঝাঁক প্লেন খুঁজে পাওয়া গেল প্রায় তিরিশ বছর বাদে মেক্সিকোর কাছাকাছি সোনোরান মরুভূমিতে। ইঞ্জিন সম্পূর্ণ অক্ষত। এমনকি ম্যাপ আর চার্টগুলোও একদম ঠিকঠাক রাখা আছে। যে বৃদ্ধ মেক্সিকান ভদ্রলোক এই প্লেনগুলো রাতের অন্ধকারে নেমে আসতে দেখেছিলেন তার কথায়, 'আলো জ্বলে উঠল মধ্যরাত্রিতে, সূর্যদেব নেমে এলেন ওই স্বর্গীয় বিমান থেকে আর আমায় গান শোনালেন।' --- এভাবেই একটা রোমাঞ্চকর আবহে শুরু হয় স্টিভেন স্পিলবার্গের প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান ছায়াছবি 'ক্লোস্ এন্‌কাউন্টারস্ অফ্ দ্য থার্ড কাইন্ড'। সারা পৃথিবীর কল্পবিজ্ঞানপ্রেমী মানুষের মনে এই ছবিটা একটা বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে।

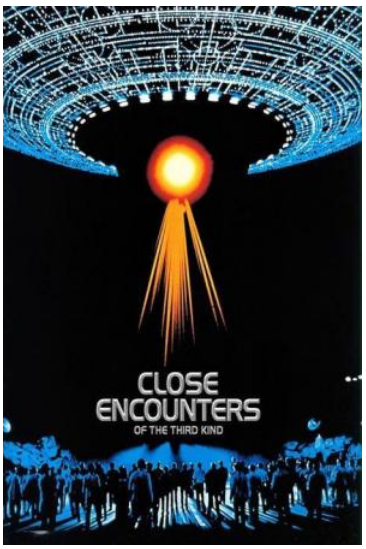

ছবির পোস্টার

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ভিনগ্রহীদের সাথে মানুষের সাক্ষাৎ হলে তা কি আদৌ বন্ধুত্বপূর্ণ হবে নাকি সেই মোলাকাত সংঘাতেই শেষ হবে এই বিষয়টা নিয়ে কল্প বিজ্ঞান সাহিত্যে বহুকাল ধরে নানা চর্চা হয়েছে। হার্বার্ট জর্জ ওয়েলেস্ এর মতো কল্প বিজ্ঞান সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্বও কিন্তু তাঁর ক্লাসিক 'ওয়র অফ্ দ্য ওয়ার্ল্ডস্' উপন্যাসে মঙ্গল গ্রহের কাল্পনিক জীবদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ছবি তুলে ধরেছিলেন। অরসন ওয়েলেস্ ১৯৩৮ সালের ৩০ শে অক্টোবর তাঁর বিখ্যাত এবং তেমনি কুখ্যাত রেডিও নাটকে স্থানীয় সংবাদ, বিশেষ ঘোষণা এরকম নানা অনুষঙ্গ যোগ করে এই গল্পের যে হাড় হিম করা রূপান্তর করেছিলেন; আমেরিকার বিশেষতঃ ন্যু-ইয়র্কের মানুষ সেটাকে প্রায় আক্ষরিক সত্যি ভেবে বসেছিল সেইদিন। এছাড়া হলিউড, পূর্ব ইউরোপ আর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অসংখ্য কল্পবিজ্ঞান ছবিতে ভিনগ্রহী এলিয়েনদের সাথে মানুষের সংঘাতের ছবিই বেশী করে তুলে ধরা হয়েছিল। এই বারবার উঠে আসা বিষয়টাকে একটা অন্য চেহারায় দেখান স্টিভেন স্পিলবার্গের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এই ছবির জন্য নিজের গল্প অবলম্বনে লেখা তার স্বপ্নের চিত্রনাট্যকে নিয়ে শেষমেশ ১৯৭৩ সালের শেষদিকে কলম্বিয়া পিকচার্সের সাথে একটা চুক্তি করেছিলেন তিনি। আর ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ এই ছবি মুক্তি পায়। ছবিতে ক্লদ লাকোম্ব নামে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পৃথিবীবিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ফ্রাসোয়াঁ ত্রুফো।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক ক্লদ ল্যাকোম্বের ভূমিকায় ফ্রাসোয়াঁ ত্রুফো

গল্পের শুরুতেই নানা রকম আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। মেক্সিকোর ওই মরুভূমি ছাড়াও মঙ্গোলিয়ার গোবি মরু অঞ্চলে অনেককাল আগে হারিয়ে যাওয়া মালবাহী জাহাজ 'এস এস কোটোপেক্সি' কে খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ভারতের ধর্মশালায় আকাশ থেকে ছটা বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দ শোনা যায় যাকে অসংখ্য ধার্মিক লোকেরা সাক্ষাৎ ভগবানের কণ্ঠস্বর ভেবে নেন। ইউনাইটেড নেশনস্ এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অনেকের মতো বৈজ্ঞানিক ক্লদ ল্যাকোম্বও এই রহস্যের কিনারা করতে আসেন। অদ্ভুতভাবে নাসার একটা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে অজানা এক পালসারের কাছ থেকে যে তরঙ্গগুলো পাওয়া যায় তার কম্পাঙ্কও এই ছটা স্বরের সঙ্গে একেবারে সমান। এগুলো কি কোন গুপ্ত সংকেত যা ভিনগ্রহী জীবেরা এই পৃথিবীর মানুষদের জন্য দিয়ে আসছে? যে কজন মানুষ অজানা কিছু আকাশ যান খুব কাছ থেকে দেখতে পান তারা একটা অজানা টিলার ছবি নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। কেউ বারবার ওই টিলার ছবি আঁকেন কেউ বা মাটি কাঠ পাথর দিয়ে তার একটা মডেল তৈরি করার চেষ্টা করেন। এতগুলো মানুষের মনের এই ছবিটা কি আসলে কোন সঙ্কেত যেটা দিয়ে ওই অজানা জীবেরা তাদের অস্তিত্ব জানাচ্ছে? এর মধ্যে অনেকে হারিয়ে যাবে রহস্যময়ভাবে যার মধ্যে ইন্ডিয়ানা স্টেটের অধিবাসী ৩ বছরের শিশু ব্যারি গাইলারও ছিল। এই সব কাণ্ডের মধ্যে পালসার থেকে পাওয়া সংখ্যাগুলো যার সাথে ওই শব্দের কম্পাঙ্ক মিলে গেছিল তার একটা মানে পাওয়া যাবে। ওই ছটা সংখ্যা আসলে একটা বিশেষ অঞ্চলের অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাকে প্রকাশ করছিল। ম্যুরক্রাফট্, ওয়ায়োমিং অঞ্চলের ওই জায়গায় আসলে ওই স্বপ্নের টিলার মতো একটা সত্যিকারের পাহাড় আছে যাকে স্থানীয় লোকেরা ডেভিলস্ টাওয়ার বলে। তাহলে কি ভিনগ্রহের ওই অজানা প্রাণীরা এই অজানা পাহাড়ের বুকেই নেমে আসবে? তারা কি আদৌ বন্ধুভাবাপন্ন হবে আমাদের?

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ভিনগ্রহী যান নেমে আসছে ডেভিলস্ টাওয়ারের ওপর

বাকীটা জানতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে এই অসাধারণ কল্প বিজ্ঞান চলচ্চিত্র। পরতে পরতে অ্যাডভেঞ্চার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে স্পিলবার্গ এই গল্পের এক অসামান্য চিত্রায়ন করেছিলেন। আর যেটা না বললেই নয় সেটা হল ঝাঁ চকচকে স্পেশাল এফেক্টে ভরা ফটোগ্রাফি আর ছবির আবহ সংগীত। ছবির ভিস্যুয়াল কন্ট্রোল সুপারভাইজার ডগলাস ট্রামবুল সেই সময়কার মোশন কন্ট্রোল ফটোগ্রাফি দিয়ে অজানা ইউ.এফ.ও যানের দুর্ধর্ষ সব ফ্রেম বানিয়েছিলেন। আর তার সাথে যথাযথ সঙ্গত করেছিলেন ক্যারল র‍্যামবল্ডি যিনি ভিনগ্রহী প্রাণীদের অনবদ্য সব মডেল তৈরি করেছিলেন। মনে রাখা দরকার সে সময় কিন্তু এখনকার মতো টেকনোলজি বিশেষ করে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সুবিধা ছিল না আর খরচ বেড়ে যাচ্ছে দেখে স্পিলবার্গ নিজেও সামান্য কিছু দৃশ্যেই মাত্র গ্রাফিক্সের কারসাজি রাখতে পেরেছিলেন। এছাড়া ছিল অনবদ্য ম্যাট পেইন্টিং সিকুয়েন্সগুলো যা দিয়ে স্বপ্নের মতো কিছু ফ্রেম বানানো হয়েছিল। এই ছবির সংগীতে জেমস হর্ণার গল্পের টানটান মেজাজটাকে যথাযথ ধরে রেখেছিলেন। এর আগেই ১৯৭৫ সালে তৈরি বিখ্যাত জস্ ছবির জন্য তিনি অস্কার পেয়েছিলেন। আর এই ছবির বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে উত্তেজনা, ভয়ের যে আভাসগুলো লুকিয়ে আছে তার সার্থক সাংগীতিক প্রকাশ ছিল হর্ণারের সুরের মূর্ছনা। ১৯৯৮ সালে এই ছবির ডিজিটাল রেস্টোরেশন্ হয়ে যে সংস্করণ বেরোয় সেখানে এই ছবির আবহকে সংগীতকেও ডিজিটালি পুনরুদ্ধার করা হয়।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

CLOSE - BARRY GUILER - NIGHT INTERIOR

Four year old Barry is having a restless night. A gentle breeze flares his bangs. A WHIRRING SOUND interrupts this. Little Barry's eyes come open as a soft red glow plays on his face.

WHAT HE SEES . . . . .

On the nightstand next to his bed, one of Barry's battery toys has come on. It is a Frankenstein monster who raises his hands as if to strike when its pants fall down and its face blushes bright red.

Barry sits up in bed and looks around him.

THE BEDROOM

All of his battery toys are working in different places around the room. Tank, rocket ship, police car, 747, drunk chugging brew.

PHONOGRAPH - CLOSE

Playing a scratchy "Sesame Street" record .... softly.

Barry gets out of bed and looks out the window. In the distance the SOUND of barking dogs. The backyard is dark and utterly still.

এই ছায়াছবির চিত্রনাট্যের একটা অংশ

বিখ্যাত চিত্র সমালোচকদের মতে শুধু কল্পবিজ্ঞান নয় এমনকি নানা ধর্মীয় আর দর্শনের চিহ্ন লুকিয়ে আছে এই ছবির গল্পের বয়ানে। যেমন অনেকে দাবী করেছেন যে ডেভিলস্ টাওয়ারের আদলে আসলে বাইবেলে বর্ণিত সিনাই পর্বতের কথাই বলা হয়েছিল যেখানে মোজেস্ ঈশ্বরের দশটা প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। যাইহোক তারা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই ছবির গল্প বলার ধরণ বা ন্যারেটিভকে। এমনকি পৃথিবীর অন্যতম সেরা চলচ্চিত্রকার জঁ রেনোয়াঁ পর্যন্ত এই ছবি দেখে স্পিলবার্গের তুলনা করেছিলেন জুল ভার্ণে বা জর্জেস মেলিয়ের মতো দিকপালদের সাথে। বিখ্যাত কল্প বিজ্ঞান লেখক রে ব্র্যাডবেরীর মতে এই ছবি ছিল তখনও তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র।

ভিনগ্রহী যানের এক অসামান্য দৃশ্যায়ন

মহৎ স্রষ্টাদের মধ্যে হয়তো চিরকাল একটা শিশু লুকিয়ে থাকে। এই ছবির চিত্রায়নেও আমরা স্পিলবার্গের মধ্যে সেই শিশু সুলভ অপার বিস্ময় লক্ষ্য করি। যে বিস্ময় নিয়ে চারিদিকের সব কিছু এমনকি অজানা জগতের মধ্যেও কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যাওয়া যায়। আর এখানেই এই ছায়াছবি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের আসন নিয়ে আজও আমাদের মন জুড়ে আছে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রবন্ধঃ

স্থানঃ হালিশহর

কালঃ ২০১৭

পাত্রঃ ছাত্রী ও শিক্ষিকা

|| ৩ক ||

- আজ কীসের গল্প বলবে?

- আজ কোন গল্প নেই।

- মুসা বা নিমোর মতন কেউ নেই? (অগ্নিপথ ও অগ্নিপথ ২ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)

- না।

- তুমি ভুলে গেছ?

- কী ভুলব?

- কীসের গল্প আজ শোনাবে সেটা?

- আরে আজ কোন গল্পই বলব না। তোমার কাকা আজ তোমায় নিতে আসবে বলছিলে না?

- হ্যাঁ, সে তো দেরী আছে।

- বেশি দেরী নেই।

- কাকা আসার মধ্যে একটা গল্প হয়ে যাবে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

- না, হবে না। বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।

- তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

- যা ব্বাবা! রাগলাম কই?

- তাহলে ব্লাশ করছ কেন? লজ্জা পাচ্ছ না কি?

- উফ্‌ফ্‌ফ্‌... এই মেয়েকে নিয়ে না... (আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা শোন, একটা গল্প...

- ইয়ায়ায়ায়ায়া...

* * * * *

- সে বহুকাল আগের কথা...

- কতকাল?

- উমমম... ধরো ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ... সেই সময়ের মিশর এক অসাধারন জায়গা। সবচেয়ে আগে মানুষের যে সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল, মিশর তার মধ্যে অন্যতম।

- নীল নদের তীরে?

- হ্যাঁ... তাদের প্রধান খাদ্য কি ছিলো বল তো – রুটি। তারও হাজার দুয়েক বছর আগে রুটি মানুষে খেত। কিন্তু তা আজকের মতন না। মানে সেঁকা নয়। আটা বা ময়দা জাতীয় জিনিস দিয়ে এমনি শুকিয়ে তৈরী হত সেই রুটি। মানুষে তাই খেত। কিন্তু মিশরীয়রা তো জানোই কত বুদ্ধিমান মানুষ ছিল। তারা দেখল যে, নাঃ এভাবে তো রুটি ভাল লাগছে না আর খেতে। অন্যরকমভাবে বানাতে হবে-

- এটা গল্প হচ্ছে?

- মানে?

- আগেরবারের মত গল্প না বলে এরকম ভাবে বলছ কেন? কাকা'র আসতে অনেক দেরী আছে।

- আচ্ছা আচ্ছা তোমাকে আর বাক্যি ফলাতে হবে না, শোন তাহলে...

* * * * *

সে বহুযুগ আগের কথা। মিশরের কোন একটা শহরে রিমা নামে এক মহিলা ছিল। তার ছিল তোমার মতন এক দুষ্ট মেয়ে। তার নাম তিষা। সে এতই দস্যি মেয়ে ছিল যে, সারাদিন বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। আর তার দুরন্তপনায় সারা গ্রাম তোলপাড়। রিমা ঘরে রুটি বানাত আর তিষার বাবা শহরে বেচতে যেত সেই রুটি। তার বানানো রুটি খুব সুন্দর ছিল বটে, যদিও সবাই তার রুটির প্রশংশা করত, কিন্তু তিষা একদম খেতে চাইত না। সে বলত, না মা, তোমার রুটি আমার গলায় আটকে যায়। তুমি অন্যরকম রুটি বানাও। আমি খেতে পারি না।

তিষা খুব দস্যু মেয়ে ছিল বলে রিমা তার কথায় খুব একটা পাত্তা দিত না। কিন্তু একদিন রুটি তিষার গলায় আটকে গিয়ে একেবারে যা তা কান্ড। ডাক্তার নিদান দিলেন, উহু, বেশি শক্ত এবং আঠালো রুটি তিষাকে খেতে দেওয়া চলবে না। ওর গলা খুব সরু আর পাতলা, ওকে নরম আর ছোট রুটি দিতে হবে।

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

রিমা পড়ল ভাবনায়। কী করা যায়? কীভাবে রুটি বানানো যায়। মেয়েটা রোজ ঘ্যানঘ্যান করে, খেতে চায় না। আগে পাত্তা দিত না খুব একটা। কিন্তু এখন তো পাত্তা না দিয়ে আর উপায় নেই। কী করা যায়। কিছু একটা উপায় বার করতে হবে।

আগুনের আলোয় রাতে বসে বসে রুটি করতে করতে দিনরাত ভাবে রিমা। রোজ ভোরে রুটি নিয়ে তার বর যায় বাজারে। ভোররাতে উঠে রুটি বানিয়ে দিতে হয় তাকে। আজকাল বড় অন্যমনস্ক থাকে বলে মাঝে মাঝেই রুটির পরিমান কমবেশি হয়ে যায়। হয় রুটি নষ্ট হয়, না হলে আবার বানাতে বসতে হয়।

একদিন তো এই নিয়ে তার বরের সঙ্গে ঝগড়াই হয়ে গেল। রাগের চোটে শেষের রুটিটা ছুড়েই মারল বরের দিকে। লাগল না বটে। কিন্তু বর ব্যাটা আর ঘাটাল না তাকে।

সকালে ঘর পরিস্কার করতে গিয়ে রিমা অবাক হয়ে গেল। এটা কিরকম ব্যাপার হল! রুটিটা ঠিক পোড়ে নি, কিন্তু আগুনের তাতে বেশ নরম হয়ে রয়েছে। বেশ নরম। আর ফোলা ফোলা। একটু মুখে দিয়ে খেয়ে দেখল রিমা। দারুন খেতে লাগল। আগেকার রুটির মতন শক্ত নয়। বেশ নরম আর খেতে খুব সুস্বাদু। ইস্ট মেশানো তার হাতের রুটি এমনিতেই বিখ্যাত। এখন আগুনের তাতে তা ফুলেফেঁপে চমৎকার নরম আর মিস্টি হয়েছে। কিন্তু আধপোড়া।

কী করা যায়? কী করে রুটি সেঁকা যায়?

রিমা সারাদিন আগুনের ছাইয়ের পাশে বসে ভেবেই গেল। আধপোড়া রুটিটা তিষাকে চেটেপুটে খেতে দেখে তার চোখে জল এসে গেল। অনেকদিন বাদে মেয়েটা এত তৃপ্তি করে খেল।

সন্ধ্যেবেলার মধ্যে মাটি দিয়ে ছোট একটা চৌবাচ্চা বানাল রিমা। তার নীচে খুব সাবধানে গর্ত খুঁড়ে তার থেকে মাটি সরিয়ে নিল। চৌবাচ্চার ওপরে অনেকগুলো চ্যাপ্টা বড় পাথর রাখল। নীচে কাঠ গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বালালো ভাল করে। তারপর তেতে ওঠা পাথরের তাওয়ায় রুটি নিলো সেঁকে। দেখতে দেখতে রুটি ফুলে উঠে নতুন রূপ নিল...

রিমারা আজ বড়লোক। স্বয়ং ফারাও আর তার রাণী তাদের তৈরী রুটি খায়। তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধির বাবুর্চি। আর তিষারও খাওয়ার সমস্যা মিটেছে...

॥ ৩খ ॥

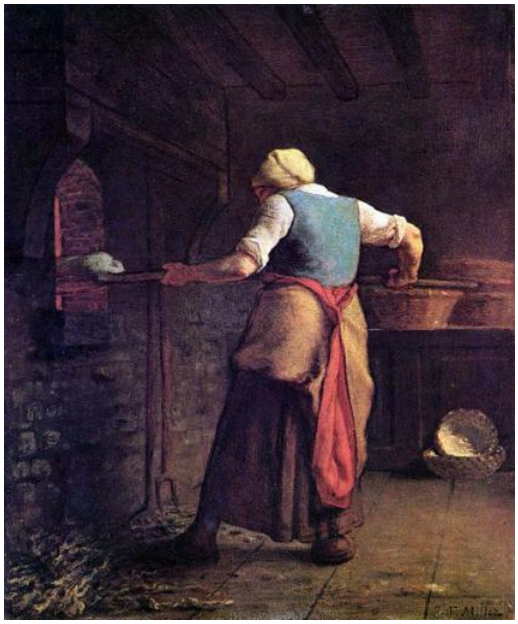

চিত্র ১: উনোন - জিন ফ্রাঙ্কোইস মিলেটের তুলির ছোঁয়ায়

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

উনানের আবিষ্কার মোটামুটি ২৯,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই হয়ে গিয়েছিল, মানে ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল আর কি। ওই ম্যামথ পুড়িয়ে খেতে গিয়ে বেশ বড় রকমের অগ্নিকুন্ডের প্রয়োজনে মাটিতে গর্ত খুড়ে উনান বানানোর চল শুরু হয়ে গিয়েছিল আদিম মানবের মধ্যে। ২০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইউক্রেনের অধিবাসীরা কয়লার ব্যবহার শুরু করে দেয়। যে খাবার সুসিদ্ধ করা হবে তা পাতা দিয়ে মুড়ে উনানের খানিকটা ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হত। এরপরে মহেঞ্জোদাড়োর অধিবাসীরা আর মিশরীয়রা তাদের ঘরাণায় উনানের ব্যবহার এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের ঘরে ঘরে একটা করে মাটির উনান ব্যবহৃত হত।

চিত্র ২: পোর্টেবল উনান, গ্রীস

প্রথম পোর্টেবল উনান ব্যবহার করে গ্রীকরা। উন্নত মানের ভাপানো রুটি তৈরীর মুন্সিয়ানা এরাই প্রথম দেখায়। এরপর সেরামিক উনানের ব্যবহার দেখা যেতে শুরু করে। মধ্যযুগে ইউরোপের অধিবাসীরা ফায়ারপ্লেসের ব্যবহার শুরু করে। ডাচ উনানও অনেকটা এইরকমের হতে শুরু করে এই সময় থেকেই। উনানের জ্বালানীরও অনেক পরিবর্তন হয় আস্তে আস্তে। কাঠ, কয়লা, গ্যাস হয়ে সবশেষে ইলেকট্রিক। উনান বা ওভেনের রকমফের যেক'টা পাওয়া যায় তা হল – মাটির উনান, সেরামিক উনান, গ্যাস ওভেন, মেসনারি ওভেন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং ওয়াল ওভেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন শিল্পক্ষেত্রে, ল্যাবরেটরিতে বা বড় রান্নাশালায় ওভেন বা উনানের আকার ও আকৃতির প্রভেদ দেখা যায়। আর তাছাড়া বর্তমানে অপ্রচলিত শক্তি উৎসের বিভিন্ন উনান দেখা যায় – সোলার ওভেন যার অন্যতম।

বেশ কিছু উনানের সম্পর্কে এবার একটু জেনে নেওয়া যাক। Double Oven –এর বাংলা কি হতে পারে? দোতলা উনান? কিম্বা দ্বৈত উনান – সে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, মোট কথা দুটো উনান একত্রে ব্যবহার করা হয়। অতীতে দুটো উনান হলেও বর্তমানে একটা চুল্লীর সাথে একটা মাইক্রোওভেনও যুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ৩: মাটির উনান, বাংলাদেশ

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

যে উনান আমরা একটু বয়স্ক মানুষেরা খুব 'মিস' করি তা হল মাটির উনান। পিঠে পার্বনের দিনে সরা পিঠা বা ভাপা পিঠার কথা যাদের মনে আছে, তার জানেন যে মাটির উনানের কী মাহাত্ম্য। সরা পিঠার গায়ে লেগে থাকা পোড়া কাঠের গন্ধ আজও মন মেদুর করে দেয়। একদম যে আমরা এই ধরনের উনান দেখি না তা নয়। একটু গ্রামাঞ্চলের দিকে গেলেই এই ধরনের উনান দেখা যায়। আর তাছাড়া বিরিয়ানী রান্না করতে গেলে তো কাঠের উনান অবশ্যম্ভাবী। আর এখনো দল বেধে নদীর চড়ায় যারা পিকনিক করতে যান, তারা জানেন যে, মাটির তৈরী উনান কতটা প্রয়োজনীয় সেই মজার সময়টাতে। এহেন উনান পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জায়গাতেই পাওয়া যায়। সূদুর অতীতকাল যদি আমরা যাই তো দেখতে পাবো নেটিভ আমেরিকান থেকে শুরু করে এশিয়া হয়ে সুদুর অস্ট্রেলিয়া – সব জায়গাতেই এর পর্যাপ্ত ব্যবহার। তবে বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে এর নামকরণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। চিলিতে এর নাম 'কুরান্টো'; আমেরিকায় 'কাম বেক'; মরোক্কোয় 'তান্দির' (আস্ত ভেড়া রান্না হয়ে যেত এতে); হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে 'কালুয়া'; প্রোটো-ওশিয়ানিক অঞ্চলে 'উমু'; ফিজিতে 'লোভো'; পাপুয়া নিউগিনি'তে 'মুমু' ইত্যাদি ইত্যাদি আরোও কত নাম...। বেদুইনরা তো ছোট ছোট মাটির পোর্টেবল উনান বানিয়েই নিয়েছিল, যেখানেই যেত সেখানেই এই উনান হত সঙ্গী, সে মানুষ একাই যেত, কিম্বা পরিবার সমভিব্যহারে। এতে মূলত রুটি বানাতেই কাজে লাগত।

৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিন্দু প্রদেশের অধিবাসীরা মাটি পুড়িয়ে বা নানান ধরনের সেরামিক দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতির উনান বানাতো। অবশ্যই এই আকার বা আকৃতি নির্ভর করত কি ধরনের উৎসবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর। আবার ইটের তৈরী উনান বা সেরামিক উনান এই অঞ্চল ছাড়াও ইতালীতেও ব্যবহৃত হত। আসলে পিজা বানানোর ইতিহাসের সাথে এই সেরামিকের উনান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জাকাউস উইনজিয়ার, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এক নৈশভোজের পার্টিতে প্রথম গ্যাস স্টোভ ব্যবহার করেছিলেন বলে শোনা যায়। মানব ইতিহাসের সর্বপ্রাচীন গ্যাস স্টোভের ব্যবহার এটি। ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস শার্প প্রথম গ্যাস ওভেন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা শুরু করেন। ১৮৫১ সালে তো গ্যাস স্টোভ রীতিমতো এক প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল, যা জনমানসে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। আর এখন গ্যাসের উনান বাড়ী বাড়ীতে দেখা যায়।

চিত্র ৪: ম্যাসনারি ওভেন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ম্যাসনারি ওভেন, বা ইটের/পাথরের তৈরী উনান। এতে একটা চেম্বারই থাকে যেখানে জ্বলে আগুন। এই আগুন কাঠ বা কয়লা দিয়ে জ্বালানো হত মূলত ১৯ শতকে। বর্তমানে তো প্রাকৃতিক গ্যাস বা তড়িৎ-এরও বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বাণিজ্যিকভাবে রুটি বা পিজা তৈরীতে এর ব্যবহার লক্ষনীয়।

মাইক্রোওয়েভ ওভেন, বা টোস্টার ওভেন সম্পর্কে খুব একটা কিছু বলছি না। কারণ এই ধরনের উনানের সঙ্গে আমরা এখন বেশ ভাল করেই পরিচিত। প্রথোমোক্ত ওভেনে মাইক্রো রেডিয়েশান আর দ্বিতীয়োক্ত ওভেনে তড়িৎ ব্যবহৃত হয়, আমরা সকলেই জানি।

বাণিজ্যিক, ল্যাবরেটরি, বা শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত হয় ব্লাস্ট ফার্নেস, কিন, অটোক্লেভ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওভেন ইত্যাদি। গ্লাস উৎপাদনে, বা কোন ধাতু গলানোর কাজে ব্লাস্ট ফার্নেস অপরিহার্য। জ্বালানী হিসাবে সাধারণত কয়লার ব্যবহার দেখা যায় এতে। সিমেন্ট তৈরীর কারখানায়, কাঠ শুষ্কীকরণ, বা সেরামিকের কাজে লাগে কিন (Kiln)। অত্যন্ত উচ্চ উষ্ণতা এর মধ্যে সৃষ্টি করা যায়।

এই হল মোটামুটি অগ্নিচুল্লীর ব্যাখ্যান। আরোও অনেক কথা বাকী রইল। তা থাক। ভবিষ্যতে যদি কোনভাবে আবার চুল্লীর কথা উত্থাপনের সুযোগ হয়, সেক্ষেত্রে না হয় আবার বসা যাবে কথা নিয়ে...

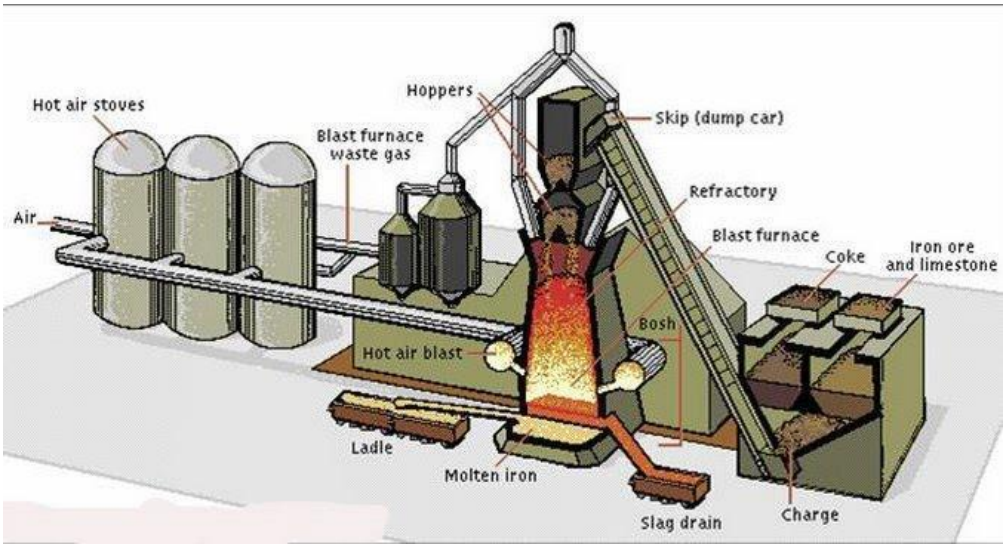

চিত্র ৫: ব্লাস্ট ফার্নেস

|| ৩গ ||

- টা টা আন্টি...

- টা টা...

- আসলাম।।

সময় শেষ হয়... একসময়ে এই সময়ও শেষ হল...

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ছাত্রীকে নিয়ে তার কাকা বাইকে করে পথের ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। আশেপাশের একরাশ লোক দেখতে পেল না, শিক্ষিকার গালে লাল আভা। ছাত্রী দেখতে পেল বাইকের কাঁচে তার আন্টির চেহারা আস্তে আস্তে লোকারণ্যে মিশে যাচ্ছে। কেবল জাজ্বল্যমান হয়ে থাকছে চালকের হৃদয়ে।

[ক্রমশ]

[সব চরিত্র কাল্পনিক]

অলঙ্করণঃ সুমন দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রবন্ধঃ

"প্রকৃতি আমাদের সিংহের লেজের ডগাটা শুধু দেখতে দেন। গোটা সিংহটা আসলে এত বড় যে সেটা একবারে দেখা সম্ভব নয়।"

ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরির অনুসন্ধানে ত্রিশটি ব্যর্থ বছর কাটাবার উপলব্ধির সারসংক্ষেপ বলা যায় এই বহু-চর্চিত উক্তিটাকে। ব্যর্থ বিজ্ঞানীটির নাম আইনস্টাইন। ব্যাপারটা একটু ভেঙে বলা যাক।

একেশ্বরবাদের তত্ত্ব ও বিশ্বাস মানুষের সভ্যতায় পুরোনো দিন থেকেই চলে আসছে। প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর দিকে চোখ ফেলে দেখুন, তাদের প্রায় প্রতিটিতেই একেশ্বরবাদ প্রধান জায়গাটি দখল করে রেখেছে। তার মূল কথাটি হল, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আমরা তাঁর একই রূপের নানান বহিঃপ্রকাশ দেখি মাত্র।

বিশের শতকে এসে আধুনিক বিজ্ঞানও সেই একই কথা নতুন করে বলল। তার দাবি হল, মহাবিশ্বে, মহাকাশে যা কিছু অনুভুতিগ্রাহ্য রয়েছে তা একই আদিশক্তির বহুরূপী বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

তবে, ভক্তিমার্গের প্রশ্নহীন বিশ্বাসের পথে বিজ্ঞান হাঁটে না। তাই একেশ্বরবাদের যে ধার্মিক পথে যুগ যুগ ধরে বিশ্বাসীরা নির্বিবাদে হেঁটে গিয়েছেন, বিশ শতকের নতুন ধর্ম বিজ্ঞানও যখন সেই একেশ্বরবাদের উপপাদ্যকে তুলে আনলো তার অংকের খাতায় তখন কিন্তু বিজ্ঞানধর্মা মানুষেরা তার প্রমাণ চেয়ে বসল। অতএব শুরু হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এক অনুসন্ধানের। বস্তু ও শক্তির বহুরূপে বিদ্যমান ব্রহ্মাণ্ড যে একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে সেই প্রথম আদিশক্তিকে। যুক্তি ও গণিতের আলোকবর্তিকাকে সম্বল করে এক অজানা অন্ধকারের দেশে পা বাড়ালেন বিজ্ঞানীরা। সেখানে পদে পদে ভুল করবার সম্ভাবনা। আজ যাকে সত্য মনে হয় , কাল প্রমাণ হয় তা ছিল মায়ামাত্র। এক একজন মানুষের সারাজীবনের গবেষণা ও আবিষ্কার নিমেষে অর্থহীন হয়ে যায় কোনও অনুজ বৈজ্ঞানিকের একটি ছোট্ট আবিষ্কারে।

অবশ্য এই যাত্রা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষদিক থেকেই। ১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল এক যুগান্তকারী গবেষণাপত্রে প্রমাণ করলেন যে তাড়িতিক ও চৌম্বকীয় বল আসলে একটিই বল, যা হল, আলোর গতিতে ছোটা তড়িচ্চুম্বকীয় বল বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স। তাঁর দেখানো সেই একীভবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বিজ্ঞান প্রমাণ করল, মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তার সবই মূলত চারটে শক্তির বহিঃপ্রকাশমাত্র। তারা হল, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি (আলো, রেডিও তরঙ্গ, চুম্বকের শক্তি, সকলেই তার নানা রূপ), উইক ফোর্স (তেজস্ক্রিয়তার সময় পরমাণুর কেন্দ্রক থেকে ইলেক্ট্রনের স্রোত বা বিটা রশ্মি নির্গত হয় যে শক্তির ফলে। একে বলা হয় বিটা ডিকে বা বিটা ক্ষয়) স্ট্রং ফোর্স (যে শক্তির বলে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রোটনদের সম-তাড়িতিক বিকর্ষণকে অতিক্রম করে পরমাণুর কেন্দ্রক নিজেকে ভেঙে যাবার হাত থেকে বাঁচায়), ও নিউটন আবিষ্কৃত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত রহস্যময় শক্তি মহাকর্ষ।

কাজেই আদিশক্তির অনুসন্ধান এবারে সীমিত হল চারটে মাত্র শক্তিকে একীভূত করবার গবেষণায়। বিজ্ঞানী জীবনের ত্রিশটা বছর এই কাজে দিয়েছিলেন আইনস্টাইন। সফল তিনি হননি, তবে সমস্যার প্রকৃত রূপটাকে আইনস্টাইন কিন্তু চমৎকার ধরেছিলেন তাঁর ওই উক্তিটিতে।

বিজ্ঞানদেবতার পূজারিরা অবশ্য হতাশ হননি। উত্তর-আইনস্টাইন যুগে তাঁরা চেষ্টা চালাতে লাগলেন নতুন নতুন পথে, নতুন নতুন ধারণা ও উন্নততর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে।

এপ্রিল ১৮, ১৯৫৫ তারিখে আইনস্টাইনের মৃত্যু হল। এর বছর দুয়েক পরে, ১৯৫৭ সালের পাদুয়া ভেনিস কনফারেন্সে এক তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী, রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশ করলেন, উইক ফোর্সের বাহক বিটারশ্মি নিষ্ক্রমণের জন্য দায়ী বল-এর চরিত্রের এক নতুন ব্যাখ্যা। সুদর্শন ও মারশাকের দেয়া এই নতুন তত্ত্বের নাম ভি-এ তত্ত্ব। এরপর, সেই ব্যাখ্যার ওপরে ভিত্তি করে এবার শুরু হল উইক ফোর্সের জন্য একটা কোয়ান্টাম তত্ত্বভিত্তিক ব্যাখ্যা তৈরির কাজ। এর আগে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের কোয়ান্টাম প্রতিরূপ (কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিকস বা সংক্ষেপে কিউ ই ডি) তৈরি হয়ে গেছে ৪০-এর দশকেই। এবারে উইক ফোর্সের জন্যও সেই পথেই কাজ এগোলো। (তাত্ত্বিক ভাষায় একে বলা যায় উইক ফোর্সের জন্য একটা গজ থিওরি তৈরি করা। গজ থিওরি এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তবে উৎসাহী পাঠকের যদি উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কলনবিদ্যা ও স্থানাংক জ্যামিতির জ্ঞান থাকে তাহলে গজ থিওরির সরল ব্যাখ্যার জন্য এই সুন্দর লেখাটি পড়ে দেখতে পারেন-- http://terrytao.wordpress.com/2008/09/27/what-is-a-gauge/)

কাজটা করবার জন্য যে গাণিতিক প্রমাণগুলো করা দরকার ছিল তা করতে গিয়ে ষাটের দশকে গ্লাসো, সালাম ও ওয়েইনবার্গ আলাদা আলাদাভাবে দেখালেন যে এমন একটা মডেল তৈরি করা সম্ভব, যদি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তিকেও সে মডেলের একটা অংশ হিসেবে নেয়া যায়। তাঁদের মডেল দেখাল যে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ও উইক ফোর্স আসলে একটিই মূলশক্তির দুটি রূপ। তার প্রথমটি ভরহীন ফোটন কণাবাহিত হওয়ায় কাজ করে মহাজাগতিক স্কেলের দূরত্বে। আর দ্বিতীয়টির চলৎশক্তি তার এক কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। তা কাজ করে পারমাণবিক দূরত্বের অতিক্ষুদ্র স্কেলে। ডবলু ও জেড বোসন নামের যথাক্রমে ৮০ ও ৯০ বিলিয়ন ইলেক্ট্রনভোল্টের তুল্যমূল্য ভরের দুটি অতিশয় ভারী মূলকণা তাদের বাহক হবার দরুন তাদের এহেন শ্লথগতি।

সাধারণ তাপমাত্রায় এরা দুটি নিতান্তই অসম-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বল হলেও, অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (১০০ বিলিয়ন ইলেক্ট্রনভোল্ট শক্তিস্তরে, বা, $১০^{১৫}$ ডিগ্রি (একের পিঠে পনেরোটা শূন্য) কেলভিন তাপমাত্রায় এরা কিন্তু একই শক্তিতে পরিণত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে এই তাপমাত্রা তৈরি হয়েছিল মাত্র একবারই, মহাবিস্ফোরণে বিশ্বসৃষ্টির

$১০^{-১২}$ সেকেন্ডের মাথায়। অর্থাৎ তার আগে, সময়ের শুরুর থেকে ওই সময়-মুহূর্ত পর্যন্ত যতক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা ওর থেকে বেশি ছিল ততক্ষণ ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ও উইক ফোর্স ছিল একটাই বল। তারপর ব্রহ্মাণ্ড যেই সে তাপমাত্রার থেকে আরো ঠাণ্ডা হল অমনি ব্রহ্মাণ্ডের সেই সুষম রূপটা নিজেনিজেই ভেঙে গিয়ে সেই শক্তি থেকে তৈরি হল আলাদা আলাদা ভরের কণায় বাহিত বলের দুটো আলাদা রূপ। সৃষ্টি হল বৈষম্যের। আদিশক্তি নিজেকে ভেঙে এক থেকে একাধিক হলেন।

কিন্তু কেন এমন হল? একই শক্তি যখন ভেঙে দুই রূপ নিলো তখন তাদের বাহক কণাদের ভর (বা শক্তি) এত আলাদা হয়ে গেল কী করে? বিজ্ঞানীরা এর সদুত্তর দেবার জন্য যে অন্য মূলকণার অস্তিত্বর প্রস্তাব দিয়েছেন তার নাম হিগস বোসন। তাঁদের মতে, এই হিগস বোসনের প্রভাবেই অতো ভারী হয়ে উঠেছিল ডবলু ও জেড বোসন। তাঁদের তত্ত্ব বলে, যাবতীয় মূলকণাদের ভর দেবার জন্য দায়ী এই হিগস বোসন। তাই যদি হয় তাহলে মহাবিস্ফোরণের পরের সেই ভরহীন আদিশক্তির মহাকুণ্ড থেকে বস্তুময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তবে হতে পেরেছিল এই হিগস বোসনের কল্যাণে! বিজ্ঞানীরা তাই একে সসম্ভ্রমে নাম দিয়েছেন গড পার্টিকল বা ঈশ্বরকণা।

১৯৮৩ সালে ডবলু ও জেড কণাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবার চার দশক বাদে ২০১৩ সালে এসে বিজ্ঞানীরা এরকম একটি মূলকণার দেখা পেলেন যার ধর্ম হিগস বোসনের সঙ্গে মেলে। জেনিভার কাছে বসানো সতেরো মাইল লম্বা অতি শক্তিধর লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার আর তার অ্যাটলাস নামের পার্টিকল ডিটেকটার যন্ত্রে কিছু যুগান্তকারী পরীক্ষানিরীক্ষা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য জুগিয়েছে। ২০১৫ সালের মে মাসে

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এই নতুন পাওয়া কণার ভরের একটা নিখুঁত আন্দাজ দেয়া হয়। দেখা যাচ্ছে সে ধর্মের মাপজোক হিগস বোসনের প্রস্তাবিত মাপজোকের সঙ্গে মিলেও যাচ্ছে।

১৯৭৯ সালে ইলেক্ট্রোউইক তত্ত্বের জন্য নোবেল পুরষ্কার পেলেন সালামরা তিনজন। কিন্তু যে মূল ভি এ তত্ত্বের ওপর ভর করে তাঁদের এই আবিষ্কার, তার প্রবক্তা ভারতীয় বিজ্ঞানী সুদর্শন কিন্তু নোবেল পুরষ্কারের থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন আজও।

চার আদিশক্তির দু'জনকে মিলিয়ে দেবার পর এইবারে কাজ চলেছে ইলেক্ট্রোউইক ফোর্স আর স্ট্রং ফোর্সের একীভবনের জন্য। সেটি যখন সম্ভব হবে,তা হবে ইলেক্ট্রোনিউক্লিয়ার ফোর্স বা গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি। ১৯৭০ শেলডন গ্লাসো এবং হাওয়ার্ড জর্জি প্রস্তাব করেছিলেন, $১০^{২৭}$ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় সেই একীভবন ঘটতে পারে। সৃষ্টির $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড পরের সেই তাপমাত্রা তৈরি করা এখনও মানুষের সাধ্যের বাইরে। কাজেই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া আজও সম্ভব হয় নি। স্ট্রং ফোর্সের বাহক যে গ্লুওন নামের কণা তার অস্তিত্বের কিছু পরোক্ষ প্রমাণ মিললেও (উৎসাহী পাঠক এ জন্য দেখে নিন থ্রি জেট ইভেন্ট। ১৯৭৯ সালে প্রথম।) তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের প্রমাণ আজও অধরা রয়ে গেছে।

এই বাধাটা পার হলে তারপর তার সংগে মেলাতে হবে মহাকর্ষের শক্তিকে। তবে গিয়ে আমরা নাগাল পাব স্বপ্নের তত্ত্ব থিওরি অব এভরিথিং-এর। বৈজ্ঞানিকের অংকের খাতা প্রমাণ দেবে ব্রহ্মাণ্ডের একোমেবঅদ্বিতীয় ঈশ্বরশক্তির।

তবে, সেটা করতে গেলে প্রথমে জানতে হবে মহাকর্ষ বস্তুটা কী? এই মুহূর্তে মহাকর্ষের সর্বজনগৃহীত ব্যাখ্যাটা রয়েছে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাকর্ষ হল দেশকালের (স্পেস-টাইম) একটি বিশেষ জ্যামিতিক ধর্মমাত্র। ভরের উপস্থিতি দেশকালের বিস্তারের গড়নে স্থানে স্থানে বিকৃতি আনে। এই বিকৃতি, কাছাকাছি অন্যান্য ভর, আলো এমনকি সময়কেও প্রভাবিত করে। এই প্রভাব দূরত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুনির্দিষ্ট হারে কমতে থাকে। সাদা কথায় এই হল মহাকর্ষের আইনস্টাইনীয় চেহারা।

ওদিকে আমরা দেখছি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কীভাবে চার মূলশক্তির তিনটিকে একীভবনের পথে এগিয়ে গিয়েছে। তাহলে এই তিনের সঙ্গে মহাকর্ষকে জুড়তে গেলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তত্ত্ব দিয়ে মহাকর্ষের একটা মডেল তৈরি করা দরকার। কাজটা করবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা যেটা আসছে সেটা হল, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার যে মূলশক্তিদের ব্যাখ্যা দেয় তারা মূলত কাজ করে পারমাণবিক স্তরে। অন্যদিকে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যে মহাকর্ষবলের কথা বলে তার প্রভাব পরে গ্রহতারাদের মত বড় বড় বস্তুদের এলাকায়।

বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেছেন, অন্য তিনটে বল যেমন ফোটন,ডবলু বা জেড বোসন কিংবা গ্লুওন নামের বিভিন্ন বাহক কণা বা মেসেঞ্জার পার্টিকলের ওপরে নির্ভর করে কাজ করে, মহাকর্ষও তেমন কাজ করে একধরণের ভরহীন বাহক মূলকণার ওপর ভর করে। তাকে নাম রাখা হয়েছে গ্র্যাভিটন। এই কাল্পনিক কণার এখনও কোন বাস্তব হদিশ মেলেনি। প্রশ্ন উঠবে কেন মেলেনি? কারণটা বোঝাতে গেলে একটা সহজ পরীক্ষা করা যাক। একটা আলপিন নিন। সেটাকে এত বড়ো পৃথিবীটা নিজের দিকে টানছে। যদি গ্র্যাভিটন থেকে থাকে তাহলে সেই গ্র্যাভিটন কণারা সেই টান তৈরি করছে। এবারে একটা দশ গ্রাম ওজনের ছোটো চুম্বকের গায়ে পিনটা লাগান। সেটা মাটিতে পড়বে না। দশ গ্রাম ওজনের একটা চুম্বক যে পরিমাণ শক্তি দিয়ে টানছে সেটাও তাহলে পিনটার ওপরে এত বড়ো পৃথিবীটার প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণকে ছাপিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। এইটাই সমস্যা। মহাকর্ষ আসলে বেজায় দুর্বল। কতটা দুর্বল সেটা অংকের হিসেবে দেখা যাক--একটা হাইড্রোজেন পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেকট্রনটার মধ্যে যে পরিমাণ তড়িচ্চুম্বকীয় বল কাজ করে, কণা দুটোর মধ্যে কার্যকরী অভিকর্ষ বলের চেয়ে সেটা কতগুণ বড়ো তা বোঝাতে একের পিঠে উনচল্লিশটা শূন্য দিতে হবে। সে এত দুর্বল বলেই তো সামান্য রাসায়নিক জ্বালানির ধাক্কায় যেটুকু শক্তি তৈরি হয় তাতেই অত বড়ো রকেটগুলো মাটি ছেড়ে উঠে মহাকাশে চলে যায়। এক একটা গ্র্যাভিটনের শক্তি তাহলে ঠিক কতটা দুর্বল তার একটা আন্দাজ এতে পাওয়া যাচ্ছে। অত দুর্বল শক্তির স্বাক্ষর খুঁজে পাবার মতন সংবেদনশীল যন্ত্র এখনও বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে।

তাছাড়া অন্য তাত্ত্বিক সমস্যাও রয়েছে মহাকর্ষকে এইভাবে কোয়ান্টাম বা কণা-চরিত্র দেয়ার মধ্যে। যেকোনো কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব সবসময় কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক প্যারামিটারের ওপর নির্ভর করে। এদের মান পরীক্ষার মাধ্যমে বের করে নেয়া যায়। মহাকর্ষকে এইভাবে গ্র্যাভিটন নামে কাল্পনিক কণা বাহিত বলে তার কোয়ান্টাম রূপ দিতে গেলে দেখা যাচ্ছে, তাতে অসীম সংখ্যক প্যারামিটার চলে আসছে। প্যারামিটারের সংখ্যা অসীম হলে তার শক্তির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট হিসেবই আর খাটবে না। অবশ্য কম শক্তিস্তরে যখন আমরা পরীক্ষা চালাব তখন যুক্তি বলছে, মাত্র নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক প্যারামিটারের মান বড় হবে আর বাকিদের মান হবে নিতান্তই তুচ্ছ, ও সেক্ষেত্রে এই কোয়ান্টাম মহাকর্ষ আইনস্টাইনের

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

জ্যামিতিক মহাকর্ষের সঙ্গে একই হয়ে যাবে, অতএব সেখানে সমস্যা থাকবে না কিছু। মহাকর্ষের একটা য়্যাপ্রক্সিমেট কোয়ান্টাম ব্যাখ্যা সম্ভব হবে। কিন্তু সমস্যা শুরু হবে শক্তিস্তর যখন খুব বেশি হবে। উচ্চ শক্তিস্তরে যখন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রভাব বেড়ে উঠবে তখন কিন্তু এই অসীমসংখ্যক প্যারামিটারের প্রতিটিই হয়ে উঠবে বেজায় গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু অসীমসংখ্যক প্যারামিটারের নিখুঁত হিসেব এক এক করে পরীক্ষার মাধ্যমে বের করে নেয়া সম্ভব নয় ফলে উচ্চ শক্তিস্তরে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব হালে পানি পাবে না।

স্বাভাবিকভাবেই, এহেন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আদিশক্তির খোঁজ কিছুটা থমকে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা নতুন কিছু নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বারংবারই এইধরনের অন্ধ-গলির মুখোমুখি হতে হয়েছে গবেষকদের। আর ঠিক তখনই আপাত-অনতিক্রম্য সেই বাধাকে অতিক্রম করবার জন্য মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি গড়ে নিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন পথ। যেমন ধরুন রাদারফোর্ডের পারমাণবিক মডেল। ওতে যে বিরাট সমস্যাটার মুখোমুখি হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা সেটা হল, ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন যত পাক মারবে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ততই সে হারাবে শক্তি, আর তার ফলে একসময় তার কক্ষপথ ছোট হতে হতে সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন্দ্রকের বুকে। শেষ হয়ে যাবে তার অস্তিত্ব। অথচ পরমাণু কখনোই এইভাবে ধ্বংস হয় না। বরং সুদীর্ঘকাল ধরে সুস্থিত থাকে তার কেন্দ্রক ও তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকা ইলেকট্রনের ঝাঁক। ক্লাসিক্যাল পদার্থবিদ্যার কাছে এ ধাঁধার কোন উত্তর ছিল না। তখন এর উত্তর খোঁজবার জন্য তৈরি হল সম্পূর্ণ নতুন এক বিজ্ঞান---কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। সেই নতুন বিজ্ঞান বলল, ইলেকট্রন ঘোরে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কোয়ান্টাম কক্ষপথে। আর সেইসব কক্ষপথে যখন তারা ঘোরে তখন তাদের কোনও শক্তি-ক্ষয় হয় না। এইভাবেই বাধার মুখোমুখি হয়ে মানুষ বারংবার বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার জন্ম দিয়েছে।

আদিশক্তির অনুসন্ধানের পথে এই যে মহাকর্ষের শক্তির সঙ্গে অন্য তিন বলের মিলনের পথে দুরতিক্রম্য বাধা, একে অতিক্রম করবার জন্য এই মুহূর্তে গড়ে উঠছে বিজ্ঞানের এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা। তার নাম স্ট্রিং তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বলে, তিন-মাত্রিক নয়, স্থান হল নয়-মাত্রিক, আর তার সঙ্গে সময়কে জুড়লে ব্রহ্মাণ্ড হল গিয়ে দশ-মাত্রিক। এর মধ্যে ছ'টা মাত্রা মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরেই গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গিয়েছিল আর গায়ে গতরে বেড়ে উঠেছিল বাকি চারটে মাত্রা, যাদের মধ্যে আমাদের বাস। আর এই দশ মাত্রার দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় অজস্র ছোট ছোট স্ট্রিং বা সুতো হেন কিছু অস্তিত্ব। দৈর্ঘ্যে তারা $১০^{-৩৫}$ মিটার। প্রতিটি স্ট্রিং থর থর করে কাঁপে আর আলোর গতিতে ঘুরপাক খায়। তার কাঁপুনির এক এক ধরণের শক্তি ও অভিমুখ হলে তা এক এক ধরণের মূলকণার জন্ম দেয়। তার কম্পাংকই হল বস্তুকণার ভরের পরিমাপ।এই স্ট্রিং আবার আসলে ব্রেন (মেমব্রেন-এর 'মেম'টুকু ছেঁটে ফেলে এই নাম)নামে এক ভৌত বস্তুর একমাত্রিক রূপ। উচ্চতর মাত্রায় তার নাম হবে মাত্রা অনুযায়ী ২-ব্রেন, ৩-ব্রেন---১০-ব্রেন এইভাবে। এই ব্রেন-রা কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র মেনে স্থানকালের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তাদের ভর আছে, এবং তাড়িতিক চার্জও থাকতে পারে।

এ যেন সৃষ্টিকর্তার রুদ্রবীণার সঙ্গীত। স্ট্রিংগুলি (বা ব্রেনগুলি) তাঁর বীণার তার যেন বা। তাতে এক একটি স্বরের ঝংকার জন্ম দেয় এক একটি মূলকণার, আর সেইসব সুরকণাগুলির সুষ্ঠু সজ্জায় সৃষ্টি হয় এক অনুপম মহাসঙ্গীতের, যার অন্য নাম দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আর, যখন এই ব্রেনরা ১০ মাত্রিক দেশকালের পটভূমিতে নিজেদের অবস্থান পালটায়, তখন স্থান ও সময় তাদের ঘিরে বেঁকে-চুরে যায় সাধারণ আপেক্ষিকতার অংকের হিসেব মেনে। তৈরি হয় মহাকর্ষ। আর এইভাবেই স্ট্রিং তত্ত্ব মূলকণাদের প্রবক্তা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর অভিকর্ষের ব্যাখ্যা দেয়া সাধারণ আপেক্ষিকতাকে ভারী সুন্দর ভাবে একীকরণের একটা রাস্তা দেখায় বিজ্ঞানীদের।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই স্ট্রিং-রা আসে কোথা থেকে? ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় বিজ্ঞানীরা পাঁচপাঁচটা আলাদা শ্রেণীর স্ট্রিং তত্ত্ব তৈরি করে বসেছেন যারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র অথচ প্রত্যেকেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও সাধারণ আপেক্ষিকতাকে বেশ সুষ্ঠুভাবেই মিলিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু কথা হল বিশ্ব ত একটাই। তাহলে এই পাঁচটা আলাদা আলাদা তত্ত্বের মধ্যে কোনটা আমাদের বিশ্বকে তৈরি করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ১৯৯৫ সালে এডওয়ার্ড উইটেন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রিং থিওরি কনফারেন্সে প্রস্তাব করেছেন এম - তত্ত্ব নামে এক রহস্যময় তত্ত্বের। এই তত্ত্ব বলে, বিশ্ব দশ-মাত্রিক নয়। তা হল এগারো-মাত্রিক। আর সেই এগারো-মাত্রিক দুনিয়ায় যে স্ট্রিংদের অস্তিত্ব কল্পনা করা হল, দেখা গেল, তার পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদ হল দশ-মাত্রিক বিশ্বের সেই পাঁচটা আলাদা জাতের স্ট্রিং তত্ত্ব। অর্থাৎ স্ট্রিংরা আদতে এগারো মাত্রার বাসিন্দা। দশ মাত্রার দুনিয়ায় তার পাঁচটা আলাদা আলাদা রূপভেদ দেখা যায় মাত্র। দশ মাত্রার দুনিয়াটা ধরুন একটা ঘর আর একাদশ মাত্রাটা হল তার বাইরের জগতটা। সেখানে বিরাট এক পাহাড় আছে। দশ মাত্রার ঘরের একটা জানালা দিয়ে দেখা যায় তার বরফ ঢাকা চুড়োটা, আরেক জানালা দিয়ে দেখি তার গায়ের একটা নদীকে, তৃতীয় জানালা দিয়ে দেখি গাছ ঢাকা তার একটা উপত্যকা। একাদশ মাত্রায়, অর্থাৎ ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে তখন তার গোটা রূপটা দেখা যাবে একসঙ্গে।বোঝা যাবে, দশ মাত্রার দুনিয়ায় বসে যে ভিন্ন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

ভিন্ন রূপগুলো দেখছিলাম তার, আসলে তা এক অভিন্ন দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র।

অংকের খাতায় এইসব সমাধান বের হলেও বাস্তবের পরীক্ষা নিরীক্ষায় হাতেকলমে এ তত্ত্বকে যাচাই করে নেবার মত যন্ত্রপাতি এখনও মানুষের নাগালের বহু বাইরে।কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে গভীর মহাকাশে স্বর্গ নামের অতি উন্নত বাসভূমির কথা কল্পনা করেছিলেন, তখনও তো তা সে সময়ের বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল একেবারে। অথচ সে কল্পনা করবার মাত্রই চার পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে মানুষ আজ হাতে কলমে মহাকাশে এবং গ্রহেগ্রহান্তরে বাসা বানাবার নকশা প্রায় ছকেই ফেলেছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে এগারো মাত্রার বাসিন্দা, সকল সৃষ্টির উৎস স্ট্রিং মহাপ্রভুদের দেখাও যে মানুষ পাবে সে ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিত। আর সেইদিন প্রমাণিত হবে ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তিই একটিমাত্র শক্তির রূপভেদ মাত্র। মানুষের জ্ঞানের গণ্ডিতে আসবে দেশকালের রহস্য। আজকের চতুর্মাত্রিক ব্রহ্মাণ্ডের জায়গায় মানুষ চিনতে পারবে একাদশ-মাত্রিক প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে।

প্রশ্ন হলো, ঐহিক লাভ কী হবে তাতে আমাদের? গত শতকের নব্বইয়ের দশকে মেক্সিকান বিজ্ঞানী আলকুবিয়ের এ বিষয়ে একটা উপপাদ্য দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, একাদশ মাত্রার সম্পূর্ণ চরিত্রকে জানলে মানুষ তখন সীমিত জায়গায় বিপুল শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে সেই বহুমাত্রিক দেশকালকে ইচ্ছেমতো সংকুচিত ও প্রসারিত করতে সক্ষম হবে। ফলে, শত শত আলোকবর্ষ জুড়ে ছড়ানো স্থানকে মুহূর্তের জন্য গুটিয়ে ফেলে, একটুও না নড়েই চোখের নিমেষে পৃথিবী থেকে একেবারে দূর নক্ষত্রলোকে পৌঁছে যেতে পারবে মানুষের তৈরি মহাকাশযান।

(ধরুন একটা বড়ো রবারের চাদরের একপাশে আপনি দাঁড়িয়ে আর তার একেবারে অন্যপাশে চাদরের ওপরে একটা গোল্লা আঁকা। একবারও না নড়ে আপনি যদি সেই গোল্লাটার কাছে পৌঁছে যেতে চান তাহলে পা দিয়ে চাদরটাকে গুটিয়ে নিয়ে এলেই হলো। আপনাকে নড়তে হবেনা। গোল্লাটাই নিমেষে আপনার কাছে এসে হাজির হবে। তারপর গোল্লার ওপরে পৌঁছে যেই আপনি হালকা হয়ে দাঁড়াবেন, রবারের চাদর ফের ফিরে যাবে নিজের চেহারায়।)

বিজ্ঞান বলে, কোন বস্তুই আলোর চেয়ে বেশি জোরে ছুটতে পারেনা। কাজেই আলোর চেয়ে বেশি জোরে ছোটা মহাকাশযান তৈরিও বিজ্ঞানের হিসেবে সম্ভব নয়। এই নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে বহুকাল একটা হতাশা কাজ করেছে, যে তারার দেশে রকেট নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নটা বোধ হয় কল্পবিজ্ঞানেই আটকে থাকবে। আলকুবিয়েরের এই তত্ত্বটা বিজ্ঞানীদের একটা নতুন পথ দেখিয়েছে। সেটা হল এই যে এই পদ্ধতিতে, মহাকাশযানের আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ছোটবার কোন দরকারই হবে না। সে থেমে থাকবে একই জায়গায়। শুধু এক মহাশক্তির বিস্ফোরণে দেশকাল সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে তাকে পৌঁছে দেবে ব্রহ্মাণ্ডের এপার থেকে ওপারে। কিন্তু মুশকিল হল, এর জন্য প্রথমে একাদশ মাত্রাটিকে পুরো অনুধাবন করে জানতে হবে কোন পদ্ধতিতে তাকে কাজে লাগানো হবে দেশকালকে গুটিয়ে ফেলবার কাজে। আর দ্বিতীয় সমস্যাটা হল, অংক বলছে, কাজটা করবার জন্য যে পরিমাণ শক্তি বিচ্ছুরণের দরকার হবে তা কল্পনাতীত পরিমাণে বেশি।

মানুষের হাতে সে শক্তি আসতে এখনো অনেক দেরি। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে বাধা কি, যে আমাদের কোন বংশধর হয়তো একদিন সেই ভবিষ্যতের মহাকাশযানে চেপে আলকুবিয়ের ড্রাইভের ইঞ্জিনের শক্তিতে ভর করে চোখের নিমেষে সত্যিই পৌঁছে যাবে একেবারে আকাশের ওপিঠে!

আসুন আমরা সেই স্বপ্নটা দেখি। বিজ্ঞানের সাধনা তো অসম্ভব স্বপ্নদের বাস্তবে বদলে দেবারই অন্য নাম!

অলঙ্করণঃ সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

প্রবন্ধঃ

"সাইবারপাঙ্ক ধারা উত্তর-আধুনিক কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের একটি ধারা।'উন্নততর প্রযুক্তি ও তার প্রভাবে জীবনের অবমূল্যায়ন' এই ধারার প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।"

-উইকিপিডিয়া

'সাইবারপাঙ্ক' বা 'অপযান্ত্রিক' ধারা প্রথম সাহিত্যে উঠে আসে 1983 সালে; আমেরিকান লেখক ব্রুস বেথকে নিজের একটি গল্পের নাম দেন 'সাইবারপাঙ্ক'। সেটা থেকে এই ধারাটি নিজের নাম পায়। ধারাটিকে জনপ্রিয় ও আলোচ্য বিষয় করে তোলে 1984 সালে প্রকাশিত উইলিয়াম গিবসনের স্প্রল (sprawl) ট্রিলজি।

প্রচলিত 'ইউটোপিয়ান কল্পবিজ্ঞান ধারা', জুল ভার্ন, এইচ. জি. ওয়েলস, আর্থার সি. ক্লার্ক, আইজ্যাক অ্যাসিমভ প্রমুখ সাহিত্যিকেরা যেটা চর্চা করেছেন, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল – 'ভবিষ্যতে যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি কিভাবে মানুষের জীবনযাপন সহজতর এবং আনন্দময় করে তুলবে তার একটি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি-সম্পন্ন ব্যাখ্যান।' অপযান্ত্রিক ধারাটি অন্যদিকে তুলে ধরে প্রযুক্তিগত উন্নতি কিভাবে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে নিয়ে তোলে; এবং সঙ্গত কারণে তার ফলে প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ক্ষমতার লোভের ভুক্তভোগী হয়।

অপযান্ত্রিক ধারার গল্পে বারেবারে উঠে আসে হ্যাকার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকর্পোরেশন এবং যন্ত্র ও মানুষের প্রযুক্তিগত মেলবন্ধন। মানুষ কখনোই নিজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে খুশি ছিল না; সীমা অতিক্রম করার জন্যই প্রযুক্তির প্রচলন হয়েছে, যা মানুষকে ভীষণভাবে যান্ত্রিক করে তুলেছে। সৃজনশীলতা থাকছে শিকেয় তোলা, অনুকরণ ও ভোগবাদী মানসিকতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। অপযান্ত্রিক ধারার সাহিত্য চেষ্টা করেছে মানুষের সামনে তা তুলে ধরার। সাহিত্যগুলি জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু সাফল্য আসেনি। মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে এমন এক ভবিষ্যতের দিকে যেখানে মূল্যবোধ বিচার হবে যন্ত্রের মাপকাঠিতে।

"সাইবারপাঙ্ক ধারার নায়কেরা সবাই সমাজ থেকে বাইরে, একঘরে, এবং একলসেঁড়ে (Loner)। তারা এমন একটা সমাজে বাস করে যেখানে দৈনন্দিন জীবন চালিত হয় দ্রুততালে (rapidly) চলা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের হাতে; সমাজ এগোয় একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথ্যভাণ্ডারের ঘেরাটোপে থেকে এবং মানুষ নিজের দেহ উন্নত করে ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত।"

- লরেন্স পারসন

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

1940-1950 সালের কল্পবিজ্ঞানে কল্পনা করা 'ইউটোপিয়ান সমাজ' উপেক্ষা করে অপযান্ত্রিক ধারা তুলে ধরে এক 'ডিস্টোপিয়ান সমাজ', যেখানে মানুষের লোভ ও স্বার্থপর কৌতূহল সমাজকে নিয়ে যায় অবক্ষয়ের পথে। উন্নতি যদি মানবিক গুন প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকে উন্নতি বলা যায় কিনা এই প্রশ্ন অপযান্ত্রিক ধারার সাহিত্যে উঠে আসে বারেবারে। এই ধারার নায়কেরা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে 'উন্নতির লক্ষে, উন্নতির পথে' এই ভীষণ লোভী ও মানবিকতা-হীন দর্শনের। এই ধারা প্রশ্ন তোলে মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা নিয়ে। মানবপ্রকৃতির অন্তর্লীন বিপ্লবের চেতনা ফুটে ওঠে লেখকদের লেখায়।

1984 সালে উইলিয়াম গিবসনের "নিউরোম্যান্সার(Neuromancer)" প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তার ব্যবহার করা শব্দ সাইবার-স্পেস(Cyberspace, প্রথম পাওয়া যায় "বার্নিং ক্রোম", 1982 গল্পে) প্রবল জনপ্রিয়তা পায়। উপন্যাসটি অপযান্ত্রিক ধারাকে জনসমক্ষে তুলে নিয়ে আসে এবং ধারাটির ভিত পোক্ত করে। এর পরে আর দুটি বই "(Count Zero, 1986)" এবং "মোনালিসা ওভার ড্রাইভ (Mona Lisa Overdrive, 1988)" নিয়ে সম্পূর্ণ হয় "স্প্রল ট্রিলজি"। গিবসন উঠে আসেন প্রথম সারির কল্পবিজ্ঞান লেখকদের তালিকায়। এরপর প্রকাশিত হয় "দি ডিফারেন্স ইঞ্জিন(The Difference engine, 1990)", যেটি একটি "স্টিমপাঙ্ক" ধারার উপন্যাস; "ব্রিজ ট্রিলজি (Virtual Light, 1993; Idonu, 1996; All tomorrow's Parties,1999)"; এবং "প্যাটার্ন রিকগনিশন(Pattern Recognition,2003)", "স্পুক কান্ট্রি (Spook Country,2007)" ও "জিরো হিস্ট্রি (Zero History, 2010)".

উইলিয়াম গিবসন যা শুরু করেছিলেন 1984 সালে, তা দ্রুতগতিতে এগোয় নবীন লেখক-গোষ্ঠীর হাত ধরে। নীল স্টিফেনসন, ব্রুস স্টারলিং, ফিলিপ কে. ডিক প্রমুখ আমেরিকান লেখক এবং কাতসুহিরো ওটোমো, শিরো মাসামুনে প্রভৃতি জাপানী লেখক তাদের মধ্যে অন্যতম।

নীল স্টিফেনসনের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস "দি বিগ ইউ (The big U, 1984)" এবং দ্বিতীয় উপন্যাস "জোডিয়াক (Zodiac, 1988)" তাকে পরিচিতি দেয় অপযান্ত্রিক ধারার লেখক হিসাবে। তিনি প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন 1992 সালের "স্নো ক্ল্যাশ (Snow Clash)" উপন্যাসে; যেখানে অপযান্ত্রিক ধারা, মেমেটিক্স(Memetics), কম্পিউটার ভাইরাস ও সুমেরিয়ান পুরাণ মিলেমিশে যায় জটিল ও উগ্র আর্থসামাজিক সমস্যার সঙ্গে। এর পরে তিনি লিখেছেন আরও অজস্র উপন্যাস ও ছোটগল্প (সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার পরিসর হল না) যা তাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দিয়েছে। বহু অপযান্ত্রিক ধারার পাঠক তাকে এই ধারার ভগবান("God of Cyberpunk Fiction") বলে দাবী করেন। আমি এর বিচার পাঠকদের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিলাম। জাপানী মাঙ্গা শিল্পী কাতসুহিরো ওটোমোর "আকিরা(Akira 1982)" এবং শিরো মাসামুনের মাঙ্গা "ঘোস্ট ইন দি শেল(Ghost in the Shell, 1989)" অপযান্ত্রিক ধারাকে জনপ্রিয় করে তোলে জাপান ও সমগ্র বিশ্বে।

এই লেখকেরা কল্পনার বাঁধ ভেঙ্গে দেন বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে। তারা কল্পনা করেন এমন এক পৃথিবীর যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত একটি পৃথিবীব্যাপী বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে(যা এখন বাস্তবায়িত হয়েছে), তাদের কল্পনায় ঘুচে যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানুষের প্রভেদ, মানুষ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় প্রকৃতিদত্ত নিখুঁত কিন্তু দুর্বল দেহ, ব্যবহার করে প্রযুক্তি নির্মিত শক্তিশালী ও সহজে পরিবর্তনশীল কৃত্রিম দেহ। যান্ত্রিকতা সেখানে প্রশংসিত, মানুষ হওয়া অবমাননীয়। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা নিয়ে মহম্মদ জাফর ইকবাল, হুমায়ূন আহমেদ এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন অনবদ্য উপন্যাস ও গল্প।

মহম্মদ জাফর ইকবালের প্রথম একটি গল্প সঙ্কলন "কপোট্রনিক সুখ-দুখঃ(1976)" সম্পূর্ণ অপযান্ত্রিক ধারার না হলেও বাংলা ভাষায় যে প্রথম এই ধারার প্রচেষ্টা, সেটা স্বীকার করতেই হয়। এরপর "যারা বায়োবট(1993)", "নিঃসঙ্গ গ্রহচারী(1994)", "ত্রিনিত্রি রাশিমালা(1995)", "মেৎসিস(1999)", "ত্রাতুলের জগৎ(2002)" প্রমুখ উপন্যাস(তালিকা অসম্পূর্ণ) বাংলা ভাষায় অপযান্ত্রিক ধারাকে প্রতিষ্ঠা করে অনবদ্য রূপে, এবং পাঠকের কাছে রেখে যায় একটি বেয়াড়া প্রশ্ন, "যান্ত্রিকতা কি মানবিকতারই একটি অংশ? নাকি একটি রোগ?"

হুমায়ূন আহমেদ এর কল্পবিজ্ঞান অপযান্ত্রিক ধারায় পড়ে কিনা, তা নিয়ে পাঠকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে, কিন্তু তার "ইরিনা", "দ্বিতীয় মানব", "ফিহা সমীকরণ", "ইমা" প্রভৃতি উপন্যাস বারে বারে তুলে ধরে যন্ত্র-সভ্যতায় মানুষ ও মানবিকতার অবস্থানগত সংকট, এবং তার নিষ্ঠুর ও লোভী অবমূল্যায়ন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর "বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা" একটি নিখুঁত ও অনবদ্য অপযান্ত্রিক উপন্যাস, যা যন্ত্র-সভ্যতার অমানবিক পরিস্থিতি ও মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ন কে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। এছাড়াও, তার বহু ছোটগল্পে ("3000 বছর পরে" গল্প-সঙ্কলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) অপযান্ত্রিক ধারা উঠে এসেছে বারে বারে। তাদের লেখায় বারেবারে ফুটে উঠেছে একটাই আকুতি – মানুষের তৈরি যন্ত্র

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

যেন শেষে মানুষের মনিব ও বিধাতা না হয়ে দাঁড়ায়। যদি হয় তবে শেষের সে দিন হবে ভয়ংকর।

অপযান্ত্রিক ধারা জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে সেটি মানবসমাজের উপর এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। একদিকে শিল্পী এঁকেছেন অজস্র ছবি, অন্যদিকে ভাস্কর বানিয়েছেন অনবদ্য ভাস্কর্য। স্থপতি বানিয়েছেন এবং বানাচ্ছেন অবিশ্বাস্য সব স্থাপত্য(টোকিওর 'শিবুইয়া স্কোয়ার', বার্লিনের 'সোনী সেন্টার', হংকং এর 'সাইবারপোর্ট')। অপযান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করে সিনেমা হয়েছে অজস্র যা মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে(ঘোষ্ট ইন দি শেল, ম্যাট্রিক্স ট্রিলজি ও ইনসেপসন তার মধ্যে অন্যতম)। সুরকার পেয়েছেন নতুন সুরের ভাবনা। আধুনিক দেশসমূহের অধিবাসীদের চিন্তাধারা ও দর্শন অনেকটাই এই অপযান্ত্রিক ধারা প্রসূত। কিন্তু আধুনিক জাপান পিছনে ফেলে দিয়েছে সবাইকে। তারা নিজেদের দেশটাকেই সম্পূর্ণরূপে সাজিয়েছে অপযান্ত্রিক ধারার কল্পনাকে ভিত্তি করে। টোকিওর শিবুইয়া স্কোয়ার দেখলে কল্পবিজ্ঞান সিনেমার সেট মনে হয়; জনপ্রিয় করে তোলে জাপান ও সমগ্র বিশ্বে।

নবীন পাঠকেরা যারা কল্পবিজ্ঞান পড়ছেন বা পড়েছেন, কিন্তু অপযান্ত্রিক ধারার সাহিত্য সেভাবে পড়া শুরু করেননি, তাদের প্রতি অনুরোধ, শুরু করুন মহম্মদ জাফর ইকবাল ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর লেখা দিয়ে। এবং জোগাড় করে পড়ে ফেলুন "ঘোস্ট ইন দি শেল" মাঙ্গা। প্রথমেই উইলিয়াম গিবসন বা নীল স্টিফেনসন ধরলে অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিক ও অপযান্ত্রিক অপভাষা(Jargon) পড়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যারা আত্মবিশ্বাসী, তারা অবশ্যই পড়ুন এবং উপভোগ করুন। কিন্তু ভাল না লাগলে বা বুঝতে সমস্যা হলে প্রাবন্ধিকের সমালোচনা করুন, লেখকদের নয়; পাঠকদের প্রতি এটি আমার বিনম্র প্রার্থনা।

1981 সালে প্রকাশিত উইলিয়াম গিবসনের ছোটগল্প 'দি জার্নসব্যাক কন্টিনিউয়াম' সরাসরি ব্যঙ্গ করে তার পূর্বসূরি 'ইউটোপিয়ান কল্পবিজ্ঞান ধারা'কে, যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। 'ইউটোপিয়ান কল্পবিজ্ঞান ধারা' এখন মৃতপ্রায়(যে কোনো শিক্ষিত মানুষ বর্তমান যুগে তার অসারতা ধরতে পারবেন)।ধারাটি চর্চা করেন নবীন কল্পবিজ্ঞান লেখকেরা; হাত পাকানোর জন্য। অভিজ্ঞ লেখকেরা তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান এমন এক সমাজের কল্পনায় যেখানে মানুষই মুখ্য, কারণ মানুষ সেখানে বড় কম। যন্ত্রমানব ও যান্ত্রিক মানবে ভরে গেছে সেই পৃথিবী। তারাই কি মানুষের ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতের গর্ভেই এর উত্তর লুকনো আছে।

অলঙ্করণঃ সুপ্রিয় দাস

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

কুইজ - ৫

কল্পবিজ্ঞানী

কল্পবিশ্বের তৃতীয় সংখ্যার কুইজের উত্তর কেউ সম্পূর্ণ ঠিক দিতে পারেননি।

১) বিখ্যাত জাপানি কাইজু দানব গড্‌জিলার স্রষ্টা কে?

২) ইউ-৭ ও ইউ-৯ একটি বিখ্যাত টেলিভিশন সিরিজের দুটি মুখ্য চরিত্রের কোড নম্বর। কোন সিরিজ ও কোন চরিত্র?

৩) নিচের ছবিটি কিসের ছবি?

৪) ইওনাগুনি মনুমেন্ট কি ও কোথায় অবস্থিত?

৫) এস এন ১৮৫, এস এন ১০০৬, এস এন ১০৫৪ – এই সংকেত গুলো কিসের সংকেত?

৬) কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান হুগো পুরষ্কার কার নামে নামাঙ্কিত?

৭) এইচ জি ওয়েলসের বাবা জোসেফ ওয়েলসও একটি বিশেষ কীর্তির জন্য ছেলের মতই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কি সেই কীর্তি?

৮) WALL-E এর সম্পূর্ন নাম কি?

৯) কোন বিখ্যাত চলচ্চিত্রের নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল স্টার-বিস্ট?

১০) এই ভয়ঙ্কর প্রানীটির দেখা কোথায় পেয়েছি আমরা?

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলীঃ

সব কটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলেই আপনার পাঠানো উত্তর গ্রাহ্য হবে।

উত্তর kalpabiswa.kalpabijnan@gmail.com এই ইমেল আইডি তে পাঠান।

ইমেলের সাবজেক্টে "KB Issue 1.3 Quiz" উল্লেখ করবেন।

প্রথম ১০ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

আগের সংখ্যার কুইজের উত্তর -

১) লাভক্রাফটিয়ান ইউনিভার্সের বিখ্যাত কাল্পনিক বই নেক্রোনমিকনের লেখক কে?

উঃ আব্দুল আলহাজরেদ

২) লাভক্রাফটের বহু গল্পের পটভূমি আর্কহ্যাম শহর কোথায় অবস্থিত?

উঃ লাভক্রাফটের গল্পে বর্নিত এই কল্পিত শহর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যে অবস্থিত। বাস্তবে এই নামে কোন শহর নেই।

৩) ১৯৮২ সালে নির্মিত বিখ্যাত হরর ছায়াছবি 'দ্য থিং' এর লেখক কে?

উঃ জন ডবলিউ ক্যাম্পবেল। মূল গল্পের নাম 'হু গোজ দেয়ার'

৪) নিচের ছবিটি কোন ছায়াছবির দৃশ্য?

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

উঃ পাতালঘর

৫) অনেকের মতে ১৯৭৭ সালে নির্মিত এই ছবিটি বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক কমেডি। কোন ছবি?

উঃ প্রয়াত শ্রী তপন সিংহ নির্দেশিত 'এক যে ছিল দেশ'

৬) নিচের ছবিটি এক যুগান্তকারী কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের প্রচ্ছদ। কোন উপন্যাস?

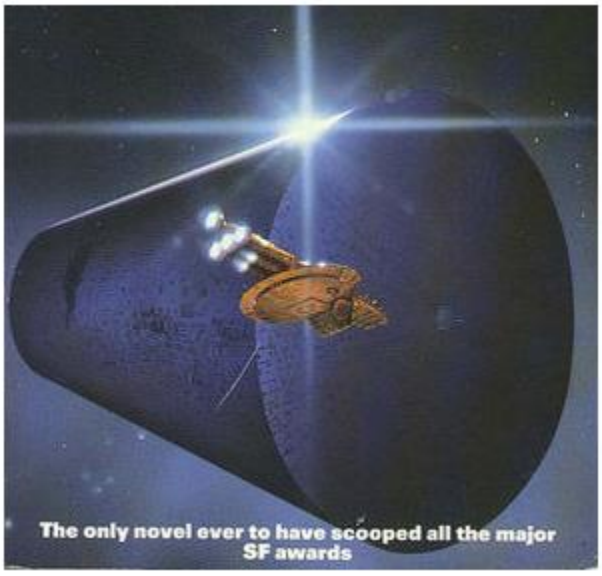

উঃ আর্থার সি ক্লার্কের 'রঁদেভ্যু উইথ রামা'

৭) কোন বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্রের নাম তার প্রযোজকরা প্রথমে রাখতে চেয়েছিল 'দ্য স্পেসমেন ফ্রম প্লুটো'?

উঃ ব্যাক টু দ্য ফিউচার

৮) জেমস ক্যামারুন তার বিখ্যাত 'অবতার' ছবিটি বানানোর প্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছিলেন?

উঃ 'লর্ড অফ দ্য রিংস' ছবির গোল্লাম চরিত্রটি দেখে

৯) কোন পৃথিবী বিখ্যাত লেখক তার প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'ব্যাচম্যান' ছদ্মনামে লিখেছিলেন?

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস

উঃ স্টিফেন কিং

১০) ভবিষ্যতে উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন মানব সভ্যতার সামাজিক অধঃপতন কে ভিত্তি করে লেখা কল্পবিজ্ঞান গল্পগুলিকে একটা বিশেষ গোত্রে না জঁরে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই গোত্র না জঁর-এর নাম কি?

উঃ সাইবার-পাঙ্ক

©কল্পবিশ্ব ওয়েবজিন, একটি কল্পবিশ্ব প্রয়াস